আশাপূর্ণা দেবী

ছোটোদের এক ডজন উপন্যাস

ছোটোদের এক ডজন উপন্যাস

আশাপূর্ণা দেবী

লালমাটি

banglabooks.in

Chhotoder Ak Dojon Upanyas

প্রকাশকাল :
বইমেলা ২০১০

প্রকাশক :
নিমাই গরাই
লালমাটি
৫/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
৯৮৩১০২৩৩২২

অক্ষরবিন্যাস :
লা ল মা টি
১২এ গৌর লাহা স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
সুব্রত মাজী

মুদ্রণ :
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মূল্য : ১৫০ টাকা

banglabooks.in

ভূমিকা

বড়োদের লেখিকা হিসাবে অনেক বড়ো বড়ো পুরস্কার পেয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী, রবীন্দ্র পুরস্কার থেকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার, কিন্তু ছোটোদের কাছ থেকে পেয়েছেন তার চেয়েও বড়ো পুরস্কার— তাদের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প পেলে ছোটোরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আজও।

আশাপূর্ণা দেবী শুরু করেছেন ছোটোদের কবিতা আর গল্প নিয়ে, প্রথম বইও প্রকাশিত হয় ছোটোদের কিছু গল্প নিয়ে, আর চলে যাবার আগেও নিজের অনেক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ছোটোদের গল্প লিখে তিনি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পান। প্রচুর লিখেছেন আশাপূর্ণা দেবী ছোটোদের জন্যে, প্রচুর গল্প এবং প্রচুর উপন্যাস। এই সব লেখা থেকে এক ডজন সেরা উপন্যাস বেছে নেওয়া মুখের কথা নয়। একসঙ্গে বারোটি উপন্যাস, কাজেই কোনো-কোনোটা যে চেহারায় উপন্যাস না হয়ে বড়োগল্প বা বড়ো ছোটোগল্পের মতো হবে, এমনটা তো হতেই পারে।

আশাপূর্ণা দেবীর সমস্ত গল্পেরই সাধারণ একটা লক্ষণ হল মজা। হাসির গল্পই হোক বা ভূতের গল্প, মজাটা সেখানে থাকবেই— মজা এবং বিস্তর খাওয়া-দাওয়ার বর্ণনা। কত রকমের মজা যে এখানে আছে তার শেষ নেই, সিনেমায় পার্ট করতে গিয়ে মজাদার পরিণতি আছে ('অলৌকিকের মতো'), প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঘনাদার মতো এক গুলদার মানুষের গল্প আছে ('নজর উঁচু), বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে বিচ্ছিরি ফ্যাসাদের

banglabooks.in

গল্প আছে ('দিব্যেন্দুসুন্দরের দিব্যজ্ঞান'), লটারির টিকিট যে পেলেও খারাপ, না পেলেও খারাপ সে গল্প আছে ('ভাগ্যলক্ষ্মী লটারি'), রথযাত্রা স্পেশ্যালে প্রভু জগন্নাথ দর্শনের গল্পও আছে ('সময়ই পাওয়া গেল না')। বড়োদের জন্যে লেখাতেও যে তিনি কেন এত জনপ্রিয়, তাও বুঝবে একটি উপন্যাসে ('শামুকের খোলা')। গোয়েন্দা উপন্যাস এখানে আছে অনেকগুলো, খুনোখুনি তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে মজা। 'মার্ডার কেস' গল্পে খুনোখুনিতেও হাসি, 'নিজের ঘরে', উপন্যাসেও তাই, 'নিজে বুঝে নিন' উপন্যাসে হাসতে হাসতে চুরি, মামা-ভাগ্নের রসিকতা নিয়ে 'সুতোর টানে', 'গল্পই কি অল্প' গল্পে প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর কৃষ্ণার মতো এক মেয়ে গোয়েন্দা। 'গোয়েন্দা গল্প আর কাকে বলে' উপন্যাসে সাহিত্যিক প্রলয় চাকলাদারের গোয়েন্দা গল্প লিখতে অজ্ঞাতবাসে গিয়ে যে মজার ঝামেলা হল, ভূ-ভারতে তারও কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

গোটা বইতে হাসি, মজা আর বিচিত্র সব ঝামেলার হাট বসে গিয়েছে। এমন একখানা বই গায়ে-গতরে আরও বড়ো হলে যে খুব ভালো হত সে তো বটেই, কিন্তু যা পাওয়া গেল তাই বা মন্দ কী। একবার শুরু করলে আর ছাড়তে পারবে না, যদি রেখে বলা যায়। এ বই হাসতে হাসতে পড়বে, পড়তে পড়তে হাসবে।

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

নজর উঁচু	৯
শামুকের খোলা	১৮
নিজে বুঝে নিন	৪১
দিব্যেন্দুসুন্দরের দিব্যজ্ঞান	৬১
গোয়েন্দাগল্প আর কাকে বলে	৭৬
অলৌকিকের মতো	১২১
ভাগ্যলক্ষ্মী লটারি	১৫৬
সময়ই পাওয়া গেল না	১৮৬
গল্পই কি অল্প	২০৫
সুতোর টানে	২৪২
নিজের ঘরে চুরি	২৭২
মার্ডার কেস	২৮৮

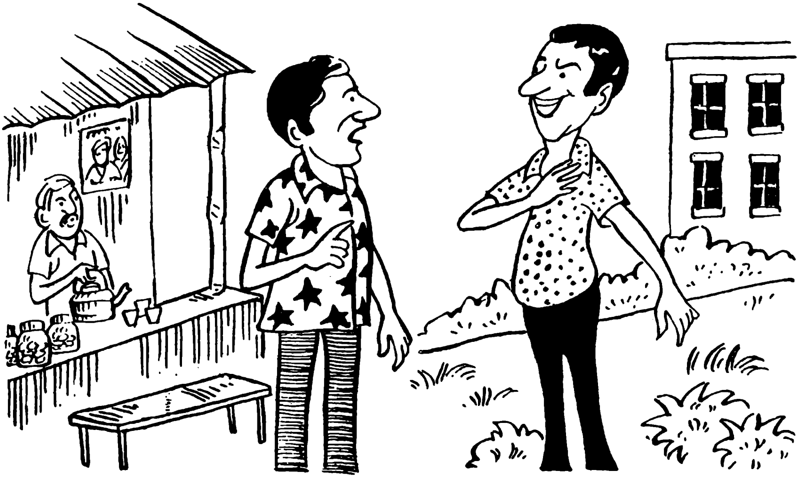

নজর উঁচু

'মাথা ফাটার কথা কী বললেন মশাই? নাতির মাথা ফেটেছে? তিন চারটে স্টিচ্ দিতে হয়েছে? হুঁ! একেই আপনি বলছেন মাথা ফাটা? তার মানে মাথা ফাটা কাকে বলে চোখে দেখেন নি কখনও। শুনবেন মাথা ফাটা কাকে বলে? আমারই মেজোছেলে, ঠিক ওই রকম বছর তিন চার বয়েস, সিঁড়ি থেকে গড়গড়িয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে ডিগবাজি খেয়ে পড়ল উঠোনের মাঝখানে, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথার খুলিখানা স্রেফ ডাবের মুখটি কাটার মতো খুলে ছিটকে বেরিয়ে গেল!'

শিউরে উঠে কাঁটা দেওয়া গায়ে বলি—'সে কী?'

ভদ্রলোক মিটি মিটি হেসে চোখ তেরছে বলেন, 'আর সে কী! দিস ইজ এ ফ্যাক্ট। একেবারে জলজ্যান্ত সত্যি। ছুটে ছেলেকে তুলে সেই উড়ে যাওয়া খুলিখানাকে কুড়িয়ে নিয়ে ছেলের মাথার গর্তয় চাপা দিয়ে দৌড়লাম পি.জি.তে। ডাক্তার চন্দ্র তখন পি.জি.-তে রয়েছে, আমার ছোটো ভাইয়ের পিসতুতো শ্যালার ভায়রাভাই হয়, তার কাছেই গিয়ে পড়লাম। শুনলে মশাই বিশ্বাস করবেন না— ওই বিতিকিচ্ছিরি কেস্, যাকে বলে সাংঘাতিক, দেখে ঘাবড়াল না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখে বলল, 'লে আও

যন্তরপাতি।' তারপর মাত্র দু-ঘণ্টার মধ্যে পেরেক ঠুকে সেলাই করে বেমালুম জুড়ে দিল! বলল, 'নিয়ে যান রজনীদা আপনার ছেলে। হপ্তাতিনেক শুইয়ে রাখবেন, ব্যস।' বলব কী আপনাকে' দুহপ্তাও লাগল না মশাই, ছেলে মল্লযুদ্ধ করে বেড়াতে লাগল। যেদিন স্টিচ্ কাটাতে নিয়ে গেছি, চন্দ্র নিজেই অবাক। বলে, 'সেলাই খুঁজে পাচ্ছি না যে রজনীদা, কী ব্যাপার!' সেই ছেলে আমার এখন ক্যানাডায় রয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেছে, এলে দেখাব। পাড়ায় এসে গেলাম যখন থাকবই তো। চুল উলটে দেখবেন, দাগ খুঁজে পাবেন না।'

অবাক নিশ্বাস ফেলে বলি, 'সত্যিই শুনিনি কখনও এরকম।'

'শুনবেন কোথা থেকে?' উনি একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন, 'হোল ইন্ডিয়ায় তো এরকম কেস্ আর দ্বিতীয় হয়নি! আগেও না পরেও না। চন্দ্র বলেছিল, 'আমাদের মেডিক্যাল জার্নালে এ ধরনের কেস পড়েছি দু' একটা। খুব সম্ভব রাশিয়ায়। হ্যাঁ, রাশিয়া ছাড়া আর কোথায় হবে এ-ঘটনা?'... তা চন্দ্রর সাহস আছে, দিলো তো ছেলের খুলিতে পেরেক ঠুকে। স্রেফ পেরেক ঠোকাই। পরে ধারে ধারে সেলাই লাগল, তাকিয়ার খোলে চাঁদি লাগানোর মতো।' রজনীবাবু মৃদুমন্দ হাসতে থাকেন।

রজনী সরখেল।

আমাদের নতুন প্রতিবেশী।

রোগা টিংটিঙে ঈষৎ খোনা খোনা গলা। দিন চারেক হল এ-পাড়ায় এসেছেন। নিমাইয়ের দোকানের দোতলার ফ্ল্যাটটা সম্প্রতি খালি হয়েছিল, তাতেই এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আলাপ ওই নিমাইয়ের দোকানেই। নিমাইয়ের দোকানটা স্রেফ 'হরেকরকমবার', কাজেই ওর দোকানে সকালের পাঁউরুটি আনা থেকেই যাওয়া আসার শুরু, আলাপও হয়ে গেছে খুব। ক-দিন আগে ভাইঝির ছেলেটা দু-দণ্ডের জন্যে বেড়াতে এসে, পড়ে মাথা ফাটিয়ে মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে বাড়ি ফিরল—নিমাইয়ের কাছে সেই গল্প করছি, উনি বসেছিলেন দোকানের টুলে, গল্পটা শুরু হতে না হতেই যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন, 'মাথা ফাটার কথা বলছেন? কী দেখেছেন মাথা ফাটার?'

সেই আলাপ।

বিকেলেই দেখি আমার বাড়ির গেট ঠেলে ঢুকছেন। দেখতে পেতেই বলে উঠলেন, 'এই এলাম ভালো করে আলাপ করতে। পাড়ায় এলাম যখন। কী করছেন? গোলাপ গাছের গোড়া খুড়ছেন? মাথা খারাপ! গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়তে আছে? পিঁপড়ের বাসা হবে। কোথা থেকে

চারা আনিয়েছিলেন? নাইনিতাল থেকে?... কলকাতার? গ্লোভ নার্শারির? হুঁ ওকি আর গোলাপ মশাই? ও সব হচ্ছে প্রলাপ। হ্যাঁ, একবার গোলাপবাগান করেছিল রজনী সরখেল। মিহিজামে থাকি তখন। এগ্‌জিবিশানে দিয়েছিলাম ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছিল। তখনকার গভর্নর এসেছিলেন প্রাইজ দিতে; আমার হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'সরখেল, এ-জীবনে কত গোলাপই তো দেখলাম, কিন্তু তোমার গোলাপের মতো? নো নো।'... সবটাই অবশ্য ইংরিজিতে বলেছিল, মুখস্থ রাখার সুবিধের জন্যে বাংলায় ট্রানস্লেশান করে নিয়েছিলাম।... হ্যাঁ, তাকে বলি গোলাপ।'

হেসে বললাম, 'কী করব বলুন?... গোলাপ না জুটলে প্রলাপ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে।'

'তা বটে।' রজনী সরখেল টিপে টিপে হাসেন।

বাড়িতে এসেছেন, একটু বসাতেও হয়, চা-টাও দিতে হয়। সরখেল মশাই চায়ের কাপ হাতে নিয়েই বলে ওঠেন, 'কাপ কোথাকার? বেঙ্গল পটারির বুঝি? তাই এমন মোটাসোটা। চায়ের কাপ যদি কিনতে চান, জাপান থেকে কিনবেন। আগে—আমি যখন সার্ভিসে ছিলাম, তাই কিনতাম। তা ছাড়া কোনোখানের নয়। তাতে চা খেলে চায়ের টেস্টই বদলে যায় বুঝলেন? এখন আর জাপান-ফাপানে যাওয়া আসা নেই।'

'অফিসের কাজে জাপান যেতে হতো বুঝি?'

'শুধু জাপানে?'

রজনী সরখেল তাঁর সেই আত্মস্থ হাসিটি হাসেন, 'কোথায় নয়? ইহ পৃথিবীর সর্বত্রই যেতে হত। চাঁদে তখনও ওঠেনি মানুষ, তাই ওখানে আমাদের কোম্পানির ব্রাঞ্চ ছিল না। থাকলে, কোম্পানির এজেন্ট হয়ে চলে যেতাম।

কথা বলতে বলতে শিশির এলো বাইরে থেকে হাঁচতে হাঁচতে। বকে উঠলাম ওকে, 'কাল থেকে না তোর জ্বর? আর সেই তুই বেরিয়েছিলি?

শিশির বলল, 'ভারি তো জ্বর! সাড়ে নিরানব্বুই—।'

রেগে মেগে বলি, 'ভারি তো'টা, সত্যি ভারি হতে কতক্ষণ?'

সহসা সরখেল মশাই প্রসঙ্গটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। (পরে দিনে দিনে বুঝেছি এটাই ওঁর পেশা।) বলে ওঠেন, 'বেশিক্ষণ নয় হে ছোকরা, বেশিক্ষণ নয়। আমারই তো গতকাল রাত্রে— দিব্যি রুটি তরকারি খেয়ে শুতে যাচ্ছি—হঠাৎ মনে হল জ্বর জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে চড়চড় করে বেড়ে উঠে এক ঘণ্টার মধ্যে একশো সাড়ে ছয় জ্বর।'

চমকে উঠি।

'একশো সাড়ে ছয়! বলেন কী?'

রজনীবাবু নিজস্ব ভঙ্গিতে হাসেন। 'সাড়ে ছয় শুনেই চমকে উঠলেন? আমি যখন রাজস্থানে ছিলাম, তখন একবার একশো আট পর্যন্ত জ্বর উঠেছিল আমার। 'লু' চলা এপ্রিলের দুপুর, পৃথিবীরও যত জ্বর বাড়ছে রজনী সরখেলেরও তত জ্বর বাড়ছে।'

রুদ্ধশ্বাসে বলি 'তারপর'

'তারপর আর কী? জয়পুর থেকে বরফ গেল, দুমণ বরফ। চাপিয়ে চাপিয়ে তবে জ্বর নামল। মরুভূমির দেশ তো? জল তো নেই যে, পাঁড়াগাঁয়ের মতো ঘড়া ঘড়া জল ঢালবে। শুনতে পাই আমার ঠাকুরদার বাবার একবার জ্বরবিকার হয়েছিল, এক পুকুর জল মাথায় ঢালা হয়েছিল। পরদিন সবাই দেখে শুধু কাদার গায়ে রাশি রাশি মাছ আটকে বসে আছে।'

হঠাৎ শিশির বলে ওঠে, 'আর সেই মাথায় ঢালা জলগুলো কোথায় গেল? আর একটা পুকুর হল?'

'এই দ্যাখো ছেলের কথা। সে জল তো ঠাকুরদার বাবার ব্রহ্মতালুই শুয়ে নিচ্ছে। কবরেজ পর্যন্ত হাঁ হয়ে গিয়ে আমার ঠাকুরদাকে বলেছিল, 'তাইতো সরখেল, দেখেশুনে তো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি, জলটা যাচ্ছে কোথায়?'

'কিন্তু আপনি? রাত্রে অত জ্বর গেছে—আজই বেরিয়েছেন কেন?'

'আমি? রাতে জ্বর গেছে বলে সকালে বেরোব না? হাসালেন মশাই। অবশ্যি রজনী সরখেলকে তো জানেন না? ফুটবল খেলতাম মশাই, গোঁয়ারের মতো দারুণ খেলতাম, খেলতে খেলতে আছাড় খেয়ে ডান হাঁটুর মালাইচাকিখানা ছাতু হয়ে ঝরে পড়ল, সেই হাঁটুতে 'নী-ক্যাপ' লাগিয়ে নেমে পড়লাম মাঠে, শিল্ড জিতে নিয়ে হিপ হিপ হুররে করতে করতে চলে এলাম।'

শিশির বলল, 'বাব্বা আপনার যে দেখছি সব বিদ্যেই আছে। ফুটবলও খেলতেন?'

রজনীবাবু আক্ষেপের হাসি হাসলেন, 'শুধু ফুটবল? খেলার জগতে একদিন রজনী সরখেলের নাম মুখে মুখে ফিরতো। আজ সবই ইতিহাসের কথা হয়ে গেছে।... পুরোনো খবরের কাগজ পড় তো জানতে পারবে। অবশ্য তোমার জন্মানোর আগের কাগজ পড়তে হবে।'

হঠাৎ রাস্তায় একটা শোরগোল উঠলো: কী ব্যাপার? গেটের ধারে এগিয়ে গেলাম সবাই, না; তেমন কিছু না একটা সাইকেলের সঙ্গে একটা রিকশা গাড়ির ধাক্কা লেগেছে।

সাইকেলওলা রাস্তায় পড়ে গিয়েছিল, কী ভাগ্যি ঝেড়ে উঠল। আর রাস্তার ভিড় ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগল।

রজনীবাবু উদাত্ত গলায় বললেন, 'এই দেখুন আমাদের দেশের চরিত্র, লোকটা পড়ে গেল। কিছুও তো লেগেছে? তাকে দেখে তোল। তা' নয় হাসছে দাঁত বার করে! অন্য কোনো দেশে— এমনটি হয় না। আমি যখন কলম্বোয় মোটর অ্যাক্সিডেন্ট করি সেখানের লোকের কী ব্যবহার যে দেখেছি—'

'কলম্বোতেও ছিলেন বুঝি?'

'বললাম তো, ইহ পৃথিবীর সবজায়গাতেই একবার করে ঢুঁ মেরেছে রজনী সরখেল। এখন বিষ-হারানো-ঢোঁড়া-সাপ হয়ে নিমাইয়ের দোকানের দোতলায় পড়ে আছি। বাস্তবিক মশাই, রিটায়ার্ড অফিসার আর বিষ-হারানো-সাপ এক বস্তু। সে যাক্। কলম্বোর অ্যাক্সিডেন্টের কথা বলছিলাম না? তার থেকেও ভদ্রতা দেখেছি জাভায়! ওখানে হল ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট—'

শিশির বলে উঠল, 'সর্বত্রই বুঝি আপনি একটা করে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটান?'

'তা ঘটাই!'

রজনী সরখেল আত্মস্থের হাসি হাসেন, 'বলেছিলাম তো গোঁয়ারগোবিন্দ লোক আমি—।

এই রজনী সরখেল। আমাদের প্রতিবেশী হয়েছেন। এবং নিত্য দু-বেলার অতিথিও হয়েছেন।

সকালবেলার চা-টা আর খবরের কাগজ পড়াটার পাট এখানেই চুকিয়ে নেন রজনীবাবু। এসেই হাঁক দেন, 'কই এখনও কাগজ দেয়নি?'

দুঃখের সঙ্গে বলি, 'আর বলবেন না, দিতে এত দেরি করে—।'

রজনী সরখেল উদাত্তস্বরে বলেন, 'দেরির কথা আমায় কী শোনাতে এসেছেন মশাই? আমি যখন আমহার্স্ট স্ট্রীটে থাকতাম, ওখানের কাগজওলা কাগজ দিত বেলা বারোটায়। বুঝলেন টুয়েলভ ও-ক্লক। একদিন রেগে বললাম 'কাগজ লোকে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে পড়ে, বা লাঞ্চের সঙ্গে।'... তার পরদিন মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, দুপুরেও কাগজ নেই, ভাবলাম রাগ করে বন্ধ করে দিয়েছে। ও হরি রাত্রে ডিনার টাইমে হঠাৎ খোলা বারান্দা দিয়ে ঠকাস করে কী পড়ল? না, দড়ি-বাঁধা খবরের কাগজ। বুঝুন! তাই বলছি—আমায় আর দেরি দেখাতে আসবেন না।'

তা ওঁকে আর আমরা কিছুই দেখাতে যাই না, উনিই যা দেখাবার দেখান। আমাদের গোয়ালা দুধে জল দিলে, রজনীবাবুর গোয়ালা জলে দুধ দেয়, আমাদের ঝি কামাই করলে রজনীবাবুর ঝি কাজ ছেড়ে চলে যায়, আমাদের

চাকর মুখের ওপর 'জবাব' করলে রজনীবাবুর চাকর নাকের ওপর ঘুসি লাগায়, আমাদের বাজারে মাছের কিলো দশ টাকা হলে ওঁদের বাজারে বাইশ টাকা হয়।

যে দিন বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির দিন সেদিন আমাদের গেট ছাপিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে গিয়েছিল, পরদিন সেই গল্প হচ্ছিল নিমাইয়ের দোকানে বসে, রজনী সরখেল ঝাঁপিয়ে পড়লেন যথারীতি। বললেন, 'বাড়ির মধ্যে জল ঢোকা দেখাচ্ছেন? হুঁঃ। আমার বাড়িতে একবার উঁকি দিয়ে দেখতে যেতেন যদি, দেখতেন জলঢোকা কাকে বলে! জল তো ঘরের মেজে ছাপাতে ছাপাতে খাটের ওপর উঠল, আস্তে আস্তে আলমারির মধ্যে, ড্রয়ারের ভিতরে, টেবিলের টপে! মশাই বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, পরদিন সকালে জল নামলে দেখি নস্যির কৌটোটা থেকে ফাউন্টেন পেনটার ভেতর পর্যন্ত জল। তাহলে ভাঁড়ার ঘরের অবস্থাটা অনুমান করুন। রাস্তার জলে তেল ভাসতে দেখেছিলেন সেদিন? দেখেননি? তার মানে লক্ষ করেন নি; লক্ষ করলে দেখতেন তেল ভাসছে। মানে তার আগের দিনই আমার পাঁচ সের তেলের টিনটার মুখ কাটা হয়েছিল কিনা!'

উনি একবার থামলে, বলে উঠলাম, 'কিন্তু আপনারা কী করলেন? ছাতে উঠে গেলেন?'

'ছাতে? ছাতে উঠব কী? সিঁড়ি কোথায়? ছাতে-টাতে উঠিনি। বরং শুনে হাসবেন বহুদিন পরে একটা পুরোনো বিদ্যে ঝালিয়ে নিলাম। বুঝলেন? ঘর থেকে দালান, দালান থেকে অন্য ঘর সাঁতার দিয়ে রাত কাটালাম। আমার তো মশাই জানেনই বড়ো ছেলে বম্বেয়, সেজো ছেলে ক্যানাডায়। ছোটোছেলে খড়্গপুরে। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে। বাড়িতে থাকবার মধ্যে আমি আর গিন্নি, তা গিন্নিকে গডরেজের উঁচু আলমারিটার মাথায় তুলে রেখে চালিয়ে চললাম ডুব সাঁতার, চিত সাঁতার—'

নিমাই ভুরু তুলে বলল, 'কিন্তু আপনার তো রজনীবাবু দোতলা? আমার দোকানে জল ঢুকল না আর আপনার ঘরে—'

'এই দেখুন নিমাইবাবু এঁড়ে তর্ক। আমার যে মশাই রান্নাঘরের ছাদ ছ্যাঁদা। অ্যাসবেসটাস তো? ওই ছ্যাঁদা দিয়ে জল পড়ে পড়ে ওই কাণ্ড! বৃষ্টিটা তো আকাশ থেকেই পড়ে? মাটি ফুঁড়ে তো ওঠে না? সেই আকাশ ফুটো হওয়া জলগুলো সব রান্নাঘর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে—'

এরপর আর তর্ক করার মুখ কোথায়?

জলটা যে আকাশ থেকেই পড়ে, এ কথা তো অস্বীকার করা যায় না? নিমাই তাই অপ্রস্তুত গলায় বলে, 'তা বটে! তা আগে সাঁতার-টাতার জানতেন বুঝি?'

'সাঁতার? জানতাম কিনা বলছেন?'

রজনী সরখেল এক টিপ নস্যি নিয়ে মৃদু হেসে বলেন, 'মিহির সেনের তো এত নাম শুনেছেন, ওর গুরুর নাম শুনেছেন কখনও? শোনেননি? শুনবেন না তো। ছাত্র আর পুত্র এরাই হচ্ছে জগতে সেরা অকৃতজ্ঞ।'

'তার মানে মিহির সেনের সাঁতার শিক্ষার গুরু আপনি? মানে আপনার কাছেই তাঁর—'

চোখ গোল করে নিমাই।

রজনী সরখেল আর এক টিপ নস্যি নিয়ে জামার হাতা ঝাড়তে ঝাড়তে আত্মস্থ গলায় বলেন, 'হাতেখড়ি থেকে।'

'তা সেদিন তাহলে পুরোনো বিদ্যেটা ঝালালেন?'

হু! বড়ো আনন্দ পেলাম। সকালে বরং জল নেমে যাওয়ায় মনটা খারাপ হয়ে গেল।... যাক আমার জিনিসগুলো দিয়ে দাও।'

নিমাই একখানা সানলাইট, একশো গ্রাম মাখন, দুশো নোনতা বিস্কিট, আর একটা টুথব্রাশ প্যাকেট করতে করতে বলে, 'দামটা এখন দেবেন নাকি?'

'এই দ্যাখো, শুনলে এখন বাজারে যাচ্ছি। তোমার দোকানের লোক দিয়ে দোতলায় পাঠিয়ে দাও, আমি আসছি—'

'কিন্তু কদিনের পাওনা বাকি রয়েছে সরখেল মশাই।'

'কী, তুমি বাকি দেখাচ্ছো নিমাই?'

সরখেল মশাই প্রায় ছিটকে ওঠেন, বাকি দেখতে চাও তো আমার পুরোনো হিসেবের খাতা দেখিয়ে দেব। যেকানে যখন গিয়েছি, থেকেছি কখনও নগদ দাম দিয়ে জিনিস কেনেনি রজনী সরখেল বুঝলে? আর কখনও বকেয়া বিল মিটিয়ে দিয়ে চলে আসেনি। তুমি আজ নিমাই দাস, আমায় 'বাকি' দেখাতে এসেছ!'

রাগে গরগর করতে করতে দোকান থেকে বেরিয়ে যান রজনী সরখেল।

দোকানের অন্য খদ্দেররা বলাবলি করে, 'মাথায় ছিট আছে নাকি লোকটার?'

নিমাই গম্ভীরভাবে বলে, 'ছিট নয় সাটিন।'

তা রজনী সরখেলের কথা নিয়ে আমোদে আহ্লাদে ছিলাম বেশ আমরা। আচমকা এক দুর্ঘটনার খবরে পাড়াসুদ্ধু সবাই যেন বসে পড়লাম।

খবরটা এনে দিল নিমাইয়ের দোকানের সেই ছোকরা ছেলেটা। বলল 'এইমাত্তর দোতলার সরখেল গিন্নিকে ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে এলাম হাসপাতালে গেলেন, সরখেল মশাইকে কে যেন কোনখানে ছুরি মেরেছে!'

শুনে সকলেই অ্যাঁ— অ্যাঁ করে সত্যিই বসে পড়লাম আমরা।

'সে কী।'

'কোথায়?'

'কখন?'

'কেন?'

'সে কী'র অবশ্য উত্তর নেই।

'কোথায়' এর উত্তর আছে।

মানিকতলার কাছে কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন, ফেরার সময়—

কখন? সন্ধে সাড়ে সাতটায়।

কেন?

আর কেন, রাহাজানি! ঘড়ি আংটি কলম পার্স সব ছিনিয়ে নিয়েছে— পিঠের দিক থেকে ছুরি বসিয়ে। আমরা পাড়ার সবাই মিলে ঠিক করলাম আজই যাওয়া হোক হাসপাতালে। বেচারি রজনী সরখেল! বন্ধুলোক!

আমরা গেলাম ক-জনে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে।

সরখেল গিন্নি একটু লাজুক লাজুক আছেন, মাথায় কাপড় দিয়ে আস্তে বললেন, 'একটু ভালো আছেন। তবে কথা তো শোনেন না, ডাক্তার বলেছে 'ওঠা চলবে না,' নার্সেরা ধমক দিচ্ছে, উনি বালিশ ঠেস দিয়ে উঠে বসে আছেন।'

যাক তাও ভালো।

আমরা পরদা ঠেলে গিয়ে ঢুকলাম, নিমাইও ছিল সঙ্গে।

রজনী সরখেল হই হই করে উঠলেন।

'আরে আসুন আসুন। কী মুশকিল আপনারা এত সবাই কষ্ট করে—কে খবর দিলো? বেড নম্বর-টম্বর জানলেন কী করে?'

বললাম, কী করে জানা হল।

রজনী সরখেল নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'ওহে তোমার ধারটা আর ফাঁকি দেওয়া গেল না—'

'কী যে বলেন সরখেল মশাই—' নিমাই দুঃখিত গলায় বলে, 'কিন্তু ডাক্তারের কথা মানছেন না শুনলাম, এটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'ডাক্তার! ডাক্তারের কথা শুনতে হবে আমাকে?' রজনী সরখেল দরাজ গলায় বলে ওঠেন, 'তুমি আর আমায় ডাক্তারের হুমকি দেখাতে এসো না নিমাই! রজনী সরখেল গুড়বয়ের মতো ডাক্তারের নির্দেশ মানবে। হুঁঃ!... ভারি তো পিঠের ডানায় একটু ছুরির খোঁচা, তার জন্যে তিন হপ্তা শুয়ে

থাকতে হবে! ভূতের কাছে মামদোবাজি। বলে সেবার যখন—খুন হয়েছিলাম, তখনই দশ দিনের বেশি—'

'খুন হয়েছিলেন!' আমাদের সকলের চেয়ারগুলো নড়ে উঠল।

সমবেত সংগীতের মতো, ঐক্যতান বাদনের মতো আমরা পাঁচজনে একই সুরে, 'খুন হয়েছিলেন মানে?'

'মানে? এ-যুগে আবার খুন হওয়ার মানে বোঝাতে হয় নাকি মশাই? মানে একেবারে নির্ভেজাল সোজা! যাকে কাগজের ভাষায় বলে নিহত।'

রজনী সরখেল বুকের মাঝখানে বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে বলেন, এই এইখানে গুলি। একেবারে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়!... সেবারে সেই প্রথম কাম্বোডিয়া গেছি, কথা-টথা বুঝি না কারোর, না বুঝে একটা নিষিদ্ধ এলাকায় পা দিয়ে মরেছি, ব্যস সঙ্গে সঙ্গে গড়াম গুম্! পড়লাম ধড়াস করে—'

'কিন্তু তারপরও আপনি? মানে—' 'আহাহা লজ্জা করার কী আছে?'

'কী আছে? বলেই ফেলুন না—।' রজনী সরখেল বলে ওঠেন, 'তারপরও রজনী সরখেল বেঁচেবর্তে পৃথিবীতে চরে খাচ্ছে কী করে, এই বলতে চাইছেন তো? ম-শাই এ হচ্ছে রজনী সরখেল, এর হাড়ে ভেলকি খেলে, বুঝলেন? বনমানুষের হাড়, মরেও মরে না, পুড়েও পোড়ে না। তবে লাশটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পোড়াতে পারে নি। কাম্বোডিয়ায় মৃতদেহ সৎকার করতে পোড়ানোর প্রথা, তা জানেন না বোধ হয়? আমিও জানতাম না, কার্যক্ষেত্রে দেখলাম। তবে কাঠ ওখানে দুর্লভ, তাই জোগাড় করতে গেল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে। মড়াকে আর পাহারা দেবার কী আছে ভেবেই বোধ হয় সবাই মিলেই চলে গেল, ব্যস আমিও চোঁ চোঁ দৌড়! একটা পোড়ো-মন্দিরে ঢুকে দশটি দিন চুপচাপ শুয়ে। তারপর আর কে শুইয়ে রাখতে পারে রজনী সরখেলকে? ধরা পড়ার ভয়ে বুক পিঠের দুই ফুটোয় শোলার ছিপি গুঁজে রক্ত বন্ধ করে ছদ্মবেশে একেবারে সটান দেশে!'

আমাদের হাঁ আর বুজতেই চায় না।

অবাক হয়ে ভাবি—অথচ এখনও রজনী সরখেলের জীবনী লেখা হচ্ছে না, হাজার হাজার শিষ্যও নেই ওনার।

রজনী সরখেল আমাদের এই পাঁচ পাঁচটা হাঁ করা মুখ দেখে কৌতুক আর কৃপার হাসি হেসে বলেন, 'হাঁ বুজে ফেলুন মশাই, মাছি-টাছি ঢুকে যেতে পারে! অবাক হবার কিছু নেই। অভ্যাসে কী না হয়, কী না হয় চেষ্টায়! আসল কথা—রজনী সরখেলের নজর উঁচু, ছোটোখাটোর মধ্যে যায় না সে।'

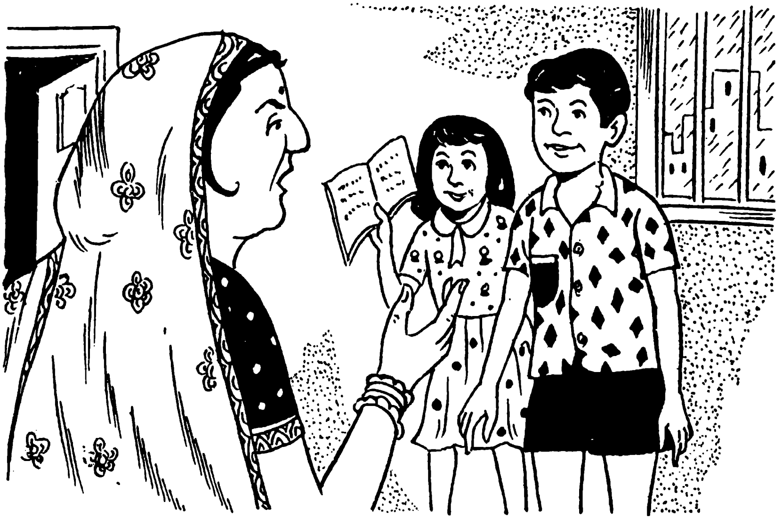

শামুকের খোলা

বললে তোরা মানিস, আর না-মানিস, আমি বলছি এ-বিষ্টি ভগবানের নিয়মকানুনের বিষ্টি নয়।

ভিজে গামছাখানা জোরে ঝাড়তে ঝাড়তে আরও জোরে ঘোষণা করেন মেজোঠাকুমা, পাঁজিপুঁথিতে লিখেছে, এখন প্রলয়ের কাল এসে গেছে। বলি দেখেছে কেউ সে-লেখা? তবে? তবু একনাগাড়ে চারদিন চার রাত মুষলধারে বিষ্টি! অ্যাঁ। 'প্রলয়' হতে তবে আর কতক্ষণ? আর পাঁচটা দিন এভাবে চললেই তো হয়ে গেল। পৃথিবীর বারোটা বেজে গেল। তার মানে মানুষের দৌরাত্ম্যিতে অকাল প্রলয়! হবে না? ভগবানের রাজ্যে যা খুশি করলেই হল? বলি এত জল আসছে কোথা থেকে?

তা কথাটা সত্যি! 'এত জলই' বটে! ঐতিহাসিক ব্যাপার।

যেদিকে তাকাও জল, আর জল। খবরের কাগজে জ্বলজ্বল করছে শুধু জল, টিভির পর্দায় জল, রেডিয়োতে জলকল্লোল।...

শিবাজী আর ফুলটুসি, বিশেষ একটি 'শব্দ সংকেতে'র আশায় পাশের ফ্ল্যাটের দেয়ালের দিকে উৎকর্ণ হয়ে বসে, পড়ার বই হাতে 'পড়া পড়া' অভিনয় করছিল। সহসা মেজোঠাকুমার এই উদাত্ত ভাষণ!

এরা বলে, মেজোঠাকুমাকে ভোটযুদ্ধের ভাষণ দিতে মাঠে নামিয়ে দিলে, মাইক ভাড়া করতে হবে না। আর ঠিক তেমনি— ধরলে কথা থামায় কে?

এখন বোধ হয় থামাবার চেষ্টাতেই ফুলটুসি তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ও মেজোঠাকুমা, জল তো বুঝলাম! কিন্তু আর পাঁচটা দিন মানে কী? ও মেজোঠাকুমা—

মেজোঠাকুমা অগ্রাহ্য ভরে বলেন, মানেটা আবার তোদেরও ব্যাখ্যা করে বলতে হবে? এ তো নিরক্ষর চাষিবাসীরাও জানে, ন'দিন নাগাড় বিষ্টি হলেই প্রলয়!

চাষিবাসীরা কী জানে আর না-জানে, ভগবান জানেন, তবে মেজোঠাকুমা সবই জানেন। কবে 'প্রলয়ের কাল' আসবে, কবে বাসুকি মাথা নাড়বেন, কবে অভাগা ভগবান বেচারিকে মানুষের উৎপাতে উৎখাত হয়ে সশরীরে পৃথিবীতে নেমে আসতে হবে, এ সবকিছুই মেজোঠাকুমার নখদর্পণে! কাজেই মেজোঠাকুমা ধরে ফেলেছেন, উনিশশো চুরাশির জুন মাসের এই বেতাল বেমক্কা কাণ্ডজ্ঞানহীন বৃষ্টিটি ভগবানের নিয়মকানুনের আওতাছাড়া। এর কারণ 'অন্য'।

শিবাজীর আর পড়া পড়া অভিনয় ভালো লাগছে না। বইটা মুড়ে ফেলে বলল, পৃথিবীর বারোটা বেজে গেলে অবশ্য খুব খারাপ নয়। তাহলে আর পরীক্ষা দিতে হবে না। জেঠুর মিটিমিটি হাসিটি দেখতে হবে না। কিন্তু ও মেজোঠাকুমা, অকাল প্রলয়টা কেন?

মেজোঠাকুমা নিশ্চিত প্রত্যয়ের গলায় বলেন, কেন আবার? এ সেই তোমাদের 'মহাকাশযানের' প্রতিফল। কী ঘটা, কী উল্লাস, মহা-আকাশযান 'উড়ল'। বলি 'উড়ল' মানেই তো 'ফুঁড়ল'? আকাশখানাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। তো ভগবানের জমিদারির বিলি ব্যবস্থায়, যেসব মেঘেরা 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' অনন্তকাল ধরে নট নড়ন চড়ন নট কিচ্ছু হয়ে পড়েছিল, তোদের ওই মহাযান তাদের পেটে গোঁত্তা মারতে মারতে, ফুটো করে দিয়ে উঠে চলে গেল কিনা? অ্যাঁ? তবে? ফুটো হলেই জল ঝরবে। তাই ঝরছে।

শিবাজী তার একটা কানকে অবহিত রেখে বলে উঠল, ও মেজোঠাকুমা, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কেন?

কেন?

মেজোঠাকুমা তাঁর নখদর্পণের ঝুলি থেকে ঝটপট জবাবটা সাপ্লাই করে ফেললেন, কেন জানিস, পৃথিবীটাকে সূয্যিঠাকুরের তেজদিষ্টি থেকে রক্ষে করতে। ঠাকুরটির তেজটি তো সোজা নয়। দুইয়ের মাঝখানে, তাই ওই পেল্লায় জলভরা মেঘের ছাউনির ব্যবস্থা। তা মানুষ যদি কেবলই দুর্মতির

বশে ভগবানের বিলি ব্যবস্থায় গোঁত্তা মেরে বেড়ায়, তো হবেই সব এলোমেলো কাণ্ড। এতটুকু একটু জলভরা তালশাঁস, তাতেও খোঁচা মারলে দু-পাঁচ ফোঁটা জল পড়ে। আর এ তো অফুরন্ত জলের আধার। সামান্য ওই তোদের ছাতের রিজারভারটা? দে না তার তলাটা ছ্যাঁদা করে? দেখ কী হয়? ওঃ! দাঁত বার করে হাসি হচ্ছে? হাস। হেসে নে। এরপর যখন বিলেত আমেরিকার সাহেবরা বলবে, 'হ্যাঁ তাই বটে!' আর সে-কথা খবরের কাগজে ছেপে বেরোবে; তখন ভক্তি করে মানবি। হুঁ। জানতে তো আর বাকি নেই আমার। ওই তো এখন কোন সাহেব এসে বলছে আকাশের ঊর্ধ্বে 'দেবলোক' বলে একটা 'লোক' আছে। সেখানে দেবতাদের বাস, শিগগিরই তাঁরা মর্তে নেবে আসবেন, বিশ্বাস করছিস তো সে-কথা?

দুর! কে বিশ্বাস করছে?

এখন করছিস না, ভবিষ্যতে করতে হবে। তোদের এই মেজোঠাকুমার জানতে কিছু বাকি নেই।

নাঃ! শব্দের সংকেতটা আর আসছে না। এদিকে ঘড়ির কাঁটা বোঁ বোঁ করে এগচ্ছে। আকাশে রোদ নেই বলে কি আর দুপুর বসে থাকবে? যেই না একটু জমিয়ে বসা হবে, সেই 'খাবার সময় হয়ে গেছে' ডাক পড়বে। আর পড়লে তো এক মিনিট দেরি করার জো নেই। ডাকের ওপর ডাক যাবে, এবং আসামাত্র, সমবেত কণ্ঠে ধিক্কার সংগীত শুরু হয়ে যাবে, আশ্চর্য! আড্ডা পেলে আর হুঁশ থাকে না! ডিসিপ্লিন বলে কিছু নেই? ওদের বাড়িটাই-বা কেমন? ইত্যাদি...

'ওদের বাড়ির' দিকে কান খাড়া রেখে শিবাজী অগত্যাই কথা চালায়, আচ্ছা মেজোঠাকুমা, তুমি বাপু স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সবই যদি জেনে বসে আছ তো আমাদের মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্রটা এখন থেকেই আউট করে দাও না বাবা! ভবিষ্যদ্‌বাণী করে ফেলো, 'ওরে বৎস, এই আসবে তোদের পরীক্ষায়।' ব্যস এখন থেকে মুখস্থ করতে থাকি।

মেজোঠাকুমা ভুরু কুঁচকে বলেন, পরীক্ষা কবে?

—সে অনেক দেরি! পঁচাশি সালের মার্চে-টার্চে। কিন্তু জেঠুর জ্বালায় উঃ। দেখলেই ভয় লাগে।

ফুলটুসি বলে ওঠে, আমারও। জেঠুর পায়ের শব্দ শুনলেই, বুক ধড়ফড় করে। এটা মাধ্যমিকের বছর বলে, পড়া ছাড়া আর কিছু যেন করার আইন নেই। গল্পের বই? যেন বাঘ ভালুক, ছুঁলেই হালুম করে খেয়ে নেবে আমাদের। আর—

মেজোঠাকুমা ভুরু কুঁচকে বলেন, 'পড়া পড়া' করে ঘটাই তোদের মারে ধরে নাকি?

—আহা। না না।

শিবাজী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, মারবেন কী? অহিংস মানুষ! নিরিমিষ খান! চুল আঁচড়ান না, সাবান মাখেন না, একঘণ্টা পুজো করেন। মারেন না। কোনোদিনও না। তবে ধরেন। হ্যাঁ ধরেন। দেখলেই ধরে ফেলেন।

মেজোঠাকুমা সন্দেহের গলায় বলেন, ধরে মানে? ধরে কী করে? বেদম ধমক ধামক দেয় বুঝি? ধমকের চোটে পিলে চমকে দেয়?

—না, না! তাও না। শুধু ওঁর সেই পেটেন্ট স্টাইলে না হেসেও, গোঁফের ফাঁকে একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে একটু জিগ্যেস করেন।

—কী জিগ্যেস করে?

কেন! শিবু, তোর মাধ্যমিকটা যেন কোন বছরে? সামনের বছরে না তার পরের বছরে? তাই হবে মনে হচ্ছে। তা ভালো ভালো। দু বছর আগে থেকেই যে পড়ার বই-টই একটু আধটু নাড়াচাড়া করছিস এটা কম নাকি? নয়তো বলবেন, গল্পের বই পড়ছিস? পড় পড়। গল্পের বই পড়লে মাথা খোলে। গোয়েন্দা গল্প হলে তো আরওই। আমরা বোকা বুদ্ধু ছিলাম, কেবলই পড়ার বই পড়ে মরতাম।

—বলে বুঝি?

মেজোঠাকুমা একটু মুচকে হাসেন।

—বলেন তো।

ফুলটুসি এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, কোথায় জেঠু?

—কোথায় আবার। ভজুবাবুর ওখানে গিয়ে দাবা খেলছে।

—এ মা! রাস্তায় এত জল!

—তাতে তো ওর ভারি পরোয়া। হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে খড়ম খটখটিয়ে চলে যায়। রোজই তো যাচ্ছে। বিষ্টি বলে মানছে?

ফুলটুসি বলে, হুঁ! আমাদের বেলাতেই যত দোষ। এত ইচ্ছে করছিল কাল, একটু জলে নামি, তো নামতে দিলে তো? নেহাত নাকি এই ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে বন্ধুরা আছে তাই বেঁচে আছি। তো সেদিন লালীদের ফ্ল্যাটে গিয়ে একটু গল্প করছিলাম, জেঠু টের পেয়ে বললেন কিনা, আহা আড্ডা দিবি না? দিবি বইকি! কিছু হবে না, থার্ড ডিভিশনটা তোর মারে কে। ব্রেন যখন পরিষ্কার। কবে পরীক্ষা তার ঠিক নেই। এখন থেকেই—

হঠাৎ থেমে গেল। শব্দ! শব্দ! খট খট! কট কট। খটাখট।

মেজোঠাকুমা বলে উঠলেন, কে কোথায় আবার এখন কাঠ ফাটতে বসল। দেখি—

শিবাজী বলল, উঃ।

ফুলটুসি বলল, আঃ।

বলবে না? কতক্ষণ থেকে মিনিট গুনছে।

অবস্থাটি তো প্রায় গ্রাম-গঞ্জের বন্যাপীড়িত জলবন্দিদের কাছাকাছি। কে বলবে জায়গাটা কলকাতা শহর, আর পাড়াটা শহরের মধ্যে রীতিমতো একটি নামিদামি পাড়া! আজ চারদিন চাররাত পাড়াটাকে দেখাচ্ছে একটা জলবেষ্টিত দ্বীপের মতো। আর এই শৌখিন ফ্ল্যাটওয়ালা চারতলা 'ভবন'টি যেন সমুদ্রে অর্ধমগ্ন একখানি জাহাজ।

তফাতের মধ্যে ওই গ্রামগঞ্জের লোকেরা নাকি খেতে টেতে পাচ্ছে না, মাঝে মাঝে আকাশ থেকে খাবার পড়ছে। আর এরা খেতে টেতে পাচ্ছে। চারবেলাই পাচ্ছে, এবং যার যার রান্নাঘর থেকেই সাপ্লাই হচ্ছে। কিন্তু সে আর এমন কী ব্যাপার? 'খাওয়াটা' তো একটা বিরক্তিকরই, অবশ্যই এই ফ্ল্যাটবাড়ির ছেলেমেয়েদের। বেশিরভাগই যারা সবেধন নীলমণি!

রাস্তায় বেরোতে-না-পাওয়া, বাড়িতে-আটকে-থাকা, এর থেকে শাস্তি আছে? এদের দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আবার গরমের ছুটি চলছে। স্কুল খোলা থাকলে, এমন দুর্দশা হত কিনা কে জানে।

তবে কেউ কি আর রাস্তায় নামছে না?

নামছে বইকী।

কর্তাদের তো অফিস-টফিস যেতে হবে!

রিকশা ডাকিয়ে, কোনোমতে পেন্টুল বাঁচিয়ে, রিকশায় উঠে পড়ে জল এলাকা পার হয়ে তারপর যেভাবে হোক। রিকশাওলাদের ইতিহাসে এখন সুবর্ণযুগ।

কিন্তু জল ঠেলে রিকশাটা ডেকে আনছে কে?

কেন ওরা! মানে কাজের লোকেরা। কোন বাড়িতে আর অন্তত একটা করে কাজের লোক না-থাকে? হয় একটা ফ্রকপরা খুকি, নয় একটা হাফপেন্টুল পরা খোকা। ওই হাঁটুজলই যাদের বুকজল। তা তারা ওই একবার কেন, দশবারই যাচ্ছে জল ঠেলে ঠেলে। বাজারে কিছু মিলছে কিনা দেখতে, কিছু না পাক, আলু পিঁয়াজ আর ডিম এনে মজুত করতে, খাবারের দোকান থেকে গরম সিঙাড়া আনতে, বাবুদের সিগারেট ফুরিয়ে গেলে সিগারেট এনে দিতে। তা সে তো করতেই হবে। ওদের কথা বাদ দাও।

ফুলটুসিকে একবারটির জন্যেও জলে পা ডোবাতে রাস্তায় নামতে দেওয়া

হয়নি বলে ফুলটুসি কাল খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, একবার নামলেই অমনি নিমোনিয়া হবে! আর সন্ধ্যা যে এতবার যাচ্ছে?

শুনে জেঠু অবাক হতবাক নির্বাক হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ ফুলটুসির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছিলেন। অতঃপর বলেছেন, সন্ধ্যার সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করছ? নাঃ। বলার কিছু নেই।

সবসময়ই জেঠুর 'বলার কিছু থাকে না', অথচ বলেও চলেন। বাড়িতে যাকে যা কিছু বলাবলির ভার জেঠুর ওপরই। অবশ্য মেজোঠাকুমা বাদে। তিনি যখন তখনই এই ভাসুরপোটিকে নস্যাৎ করে দেন, 'তুই থাম তো, তুই নিজের চরকায় তেল দিগে তো' বলে। তবে তাঁর পরেই জেঠু অর্থাৎ ঘটাই এ-সংসারের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

শিবাজীর বাবা পটাই (এঁদের সব ভালো ভালো নাম একটা করে আছেই। কিন্তু বাড়িতে আবার কে পোশাকি পোশাক পরে বেড়ায়?) ইনি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, তবে 'একে' আছেন। সেই 'এক'টি হচ্ছে 'জেঠু' সম্পর্কে তটস্থ কষিয়ে রাখা।

অ্যাঁ! জেঠু যে-কাজ পছন্দ করেন না তাই করছ? ছি ছি।... হ্যারে বেরোচ্ছিস, জেঠুকে জিগ্যেস করেছিস? সে কী! কী আশ্চর্য! তুমি জেঠুর মুখের ওপর কথা বললে? আমি যে এখনও তা ভাবতে পারি না!

কাজেই পটাইও কিছু ফ্যালনা নন।

আর ফুলটুসির বাবা ছোটাই তিনি তো আজ দিল্লি কাল বম্বে পরশু ভিশাখাপট্টম, তরশু কোয়েম্বাটুর। কাজেই ফুলটুসিকে পড়ার জন্যে মা-বাপ ছেড়ে এখানে থাকতে হয়। তা ফুলটুসির মা পত্রাঘাতে যতটা যা করতে পারা সম্ভব তা করে থাকেন।

ফুলটুসি শুধু তার ক্লাসের অন্য মেয়েদের অবাধ সুখ স্বাধীনতা অনুমান করে মর্মাহত হয়। শিবাজীও তাই!

এই যে এখন!

পাশের ফ্ল্যাটে একটু ক্যারম খেলতে যাবে, তাও কত শলা-পরামর্শ!

আসলে ক্যারম খেলায় কোনো উৎসাহই ছিল না এদের। ক্যারম বোর্ডের মালিক তিলকেরও না। রাস্তায় বেরোতে পেলে কে আবার ঘরে বসে খেলতে চায়? কিন্তু এই চারদিনেই যে চার বছর। তিলক তার সাতপুরুধুলো জমে থাকা বোর্ডটাকে পেড়ে মুছে-টুছে খাদ্যযোগ্য, মানে খেলাযোগ্য করে তুলেছে। ঘুঁটিগুলো কী ভাগ্যিস হারায়নি।

তবে খেলা জিনিসটা এমনই মজার, যত অবহেলিত অবজ্ঞারই হোক, খেললেই নেশা। এই যে সেবার পুজোর ছুটিতে 'ছোটাই' এসেছেন, দেখলেন শিবাজীর খুদে বোনটা সন্ধ্যার সঙ্গে লুডো খেলছে। তো কিছুতেই আর ওই বেচারি সন্ধ্যার ছয় পড়ছে না।

ছোটাই বললেন, দে, আমি তোর 'ছয়' ফেলে দিচ্ছি।

ব্যস! সেই যে দিলেন, আর ছক ছাড়লেন না। সন্ধ্যার মঞ্চ থেকে বিদায়। আর তারপর মানবিকতার বশে ছোটাই ওদের একটা নতুন লুডোর ছক কিনে দিয়েই, এই পয়মন্ত ছকটি নিয়ে অহরহ খেলে চললেন। খাবার আগে, খাবার পরে। ঘুমের আগে, জাগার পরে।

কার সঙ্গে?

কেন, বড়দার সঙ্গে। বড়দা ঘটাইয়ের তো অগাধ অবসর। রিটায়ার্ড মানুষ!

শিবাজী তিলকেরও ওই ধুলো ঝেড়ে নেওয়া পালিশ ঘষা ক্যারম বোর্ডেরও এই ক-দিনেই নেশা লেগে গেছে।

তিলকের বলা আছে বাবা অফিসে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই তোকে সাংকেতিক শব্দ করে জানাব বোর্ড পেড়েছি। সেই সাংকেতিকটি কী? আর কিছুই না, খালি বোর্ডে কটাকট খটাখট স্টাইকার পেটা। যা শুনলে কাঠ কাটার শব্দ বলে ভ্রম হয়।

— আজ এত দেরি যে?

শিবাজীর প্রশ্নে, তিলক তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে আস্তে কথার ইশারা করে বলল, আর বলিস না! বাবা বেরোবার আগেই বুড়োমামা এসে হাজির।

—বুড়োমামা! তিনি আবার কে? তোর তো একজনমাত্রই মামা জানি।

— সে তো আদি ও অকৃত্রিম! কিন্তু সবাইয়ের কথা কি জানা? বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম মামারা নেই?

—কৃত্রিম মামা!

ফুলটুসি প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, কৃত্রিম মামা! সেটা আবার কী জিনিস?

—জিনিস নয় হে, মানুষ! দস্তুরমতো মানুষ। কেন তুতো মামা? অকৃত্রিমের বিপরীত। বুড়োমামা হচ্ছে আমাদের তেমনি এক তুতো মামা। তিলক চোখ কুঁচকে বলল, এবং ডেঞ্জারাস মামা।

—ডেঞ্জারাস মামা!

শিবাজী বলে ওঠে, মামা আবার কতটা ডেঞ্জারাস হতে পারে রে? তাও আবার তুতো! এই সংসারে সব থেকে ডেঞ্জারাস প্রাণী কে জানিস?

—কে?

সবচেয়ে ডেঞ্জারাস প্রাণী হচ্ছে ব্যাচিলার জ্যাঠামশাই। বুঝলি? আইবুড়ো জেঠু!

এই।— তিলক বলে, বুড়োমামার ব্যাপারটা—

—আরে বাবা যে ব্যাপারই হোক—

শিবাজী ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে— যে ব্যাপারই হোক মামা আর কতই পারে? অন্য বাড়ির লোক! তাও তুতোমামা! আরও দূর বাড়ির! বড়োজোর আজকালকার ছেলেমেয়েদের মুণ্ডুপাত করতে করতে তুলোধোনা করে ছাড়তে পারে।

তিলক অবাক হয়ে বলে, 'কী' করতে পারে?

ফুলটুসি হিহি করে বলে, তুলোধোনা জানিস না? হিহি, তা না জানতেও পারিস। মেজোঠাকুমার পাঠশালায় তো মানুষ হোসনি। 'তুলোধোনা' মানে হচ্ছে যাকে ধরবে, তার আর 'কিচ্ছু' রাখবে না। ধুনুরিরা যেমন তুলোগুলোকে ধাঁইধপাধপ পিটিয়ে তাদের বাতাসে উড়িয়ে দেয় প্রায় তেমনি আর কি! পিটুনিটা লাঠিতে না হয়ে কথাতে এই যা! তা মামা মেসো পিসেদের কাজই তো এই। আমার বড়োমামা তো বাড়ি ঢুকেই বলে উঠবেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের কথা আর বলিস না— ...ওঃ! যা হচ্ছেন সব।' বলেই সেই তাদের কথাই বলতে শুরু করবেন। থামবেন না। মানে যতক্ষণ না মুখ চালাবার অন্য ব্যবস্থা করে মুখটি বন্ধ করা হবে ততক্ষণ চালিয়ে যাবেন— এইসব 'আজকালেরা' কত অসভ্য, কত অবাধ্য, কত উদ্ধত, অবিনয়ী, সৌজন্যবোধহীন, কত আত্মকেন্দ্রিক, অলস। কর্মবিমুখ। তাদের মধ্যে কত অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব। ধৈর্য সহ্যের অভাব। লক্ষ্মীছাড়াদের লঘুগুরু জ্ঞান নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, ভালোবাসা নেই, দায়িত্বজ্ঞান কিচ্ছু নেই। থাকার মধ্যে আছে রাগ, তেজ, মেজাজ, জেদ— ফ্যাশান অহংকার—

ঘরের কোণে জানলার ধারের সোফাটায় বসে তিলকের পিঠোপিঠি দিদি ঝিলম একটা গল্পের বই পড়ছিল, মুড়ে রেখে বলল, নাঃ, বইটা আর তোরা শেষ করতে দিলি না। শেষ হয়ে আসছিল। তো হ্যাঁরে ফুলটুসি, তোর বড়োমামা একা এত কথা বলেন? জলে স্থলে আকাশে বাতাসে অবশ্য সারাক্ষণ সমবেত কণ্ঠে এই সবই শোনা যায়, কিন্তু একা—

ফুলটুসি বলে ওঠে, ও ঝিলমদি, এ তো শতাংশের একাংশও নয়। স্টক অফুরন্ত।

—তা তুইও তো খুব মুখস্থ করতে পারিস বাবা। যা গড়গড়িয়ে বলে গেলি। হি হি, তুই হিস্ট্রিতে অনার্স নিস।

শিবাজী বলে ওঠে, আর ‘ইংলিশ মিডিয়া-এ সমালোচনা করেন না?

ফুলটুসি বলে ওঠে, ও বাবা, তা আবার নয়? বলব কী সে-প্রসঙ্গ উঠলে, দাদুশুদ্ধু রণক্ষেত্রে নেমে পড়েন। দেশের এই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর ফলেই যে দেশ উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, ছেলেমেয়েরা সব অমনিষ্যি হয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে কচুপোড়া, কেবল ফ্যাশান শেখার কারখানা। এর থেকে ঢের ভালো ছিল গ্রামের পাঠশালাগুলো। তাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালো ভালো সব গুণের বিকাশ হতো। আর এই ইংলিশ মিডিয়াম? যত নষ্টের গোড়া।

শিবাজী নিশ্বাস ফেলে বলে, সে যে যা বলে বলুক, জেঠুর কাছে কেউ লাগে না। চিরকাল জেলখানার আসামি হয়ে আছি। ওনার দৃষ্টির আড়ালে একটি নিশ্বাস ফেলারও উপায় নেই। তোদের ‘ফ্রিনেস’ দেখলে হিংসে হয়।

হঠাৎ তিলকও একটু অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, হায়! কে কার বিষয় কতটুকু জানে?

ঝিলম বলল, এই, বুড়োমামা বোধ হয় চানের ঘর থেকে বেরোল।

ফুলটুসি তাড়াতাড়ি বলল, এই ঝিলমদি, বুড়োমামা কেন ডেঞ্জারাস সেটা তো বললে না?

ঝিলম একটু চাপা হাসি হেসে বলল, সাংঘাতিক হাত দেখতে পারে। দারুণ, দুর্দান্ত!

—হাত দেখতে পারেন! অ্যাঁ!

শিবাজী ফুলটুসি সমস্বরে বলে ওঠে, অ্যাঁ! এটা বুঝি খারাপ হল?

—একটু হল বই কী! শুধু তো ভূত ভবিষ্যৎই বলতে পারেন না, হাত দেখে তার স্বভাব প্রকৃতি বলে দিতে পারেন যে। ছোটোপিসি বুড়োমামার কাছে হাত দেখানোর পর থেকে রাগ করে আর এ-বাড়ি আসে না।

—ওমা! কেন?

বুঝতে পারছিস না? বুড়োমামা বলে দিয়েছিল মহিলাটি ঝগড়ুটে, রাগী, হাড়কেপ্পন, আর বদমেজাজি! ব্যস। হয়ে গেল। কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেছল কিনা!

ফুলটুসি বলল, তা হোক গে। আমরা তো আর তেমন নয় বাবা! আমরা হাত দেখাব। কী মজা! কী মজা! ও তিলক, কখন দেখা হবে বুড়োমামার সঙ্গে?

পেছন থেকে দৈববাণীর মতো অকস্মাৎ উচ্চারিত হল, হবে! হবে। আগে পেটে কিছু ভালোমন্দ মাল চালান করে নিই! যার জন্যে আসা।

যার জন্যে আসা! হ্যাঁ তাই তো! আমহার্স্ট স্ট্রিটের যে-মেসটিতে থাকেন উনি, তার রান্নাঘরে রাস্তার জল উপচে ঢুকে পড়ায় মেস ম্যানেজার সব্বাইকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন, যতদিন না জল নামছে, ততদিনের মতো কেটে পড়।

তো কোথায় আর কেটে পড়তে যাবেন বুড়োমামা, এমন একটি ভক্তিমতী তুতো বোন থাকতে? তাদেরও রাস্তায় জল? তাতে কী? ফ্ল্যাট তো তিনতলায়। আর রান্নাঘরে? শত অসুবিধেতেও অন্নপূর্ণা বিরাজিতা।

ঘটাই খড়ম খটখটিয়ে বাড়িতে ঢুকেই, এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, বাবুদের টিকি দেখছি না যে বউমা?

ফুলটুসিকেও উনি বাবুই বলেন। ছেলেদের সঙ্গে একই ইস্কুলে পড়ে যখন।

'বউমা' অর্থে শিবাজীর মা। ঘটাইয়ের ভাদ্রবধূ! বেচারি, ইতিমধ্যে বারতিনেক পাশের ফ্ল্যাটে দূত প্রেরণ করেছে। কিন্তু বাবুদের আনাতে পারেনি। প্রত্যেকবারই তারা জানতে চেয়েছে জেঠু ফিরেছেন কিনা, এবং উত্তর শুনে আশ্বস্ত হয়ে বলেছে, যা, একটু পরে যাচ্ছি।

বেচারি 'বউমা' এইমাত্র ভাবছিল, নিজেই একবার গিয়ে হিঁচড়ে 'টেনে আনি', সেই মহামুহূর্তে দণ্ডমুণ্ডের কর্তার আবির্ভাব। অর্থাৎ তার হৃৎকম্প!

অতএব সে মিনমিন করে যা বলল, তা ঘটাইয়ের ঠিক বোধগম্য হল না। ডাক দিলেন, মেজোখুড়ি! এরা কোথায়?

মেজোখুড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, ওমা এখনও আসেনি বুঝি? সন্ধ্যা যে ডাকতে গেল। আসবে কি! মস্ত আকর্ষণে পড়ে গেছে। তিলকের এক মামা না কে এসেছে। সে না কি হাত দেখতে জানে। তাই দেখাদেখি চলছে!

ঘটাই স্তম্ভিত গলায় বলেন, 'তাই চলছে।' আর তুমি সেটি আহ্লাদ করে বলছ? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেছ?

মেজোখুড়ি অবহেলায় বলেন, তা তুইও তো এই এতখানি বেলায় দাবা চেলে বাড়ি এলি!

—অ্যাঁ! আমি! আমি দাবা চেলে—

ঘটাই কিছুক্ষণ তাঁর খুড়ির মুখের দিকে অবাক, হতবাক, নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলেন, 'আমার সঙ্গে ওদের তুলনা করছ তুমি?'

—তা করব না কেন?

মেজোখুড়ির দৃপ্ত ঘোষণা, তুই একটা বুড়োধাড়ি, খেলায় বসে হুঁশ থাকে না। আর ওরা ছেলেমানুষ! একটা মজার ব্যাপার পেয়েছে—

—চমৎকার! এই তোমার প্রশ্রয়ে প্রশ্রয়েই বারোটা বেজে যাবে ওদের মেজোখুড়ি। এক-একটি হনুমান তৈরি হবে!

মেজোখুড়ি। অম্লান মুখে বলেন, ওটাই তাহলে তোদের মেজোখুড়ির হাতের গুণ! তোরাও তো আমার হাতেই তৈরি। যা দিকিন, রাস্তার জমা জলে পা দুটো ভালো করে ধুয়ে আয়! নর্দমার জলে একাকার! খুব রেগে গিয়ে পা ধুতে চলে যান ঘটাই।

আর? আর—

ফিরে এসে দেখেন, মেজোখুড়ি নাতিনাতনিদের কাছে দাঁড়িয়ে মহোৎসাহে বলছেন, তাই নাকি? তবে তো বাবু একবার বলে কয়ে ডেকে আনতে হয় তাকে! হাতটা একবার দেখিয়ে নিই, কবে মরব!

ঘটাই এই দৃশ্যের ওপর আর কী শাসন চালাবেন? যথারীতি না হেসেও গোঁফের ফাঁকে হেসে বলে ওঠেন, তুমি আবার একটা বুজরুকের কাছে হাত দেখাতে যাবে কি মেজোখুড়ি? তুমি তো সর্বজ্ঞ।

মেজোখুড়ি অবশ্য হারেন না। অবহেলায় বলেন, ওরে ঘটাই, সত্যি সর্বজ্ঞরাও নিজের মরণ তারিখ বলতে পারে না। আর না দেখেই বুজরুক বলছিস যে?

বুড়োমামা বললেন, আপনার হাত অতি উত্তম হাত মাসিমা। সম্রাজ্ঞী যোগ। পূর্ণ আয়ুর হাত! অর্থাৎ একশো বছর আপনার মারে কে?

মেজোঠাকুমা রেগে বলেন, একশো বছর! এই কথাটি শোনাবে বলে, তোমার জন্যে আমি গোকুলপিঠে, পাটিসাপটা বানিয়ে রাখলাম?

—অ্যাঁ, গোকুলপিঠে! পাটিসাপটা! আহা! কতকাল এসব বস্তুর নামও শুনিনি। মা মারা গিয়ে অবধি— ঠিক আছে আপনার যখন একশোয় এত আপত্তি, গোটা দশেক বছর না হয় ম্যানেজ করে নিচ্ছি।

—মাত্তর গোটা দশেক! ওতে আর কী হবে?... বউমা মাছের কচুরি ক-খানা ভেজে ফেলে তুমিও একবার হাতটা দেখিয়ে নাও তো। হাতের কাছে একজন হাত-দেখিয়ে পাওয়া গিয়েছে যখন।

তারপর অনুনয়ের স্বরে বলেন, অন্তত আর পাঁচটা বছর হয় না বাবা?

—বলছেন? দেখি তাহলে।

বুড়োমামা নাক টেনে বলেন, আপনার বউমার রান্নার হাতটি তো ভালোই মনে হচ্ছে। বুঝতেই পাচ্ছি হাতের রেখাও উত্তমই হবে।

মেজোঠাকুমা এবার ঘটাইয়ের দিকে তাকালেন। যেন বাড়িতে টিকে দিতে এসেছে। সবাই একটা করে নিয়ে নিক হাতটা বাড়িয়ে।

—তুইও দেখিয়ে নে ঘটাই হাতটা। পটাই তো বাড়ি নেই।

ঘটাই হাঁ হাঁ করে উঠলেন। বললেন, আমি ওসব বিশ্বাস-ফিশ্বাস করি না। আমার দরকার নেই। যাদের দেখা দরকার দেখুন। ওই যে মূর্তিমানেরা দাঁড়িয়ে আছেন।

ওদের? ওদের তো বলেই দিয়েছি। স্রেফ গাড্ডু। আশ্চর্য, দুজনের একদম এক।

গাড্ডু তো?

জেঠু খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলেন, সে আর আপনি হাত গুনে নতুন কী বলবেন? সে-কথা আমি ওদের জন্মের আগে থেকেই জানি।

বুড়োমামা বহুকাল চোখে না দেখা খাবারের রেকাবিটি আর মাছের কচুরির প্লেটটি টেনে নিয়ে বলেন, তবে কি-না এ কথাও বলে দিয়েছি, মনের বল আর চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। সেই যে ইতিহাসে না পুরাণে, কোথায় যেন আছে জানেন নিশ্চয়ই, বিখ্যাত পণ্ডিত পাণিনি? তো পাণিনির হাতে নাকি 'বিদ্যের রেখা' বলে কিছু ছিল না। হাতের চেটো ল্যাপা পোছা। কিন্তু জেদ চাপল বিদ্যাস্থানে রেখা বানিয়ে ছাড়বেন। ব্যস যে-কথা, সেই কাজ, একটু শামুকের খোলা নিয়ে হাতের চেটোর এদিক থেকে ওদিকে ফালা দিয়ে রেখা বানালেন। তারপর তো কে না জানে? অদ্যাবধি পাণিনির নাম টিকে আছে। তাই বলেছি চাই চেষ্টা আর—আহা মাসিমা, কী জিনিসই খাওয়ালেন! বহুকাল পরে এমন—আর বউমা, আপনার মাছের কচুরিও কী গ্র্যান্ড। ফ্লার্স্ট ক্লাস। আহা আপনার ছেলেটি যদি এই কোয়ালিটির হতো। আর দু-খানা যদি বাড়তি থাকে—

চেটেপুটে খেয়ে-দেয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু তার বিনিময়ে?

তার বিনিময়ে ঠিক যাত্রাকালে স্নেহময়ী মাসিমার বুকের মধ্যে একটি ছুরি বিঁধিয়ে দিয়ে গেলেন।

বুড়োমামা মেসে ফিরে গেছেন, আকাশ রোদে ফাটছে। বোঝা যাচ্ছে ভগবানের জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তটি ঠিকই আছে। এখন আবার না খরা হয়, সেই ভাবনা।

কিন্তু?

কিন্তু বুড়োমামার 'মহাজ্ঞানযান' একখানি গোঁত্তা মেরে জেঠুর বাড়ির এই ছেলেমেয়ে দুটোর বুদ্ধির ঘটে যে-ফুটোটি করে দিয়ে গেলেন সেটির কী হয়?

ওরা বলেছে, হাতের রেখায় যখন গাড্ডু খাওয়াটাই অবধারিত তখন আর মিছিমিছি খেটে লাভ কী? আয় আমরা যত ইচ্ছে গল্পের বই পড়ি। যত ইচ্ছে আড্ডা দিই, যত ইচ্ছে খেলি।

এখন গরমের ছুটি ফুরিয়েছে। সবাই স্কুলে এসে জুটেছে। একই স্কুলে একই ক্লাসেরই তো ওরা। শিবাজী ফুলটুসি তিলক। তিলক বলে, ঠিক আছে। আমিও তোদের সঙ্গে আছি।

শিবাজী রেগে বলে, ইয়ার্কি মারা হচ্ছে? তোকে ফেল করানোর সাধ্যি তো ইউনিভার্সিটির ঠাকুরদারও নেই।

—আর যদি কোশ্চেন পেপার ছিঁড়ে ফেলে সাদা কাগজ রেখে চলে আসি?

—দ্যাখ বাজে গুল মারিসনে। আমরা হলাম মোস্ট অর্ডিনারি, আমাদের কথা বাদ দে। তুই বাবা চিরকালের ফার্স্ট বয়।

তিলক দুঃখিতভাবে বলে, ফার্স্ট বয় কি সাধে হতে হয়েছে রে শিবাজী! বাবাব 'অ্যামবিশন'! তাঁর ছেলেকে ফার্স্ট বয় হতেই হবে। আর মাধ্যমিকে যতগুলো সম্ভব লেটার আর স্টার পেতে হবে। ফার্স্ট সেকেন্ড হলে তো কথাই নেই। কাজেই আমার ভাগ্যে সারাজীবন 'হ্যাট হ্যাট ঘোড়া হ্যাট'! মাঝে মাঝে এত বেজার লাগে, ইচ্ছে হয় নিই একবার এই অত্যাচারের শোধ। ফেলই করি! দেখি কি করে বাবা!

—এই ধ্যাত!

মেজোঠাকুমার পাঠশালার পড়ুয়া পাকা-কথা-জানা ফুলটুসি বলে—চোরের ওপর রাগ করে তুই মাটিতে ভাত খাবি?

তিলক বলে, এক এক সময় তাই ইচ্ছে হয় রে। আচ্ছা দৈবক্রমে দিদি না হয় ফার্স্ট হবার জন্যেই জন্মেছে, কখনও চুড়োয় ছাড়া নীচের হয়নি দিদি, তাই বলে আমাকেও তাই হতে হবে? জানিস ছোটোবেলায় একবার বাবাকে বলেছিলাম, দিদি 'ভালো মেয়ে'—বাবা বলল, 'মন দিয়ে খাটলে তুমিও ভালো ছেলে হবে'। আমি বলে ফেলেছিলাম তুমি রোজ এক বাক্স করে সাবান মাখলে মা-র মতন ফর্সা হবে? বাবা রাগ করে সাত দিন কথা বলেনি আমার সঙ্গে। আর সেদিন বলে ফেলেছিলাম, আচ্ছা বাবা, তোমাদের কালে সব্বাই ফার্স্ট হত? সাধারণ ছেলে বলে কিছু ছিল না? বাবা রাগ করে ভাত

না খেয়ে অফিস চলে গিয়েছিল।... এই অবিচারের শোধ নিতে ইচ্ছে করে না? বল। তোমার সাধ তোমার ছেলে ফার্স্ট হোক। কিন্তু সেই সাধটি বাবা মেটাতে হয় কাকে বল? গা জ্বালা করে এক এক সময়।

তা বলে তুই যেন সত্যিই গায়ের ঝাল মেটাতে ওইসব যা তা করিস না তিলক!

ফুলটুসি পাকা গিন্নির মতো বলে, বাবা মা তো ভালোর জন্যেই বলেন! আর তুই তো রাগ করে যাই বলিস সত্যিই ভালো ছেলে। আমাদের মতো তো না। আমার মা-ও কি বলে না ওসব? সামনে পায় না, চিঠিতে লেখে, তোমার ওপরই তাঁর জীবনমরণ নির্ভর করছে। আমি রেজাল্ট খারাপ করলে— মাকে গলায় দড়ি দিতে হবে, বিষ খেতে হবে, গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে।

হঠাৎ হি হি করে হেসে ওঠে ফুলটুসি। আমি না, হি হি, একবার লিখেছিলাম, মামণি গো—কোনটার পর কোনটা করলে, তিনটেই করে ওঠা যায়? তাতে না হি হি মা-র বদলে বাবার এক লম্বা চিঠি, মাকে এইভবে হৃদয়হীনের মতো চিঠি দিয়েছ তুমি! কত দুঃখেই না একটিমাত্র সন্তানকে দূরে রাখতে হয়েছে আমাদের।... এইসব। একমাত্র সন্তান হওয়া যে কী জ্বালা রে। দশজনের মতো খেতে পারলে ভালো হয়, দশজনের মতো জামা জুতো পরতে পারলে ভালো হয়, দশজনের মতো পড়তে পারলে ভালো হয়। কিন্তু এখন আর উপায় কী? হাতে যা লেখা আছে, তা ছাড়া তো কিছু হবে না? কী যে করে গেল তোর বুড়োমামা? একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। সত্যিই ডেঞ্জারাস!

কিন্তু সেই হাস্যবদন বুড়োমামা কি শুধু ওই ছেলেমেয়ে দুটোকে ডুবিয়ে দিয়ে গেছেন? বেচারি মেজোঠাকুমাকে? একেবারে যাত্রাকালে হঠাৎ একখানা ছুরি বসিয়ে দিয়ে যাননি কি?

হ্যাঁ একেবারে যাত্রাকালে বুড়োমামা, ফস করে ঘটাইয়ের হাতটা টেনে ধরেই চোখ বুলিয়ে চমকে শিউরে মাথায় হাত দিয়ে বলে উঠেছিলেন, কী সর্বনাশ! এ যে খুনির হাত!

খুনির হাত!

ঘটাই হাত টেনে নিয়ে বলেছিলেন, বুজরুকির আর জায়গা পাননি?

বুড়োমামা বলে গিয়েছিলেন, ভগবান করুন যেন বুজরুকিই হয়। তবে এ- হাত খুনির না হয়ে যায় না।

তাহলে? ছুরি ছাড়া আর কী?

ছেলেমেয়ে দুটোর হাত ‘গাড্ডুমার্কা’, আর তাদের জেঠুর হাত ‘খুনির’! যোগফল? দুইয়ে দুইয়ে কী হয়, চার ছাড়া?

দিনেরাতে খাওয়া ঘুচেছে, ঘুম ঘুচেছে মেজোঠাকুমার। ভেবে ভেবে এখন শেষ ভরসা ধরেছেন সেই জিনিসটি? সেই একটা জোগাড় করতে পারলে সমস্যার সমাধান!

কিন্তু কে জোগাড় করে এনে দেবে সেই দুর্লভ বস্তুটি? কে ব্যাপারটা চাউর না করে বসে গোপন রাখবে? হাতের কাছে তো মাত্র ওই সন্ধ্যা। ফ্রক পরা খুকিটি।

তা কাঠবিড়ালিতেও সাগর বাঁধে!

ফ্রকের মধ্যে লুকিয়ে কাগজ মুড়ে নিয়ে এসে সন্ধ্যা একমুখ হেসে বলল, পেয়েছি ঠাকুমা।

—পেয়েছিস? অ্যাঁ। কই দেখি? আয় এদিকে চলে আয়। বলিস্‌নি তো কাউকে?

—ইস! আমি তেমনি নাকি?

—চল তোকে ঠাকুরের পেসাদ সন্দেশ চন্দরপুলি দিই গে। হ্যাঁ রে তো ওই টাকাতেই হল?

—হল ঠাকুমা! কী আশ্চর্য্যি ঠিক ঠিকটি হল। তোমার কথা মতন সেই শাকউলিকে তো বলে রেখেছিলুম। ‘ঠাকুমা বলেছে এনে দিতে পারলে দামের জন্যে আটকাবে না।’ তা আজ যখন জিনিসটা দিয়ে শুধোল কত এনেছ? আমি তোমার দশ টাকার নোটখানা দিয়ে বলুম, ‘এই এনেছি, এতে হবে? তো বুড়ি বলল, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় হয়েছে গো!’

মেজোঠাকুমা দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, হতেই হবে! ভগবানের নাম করে পাঠিয়েছি।

তা জিনিস তো জোগাড় হল, কিন্তু কাজে লাগানোটা কীভাবে ঘটিয়ে তোলা যায়।

তা চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই। তুললেন একদিন খপ করে।

—এই তোরা আর বইখাতা ছুঁচ্ছিস না কেন রে?

—ছুঁয়ে কী হবে? পরিণাম তো জানাই হয়ে গেছে।

মেজোঠাকুমা রেগে বললেন, অমনি জানা হয়ে গেছে। কাগে কান নিয়ে গেছে তো কানে হাতটা না দিয়েই কাগের পেছনে ছুটতে হবে?

—এ মা। তুমি বুড়োমামাকে কাগ বললে?

ফুলটুসি বলল, জান, ঝিলমদি বলেছে, বুড়োমামার কথা অকাট্য!

—যাক! অভীষ্ট সিদ্ধি। এখন মেজোঠাকুমা অনায়াসেই বলে উঠতে পারেন, এতই যদি অকাট্য, তো সেটাই বা করছিস না কেন?

—কোনটা?

—কেন, সেই শামুকের খোলা?

—শামুকের খোলা? সেটা আবার কী জিনিস?

রেগে গেলেন মেজোঠাকুমা, কী জিনিস জান না? বলে যায়নি তোদের গনৎকার? ওই দিয়ে হাতের চেটোয় একটা ফালা দিতে পারলেই হয়ে গেল।

শিবাজী বলল, তুমি এসব বিশ্বাস কর মেজোঠাকুমা?

ঠাকুমা ক্রুদ্ধ হল, করব না? কেন করব না? যদি 'গাড্ডু' বিশ্বাস করতে হয় তো, ওই মানিনীকেও বিশ্বাস করতে হবে!

মানিনী নয় মেজোঠাকুমা, পাণিনি।

তা সে একই কথা। তো বিশ্বাস করলে তো করলে। অবিশ্বাস করলে তো করলে। দু-নৌকোয় পা কেন?

শিবাজী বিব্রত মুখে বলে, তো শামুকের খোলা পাব কোথায় শুনি? মেজঠাকুমা এক গাল হেসে বলেন, ওমা। অভাব কী? বাড়িতেই তো রয়েছে।

—বাড়িতে? কোথা থেকে এল?

নাতি-নাতনি অবাক!

ঠাকুমা আরও একগাল হেসে বলেন, গেরস্থবাড়িতে সব রাখতে হয় রে। সমুদ্দুরের ফেনা, সাগরের ঝিনুক, কুমিরের তেল, বাঘের নখ, পুরোনো ঘি, শাঁখের গুঁড়ো, তুলসীতলার মাটি। কী নয়? একখানা শামুকের খোলা আবার বেশি কী? তবে ওষুধ শুধু জোগাড় করলেই তো হয় না, সেবন করতে হয়। ওই তোদের পাণিনি কি আর শুধুই হাতে ফালা দিয়ে বসে থেকেছিল? পুঁথিপত্তর নাড়েনি? সেইটি বুঝে কাজ করতে হয়, এটা মানবি তো?

ঘটাই খবরের কাগজ পড়ছিলেন, দেখলেন দুটো ছেলেমেয়ে স্যুট করে বারান্দার দিকে চলে গেল। তা গেলেই তো আর তিনি ছাড়বেন না। 'মারেন না বটে', তবে ধরেন তো? ধরলেন।

অ্যাই দুজনের হাতের তেলোয় ব্যান্ডেজ কেন রে? এটাই বুঝি তোদের ইস্কুলের লেটেস্ট ফ্যাশান?

ফুলটুসি ঝংকার দিল, আহা ফ্যাশান আবার কী?

—তাহলে বোধ হয় বুড়োধাড়ি দুটোতে আঁচড়াআঁচড়ি করেছিস!

ফুলটুসি ফিক করে হেসে ফেলে বলে, আহা আমরা বুঝি বেড়াল?

—তবে ব্যান্ডেজ কিসের?

—এমনি।

—এমনি! এমনি হাতে একটা ব্যান্ডেজ! বল কেন?

মেজোঠাকুমা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, সবসময় টিকটিক করিস কেন বল তো? ও আমার মানত।

বলবেন না? ওর হাতটা খুনির না? রেগে গেলে কী হয় আর না হয়।

—মানত! হাতে ব্যান্ডেজ মানত! আমি ঘাস খাই? এই তোমার প্রশ্রয়েই গোল্লায় গেল।

মেজোঠাকুমা বললেন, ওই তো দশা আমার। না হলে আর তুই এই নিধিটি হোস!

—উঃ। বুড়ো মানুষরা তো তীর্থেও যায়!

ঘটাই ভাবলেন, এদের এই মাধ্যমিকের বছরটাও যদি মেজোখুড়ি কাশীবাস করতে যেতেন!

অবশ্য বসে বসেই মেজোখুড়ির 'বন্ধ রান্নাঘরে'র কাল্পনিক দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠল। ঘটাইয়ের নিরিমিষ খাওয়ার পাতে কে জোগান দেবে, মোচার ঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, পোস্তর বড়া, ধোঁকার ডালনা, কচুর শাক, সজনেডাঁটার চচ্চড়ি,, ডুমুরের চপ!

তা একটু না হয় কৃচ্ছ্রসাধনই করতেন ঘটাই, তবু ছেলেমেয়ে দুটোকে বাগে পেতেন। ছোটাই মেয়েটাকে তার জেঠুর ভরসাতেই তো কলকাতায় রেখে দিয়েছে সব বিষয়ে চৌকস করতে। কিন্তু বাগড়া দিতে তো ওই মেজোখুড়িটি রয়েছেন। থাকবেনও। এখন আর ভুলিয়েভালিয়েও কাশী পাঠানো যাবে না। কারণ সামনের পুজোয় ছোটাইরা আসছে। পুজোর পরই তো ফুলটুসির প্রি-টেস্ট। এবার আর ও মা-বাপের কাছে যাবে না। ওরাই আসবে।

. .

দেখতে দেখতেই দিন যায়। পুজোও এল। ছোটাই আর ছোটাই গিন্নিও এলেন। আর আসামাত্রই তিনি শিউরে উঠলেন। ফুলটুসি! তুমি নাকি নাচের ক্লাস ছেড়ে দিয়েছ?

শিবাজীর খুদে বোনটা বলে উঠল, ক-বে। আমাকে তো রোজ রোজ একা যেতে হয়।

—আশ্চর্য, ছেড়ে দিলে কী বলে? জান, নাচ একটা যোগব্যায়াম! হঠাৎ ছেড়ে দিলে ফিগার খারাপ হয়ে যায়।

—নাচতে আমার ভালো লাগে না।

—ভালো লাগে না?

ফুলটুসির মা আকাশ থেকে পড়লেন, এতবড়ো একটা পৃথিবীব্যাপী শিল্প। আমার তো এখনও নাচ শিখতে ইচ্ছে করে। জীবনে তো সুযোগ পাইনি।

ফুলটুসি মা-র এখনও ইচ্ছে করে শুনে মা-র ফিগারের দিকে তাকিয়ে কষ্টে হাসি চাপে।

—তা গানের ক্লাসগুলো করছ তো নিয়মিত?

—বাঃ। কখন সময় হয়? জেঠু কেবল পড়াপড়া করেন!

ফুলটুসির মা বসে পড়লেন।

—নাচ ছেড়ে দিয়েছ। গানের ক্লাসের সময় পাও না! লোকের কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে ফুলটুসি? ভেবে যে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। সবাই জানে আমার মেয়েকে আমি কলকাতায় ফেলে রেখে দিয়েছি। 'তৈরি' করার জন্যে। কী তৈরি হচ্ছ তাহলে? তাই কি মাধ্যমিকে স্ট্যাণ্ড করে আমার মুখ রাখবে?

ফুলটুসি বলল, একজামিনারদের কি তোমার মুখ রাখবার চিন্তা আছে মা? তাই দেবে চারটি বেশি নম্বর?

ফুলটুসির মা এলিয়ে পড়ে বলেন, তার মানে সুইসাইড করা ছাড়া আমার আর কোনো গতি নেই।

তারপর উঠে, চান-টান করে চা খেয়ে ব্যাগের পেটটি মোটা করে টাকা ভরে নিয়ে দিদির সঙ্গে পুজোর বাজার করতে বেরিয়ে গেলেন। 'দিদি' অর্থাৎ শিবাজীর মা। নিজের বাজারটাও স্থগিত রেখেছিলেন, এখন মহোৎসাহে চলতে লাগল সেই পর্ব।

ফুলটুসি বলে, মা কলকাতার বাজারে যত শাড়ি আছে, সব নিয়ে যাবে?

মা রেগেই লাল।

সব? একটা দোকানের একটু কোণও শেষ করতে পেরেছি? আমার ওই হতবিচ্ছিরি দেশটায় পাওয়া যায় এসব শাড়ি? তবে তুমি যদি রেজাল্ট খারাপ কর, এ সবই পড়ে থাকবে, আমার আর পরা হবে না।

এই দায়িত্ব ফুলটুসির।

পুজোর বাজার পর্ব শেষ হল। শেষ হল পুজো পর্ব, বিজয়া পর্ব। ছোটাইরা ফিরে গেলেন তাদের সেই হতবিচ্ছিরি দেশে। প্রি-টেস্ট মিটল, টেস্ট মিটল, অতঃপর সেই ভয়ংকর দিনও এসে গেল।

তিলক বলল, ওরে ফুলটুসি, 'মনে করো শেষের সেদিন ভয়ংকর'।

ফুলটুসি বলল, মনে করে রেখেছি। সুইসাইডটা মা কেন করতে যাবে আমিই আগে করে ফেলব।

আর বলল, তোদের থেকে আমাদের জ্বালা কত জানিস? তোদের নাচ-গান শেখা কম্পালসারি? নেভার! তোদের ফিগার নিয়ে মাথাব্যথা আছে? চুল থেকে নথ পর্যন্ত সবকিছুর পরিচর্যা করতে হয়? আবার রান্নাটিও শিখে রাখতে হয়? সেলাই? বোনা? হাতের কাজ? নেভার! নেভার! মেয়েদের মতো দুঃখী আর কেউ নেই। আমি ঠিক করে ফেলেছি যা করবার করবই!

শিবাজী তো পরীক্ষা দেওয়ার পর অবস্থা বুঝলে, নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। তিলকের দৃঢ় সংকল্প, সাদা কাগজ রেখে চলে এসে বন্ধুর সঙ্গে পাড়ি দেবে।

এদিকে মেজোঠাকুমার মধ্যে অহরহ বিছের কামড়, ছুরির খোঁচা।... অত আদরের ঘটাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারেন না তিনি, ভয় করে। চোখেমুখে যেন 'খুনি খুনি' ছাপ দেখতে পান। কারণ হঠাৎ একদিন শিবাজী আর ফুলটুসির হাতের তালু দেখে মাথা ঘুরে গেছে তাঁর। শামুকের খোলার বিদারণ রেখা বেমালুম লোপাট! চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে উপায়? খুব ভুল হয়ে গেছল আইডিন লাগিয়ে বেঁধে দেওয়ায়। সেই 'পাণিনি' না কে, সে কি হাত ফালা করার পর আইডিন লাগিয়েছিল?

হায় ভগবান! এখন কাকে ধরেন তিনি? তেত্রিশ কোটির কাছে তো পুজো মানা হয়ে গেছে। শেষ ভরসা আবার সেই ওদের বুড়োমামা।

গোকুলপিঠে পাটিসাপটার নামে একশো থেকে দশটি বছর ম্যানেজ করে ফেলেছিল। মাছের কচুরির নামে আর পাঁচটি বছর। তো যে কমাতে পারে সে ইচ্ছে করলে বাড়াতেও পারে। খাতা দেখিয়েওলা মাস্টারদের মতোই তো। তাহলে আবার যদি একবার ডেকে আনিয়ে ওইসবকিছুর সঙ্গে সরুচাকলি আর ভাজাপুলি যোগ করা যায়, দেবে না বাড়িয়ে? হয়তো সব নম্বর একশোর ওপর তুলে দেবে! 'মাসিমা' বলে অত ভক্তি করল।

কিন্তু হায়! মেজোঠাকুমার এখন কপাল মন্দ। তিলকদের বুড়োমামা অফিসে দু'মাসের ছুটি নিয়ে কোন দেশে যেন বেড়াতে চলে গেছেন! মেজোঠাকুমার মনের মধ্যে সর্বদা বিছের কামড় হবে না?

একেবারে 'শেষ ভরসা' ছিল, যদি ওরা হঠাৎ একটু ভাল পরীক্ষা দিয়ে আসে, তাহলে অন্তত খুনের হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু সে আশায় ছাই পড়ল।

ঘটাই এসে হাঁক পাড়লেন, শুনেচ মেজখুড়ি? তোমার আদরের নাতি-নাতনীদের ভাষা! শিবুবাবু এসে জোর গলায় বলছেন, গাড্ডু আমার মারে কে!' আর ফুলুবাবু বলছেন, 'মরা ছাড়া আমার গতি নেই।' এইসব ছেলেমেয়েকে কী করতে হয়? অ্যাঁ? 'কী' করতে হয়?

'কী করতে হয়'। শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠল মেজোঠাকুমার। চোখে অন্ধকার দেখলেন। ওই খুনেটার হাত থেকে কী করে ওদের রক্ষা করবেন?'

কিন্তু রক্ষা করবার ভাবনা কি আর ভাবতে হল মেজোঠাকুমাকে? নিজেই তো তারা চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে গেল।

ঠিক দ-ুদিনের মাথায়, হঠাৎ যখন জানা গেল পাশের ফ্ল্যাটের সীতেশবাবুর ছেলে তিলক, 'নিরুদ্দেশ' হয়ে যাবার সংকল্প ঘোষণা করে চিঠি লিখে রেখে চলে গেছে, সেইদিনই গোলে হরিবোলের মধ্যে এরা দুজনও চিঠি লিখে রেখে হাওয়া হয়ে গেল।

শিবাজী লিখেছে, 'সামনে গভীর অন্ধকার। তাই নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করছি। বিদায়!'

আর ফুলটুসি লিখে গেছে, 'পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে একবার পৃথিবীটাকে একটু দেখে নিতে যাচ্ছি।'

ওদের বাড়িতে হই চই গোলমাল,পুলিশ আসাআসি, এই ফাঁকে এদের বাড়ির এই কাণ্ড!

ওই পুলিশদেরই ডেকে এ-বাড়িটাও দেখানো হল। কিন্তু পুলিশ আবার কবে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ করে দিয়েছে?

মেজোঠাকুমা বেঁকে বসলেন।

আমি আর এই শূন্যপুরীতে একদণ্ডও থাকব না। আমি তিষ্ঠোতে পারছি না। আমায় তোরা গাজনঘাটে পাঠিয়ে দে। সেখানেই পড়ে থাকিগে।

গাজনঘাটে।

হ্যাঁ, সেটাই মেজোঠাকুমার শ্বশুরের ভিটে। অর্থাৎ ঘটাই পটাই ছোটাইদের পিতৃভিটে! কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকবেন কী করে? সে তো জঙ্গল হয়ে আছে।

তাতে কি? আমার এখন জঙ্গলই মঙ্গল।... কেঁদেকেটে জেদ করে চলে গেলেন সেইদিনই!

মেজোখুড়ি সত্যি চলে যাচ্ছেন।

ঘটাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, আমি না হয় নিষ্ঠুর নির্মায়িক, ছেলেমেয়ে দুটোকে অধিক শাসন করি। কিন্তু সীতেশবাবুর ছেলেটা নিরুদ্দেশ হয়ে গেল কেন?

মেজোখুড়ি উদাসীনভাবে বললেন, তার কথা, সে জানে।

চলে গেলেন।

বলে গেলেন, আমি নিজের ইচ্ছে না হলে আসছি না। কেউ নিতে যেও না।

পৌঁছে দিয়ে এল পাড়ার একটি বেকার ছেলে। এসে বলল, উঃ। কী জঙ্গল। কী জঙ্গল। কী করে যে থাকবেন।

উপায় নেই। তাঁর বারণ।

বাড়িতে শোকের ছায়া! খাওয়া-দাওয়া বন্ধ বললেই চলে। ছোটাই আর ছোটাই গিন্নি এসেছেন। পটাই অফিসে ছুটি নিয়েছেন। খবরের কাগজে কাগজে, রেডিয়োয়, টিভি-তে নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা চলছে। 'শিবাজী ফুলটুসি তিলক' তিনজনের সম্পর্কেই। সীতেশবাবু এত কাতর হয়ে পড়েছেন যে এঁদের ওপরই ভার দিয়েছেন। কিন্তু সন্ধান নেই।

তারা কি আছে? এই ঘোষণা শুনছে?

ফুলটুসির মা-র কেঁদে কেঁদে চোখ মুখফোলা। এই যন্ত্রণার মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ল পরীক্ষার রেজাল্ট। আর সেও এক যন্ত্রণার ব্যাপার! যম যন্ত্রণাই বলা চলে।

এ-বাড়ির ছেলেমেয়ে দুটোর রেজাল্ট একেবারে ধন্যি ধন্যি করার মতো। যা অভাবনীয়। আর তিলক? ব্র্যাকেটে ফার্স্ট।

নতুন করে হাহাকার পড়ে গেল।

নতুন করে কাগজে বিজ্ঞাপন! 'তোমরা ফিরে এস'। তোমাদের পরীক্ষার ফল 'এই'। 'এই' ইত্যাদি।

ছোটাই বলল, মেজোখুড়ি না হয় নিয়ে আসতেই বারণ করেছেন। দেখা করতে বারণ আছে? এই খবরটা অন্তত দিইগে!

পটাই বলল, কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে?

ঘটাই বলল, কী জানি জঙ্গুলে বাড়িতে সাপেই খেল না নেকড়েতে খেল।

ছোটাইয়ের বউ বলল, সারাক্ষণ প্রাণের মধ্যে হাহাকার। আমিও যাব

তোমার সঙ্গে। ঘটাই বলল, আমিও যাই। বুকের মধ্যে কেমন জ্বালা জ্বালা করছে। ... পটাই আর পটাইয়ের বউ বলল, আমরা একা থাকতে পারব না এই শূন্য বাড়িতে। তাহলে আর খুদে মেয়েটা এবং সন্ধ্যাই বা বাকি থাকে কেন? চল সদলবলে।

নিজেদের বাড়ি। তবু বহুদিন যাওয়া আসা নেই। পাড়ার সেই ছেলেটাও সঙ্গে গেল। বলল, দেখুন এখন গিয়ে কী দেখেন। সাপে-কাটা হয়ে পড়ে আছেন কিনা।

শোকের সময় লোকবলই ভালো।

এতজন যাওয়া হচ্ছে, তাই বুকে বল।

তবু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছচ্ছেন আর ভাবনা, গিয়ে কী দেখবেন!

কী দেখলেন? কী দেখলেন ঘটাই কোম্পানি?

দেখলেন—

একটি ফাটা ভাঙা চৌকির ওপর সারি সারি তিন মূর্তিমান। তাদের সামনে এক একটি বড়ো কাঁসার বাটিতে মুড়ি বেগুনি।

স্তম্ভিত হয়ে বললেন, এর মানে?

'বললেন' না। সকলে মিলে একযোগে বলে উঠলেন,

এর মানে? এর মানে? এর মানে? এর মানে? এর মানে? এগিয়ে এলেন মেজোখুড়ি।

বললেন, বাছারা খাচ্ছে এখন আর কটুকাটব্য করতে বসিসনি বাপু। ওদের কোনো দোষ নেই। সব মতলব আমার। সব ষড়যন্ত্র আমার। আমিই এসব ব্যবস্থা করে, ওদের আগে পাঠিয়ে দিয়ে, পরে নিজে—

সকলে স্তম্ভিত।

ঘটাই অবাক, হতবাক, নির্বাক। তারপর বলে বলবার কিছু নেই। কিন্তু কেন?

কেন?

মেজখুড়ি উদাত্ত গলায় ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, কেন আবার? ছেলেমেয়ে দুটোকে খুনের হাত থেকে বাঁচাতে। গণৎকার বলে গেল। ওদের কপালে গাড্ডু। আর তোমার হাত খুনের। কী হয় এর ফলে? এদিকে— এই রোগাপটকা মেয়েটা! একে সমানে শাসানো হচ্ছে! পরীক্ষা খারাপ হলে গলায় দড়ি দেব, বিষ খাব, গঙ্গায় ঝাঁপ দেব।' মেয়ে বলল, মা কেন করতে

যাবে ওসব? আমিই করব। তো ভুলিয়ে ভুলিয়ে তুতিয়ে পাতিয়ে নিয়ে এসেছি। বলেছে, রেজাল্ট বেরোলে দেখে তবে জঙ্গল থেকে বেরোব।

হঠাৎ সমবেত কণ্ঠে একটি হাউ হাউ ক্রন্দনধ্বনি। ওরে বেরিয়েছে। বেরিয়েছে। খুব ভালো হয়েছে!

—অ্যাঁ।

—খু-ব ভালো হয়েছে!

মেজোঠাকুমা বিজয়গৌরবে নাতি-নাতনিদের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, হবে না? শামুকের খোলার গুণের কথা পুরাণে ইতিহাসে রয়েছে না? আহা আহা উঠছিস কেন? ফুলুরি ক-টা অন্তত শেষ কর। ওমা ছোটোবউমা ধূলোয় শুয়ে পড়লে যে? ওঠো ওঠো। গণেশের দোকান থেকে আর চারটি মুড়ি ফুলুরি আনিয়ে নিই, কোনকালে বেরিয়েছ। চা-ও পাবে, অবিশ্যি মাটির ভাঁড়ে। এখন আবার কান্নার কী আছে?

কিন্তু তিলক? সে তো ব্র্যাকেটে ফার্স্ট!

পটাই বললেন, তা তুমি এমন ছেলে, তুমি কেন এদের দলে?

তিলক একটু মধুর হেসে বলল, এই এদের সঙ্গে একটু এক্সকার্সনে এসে গেলাম। উঃ মেজঠাকুমার যা ফার্স্টক্লাস রান্না।

এ ঘরে এসে ফুলটুসি আর শিবাজী বলল, আমাদের সঙ্গে এইরকম বিশ্বাস ঘাতকতা! বললি—সাদা কাগজ গছিয়ে দিয়ে এসেছি।

তিলক মাথা চুলকে বলল, ভেবেছিলাম রে, কিন্তু কোশ্চেন পেপার হাতে নিয়ে কেবলই বাবার মুখটা চোখে ভাসে আর লিখে ফেলি।

—তা তখন বললেই পারতিস।

—বললে তোরা আমায় সঙ্গে নিতিস?

—উঃ। এতসব সামলেছেন মেজোখুড়ি!

ঘটাই বলে ওঠেন, ডেঞ্জারাস লেডি।

মেজোখুড়ি বললেন, তা না হলে আর তোমার মতন ডেঞ্জারাস ছেলে মানুষ করে তুলি? তোর হাতের রেখাটা মুছে ফেল ঘটাই। এই খুনির রেখাটা।

মুছে ফেলব? কী দিয়ে?

কেন শামুকের খোলা রয়েছে না? ও দিয়েই চেঁচে চেঁচে মুছে ফেললেই হবে।

নিজে বুঝে নিন

রাত নাগাদ বারোটা।

ভুরসুট পরগনার প্রতাপপুরের বড়োকর্তা জগদীশপ্রতাপ তাঁর কলকাতার বাড়ির তিনতলায় নিজের শোবার ঘরে একা একা ব'সে জোর আলো জ্বালিয়ে দুখানা মোটা মোটা খাতা সামনে বিছিয়ে হিসেবপত্র দেখছিলেন।

যদিও জমিদারির বারোটা বেজে গেছে কবেই। এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না; তবু 'বড়োকর্তা' নামটির মায়া ছাড়তে পারেননি জগদীশপ্রতাপ। এখনও প্রতাপপুরের কেউ 'বড়োকর্তা', না বললে মনে মনে যথেষ্ট চটেন।

চটবার কারণও বিদ্যমান আছে বইকী ! ওই 'প্রতাপপুর' তো তাঁরই ঠাকুরদার বাবা নরসিংহপ্রতাপের খাস 'পত্তন'। তাঁর নামেই প্রতাপপুর। তিনি নাকি দাবি করতেন তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতগুষ্টির।

তা যাগগে। কে কী না দাবি করছে।

তবে বোলবোলাও একখানা ছিল বইকী। জগদীশপ্রতাপের বাবার আমলেও ছিল কিছু কিঞ্চিৎ।

জগদীশ অবশ্য তাঁর বাপের ঠাকুরদা মহামান্য নৃসিংহপ্রসাদকে জ্ঞানে তেমন ভালো করে দেখেননি। আবছা মনে পড়ে, দীর্ঘদেহী এক ব্যক্তি, খুব ভোরবেলা

আকাশের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে সূর্যপ্রণাম করছেন। মন্তর পড়ছেন গমগমে গলায়।

এ ছাড়া আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না।

যা কিছু শোনা বাবার কাছে।

শুনতে পেয়েছেন সেই নৃসিংহপ্রতাপের জন্মদিনটি আর তাঁর জন্মদিনটি এক।

নৃসিংহপ্রতাপের সেদিন সত্তর বছরের জন্মতিথি।

সকালবেলা ঠাকুর মন্দিরে ভোগ-পুজো সব দেওয়া হয়ে গেছে। নৃসিংহপ্রতাপ তিলবাটা মাথায় ঘষে দিঘিতে চান করে এসেছেন এবং এসে খিড়কির পুকুরে একটি জিওলমাছ ছেড়ে দিয়ে নিজের দীর্ঘায়ু নিজেই কামনা করে পুজোপাঠ করেছেন। তখনও নো সাড়া না শব্দ।

দুপুরে যখন রুপোর থালা-বাসনে সত্তর প্রকার ব্যঞ্জন সাজিয়ে প্লাস বৃহৎ একটি রুইমাছের মুড়ো আর বড়ো জামবাটির একবাটি পরমান্ন নিয়ে জুঁই ফুলের মতো ফুরফুরে চামরমণি চালের ভাতটির সামনে খেতে বসেছেন, আর গালচের আসনের ধারেকাছে মস্ত একটা পিলসুজের ওপর প্রকাণ্ড একখানা পেতলের প্রদীপ পেটভর্তি খাঁটি গাওয়া ঘি নিয়ে দপদপ করে জ্বলছে।

আগের আমলে এটাই ছিল জন্মদিনের শুভকাজের অঙ্গ। কেক কাটাকাটির তো চলন ছিল না। আর বয়েস গুনে জ্বেলে দেওয়া মোমবাতির সারি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ারও পাট ছিল না। সেকালে লোকে বাতি নিভে যাওয়াটাই অলক্ষণ কুলক্ষণ মনে করত। তাই প্রদীপে পেটভর্তি তেল, মোটা করে সলতে।

আর খানদানি বাড়িতে প্রদীপের পেট ভরানো হতো তেলের বদলে ঘিয়ে। আর প্রথম অন্নটি মুখে দেওয়া মাত্তর ভোঁ ভোঁ করে তিনবার শাঁখে ফুঁ দেওয়া।

তা সেসব পর্ব মিটেছে।

তোয়াজ করে খেয়ে চলেছেন নৃসিংহ। সত্তরটি পদ, সবগুলো তো একবারও অন্তত মুখে ঠেকাতে হবে। তো ঠেকাতে ঠেকাতে যখন চাটনিতে এসে ঠেকেছেন, তখন আবার তিনবার ভোঁ ভোঁ শঙ্খধ্বনি।

কী হল? আবার শাঁখ?

জিজ্ঞেস করতে না করতেই, ট্যাঁ ট্যাঁ কান্নার শব্দ। সদ্যোজাত শিশুর গগনবিদারী পরিত্রাহী শব্দ।

ওটা আবার কী? কাঁদে কে?

বুড়ি পিসি কাছে বসে পাখা নাড়ছিল। বলল— ঘরে নতুন মানুষ এল। তোর ব্যাটার ঘরে নাতি জন্মাল।

—অ্যাঁ, তাই নাকি? তার মানে নৃসিংহপ্রতাপের প্রপৌত্র এল। তো আসবার কথা ছিল বুঝি?

—কথা ছিল বই কী। তো দু-দশদিন বাদে আসার কথা। আচমকা আজই তোর জন্মদিনে হানটান করে ভূমিষ্ঠ হয়ে বসল।

নৃসিংহ ক্ষীরের বাটিতে গোঁফ ডুবিয়ে মুচকে হেসে বললেন,— হুঁ। ব্যাটা খুব ধড়িবাজ হবে মনে হচ্ছে। ওরে কে আছিস। এই প্রদীপটায় আরও ঘি ঢেলে দিয়ে যা।

শুধু ঘি না, একেবারে খাঁটি গব্যঘৃত।

তো সেই প্রদীপ ঘি খেয়ে খেয়ে একনাগাড়ে জ্বলতে থাকল। ছ-দিন ছ-রাত। ষেটেরা পুজোর পরদিন সকালে তার ছুটি। রাতে বিধাতাপুরুষ কপালে লেখন দিয়ে যাবার কাজ সেটা অবধি।

বিধাতাপুরুষ কী লিখে গেলেন কে জানে। তবে সেই জগদীশের কাছে খাঁটি গব্যঘৃত এখন স্বপ্নের বস্তু।

সাবেকি মানটির ঠাটবাট রেখে চলছেন এখনও। ভাতের পাতে ঘি, দুধ, দৈ, চাটনি, পাতিলেবু, কম্পালসারি।

গাওয়া ঘি বলে দেশ থেকে ঘি আনান বেশি দাম দিয়ে তো সেই খাঁটি ঘিয়ের আড়াই ভাগ বনস্পতি। আর বাকি দেড়ভাগ ভঁয়সা।

তাহলে কী হবে। দেশের ঘি বলে ওতেই আত্মপ্রসাদ জগদীশপ্রতাপের।

‘প্রতাপ’-এর বালাই নেই কোথাও, তবু প্রতাপপুরের অহংকার।

ওই যে নৃসিংহপ্রতাপের সঙ্গে জন্মদিনের মিল তাই তাঁর সঙ্গে যেন কেমন একাত্ম অনুভব করেন। আবার বাপের মুখে শুনেছেন, চেহারাতেও নাকি মিল।

তবে?

হলেও অবস্থান্তর, মনে প্রাণে জগদীশ প্রতাপপুরের বড়োকর্তা। চালচলনে তদুপযুক্ত ছাপ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা।

এই যে রাতদুপুরে খাতাপত্তর নিয়ে হিসেবে বসেছেন, তো টেবিল চেয়ারের বালাই আছে নাকি? শোবার ঘরের মস্ত পালঙ্কটাকেই ‘কাছারি ঘরের ফরাশ’ মনে করে তার মাঝখানে জোড়াসনে বসে সামনে খুলে রাখা জাবদা খাতা দুটো থেকে কী সব মেলামিলি করছেন।

আগে আগে ভারী কাঁচের দোয়াতদানি সামনে বসিয়ে কলমে কালি ডুবিয়ে লিখতেন। ছেলে বলে বলে ফাউন্টেন ধরিয়েছিল। সম্প্রতি আবার ‘আরও সুবিধে’ দেখিয়ে নাতি ডট পেন ধরিয়েছে।

তা দেখছেন ব্যাপারটা মন্দ নয়। বেশ সুবিধের। কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুবিধে বাড়ছে বই কী! তবে অসুবিধেও যে বাড়ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, এ কথা জগদীশপ্রদাপ জোর গলায় ঘোষণা না করে ছাড়েন না।

এখন আর ছেলে তর্কে নামে না। তর্কটা নাতির সঙ্গে চলে। পাল্লাটা কোনদিকে ভারি, ডট পেনের না খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের তর্কের মীমাংসা হয় না।

রোজই হিসেব চলে।

টেবিলে খাওয়া আরামের না মাটিতে বসে খাওয়ার। প্যান্ট পায়জামা সুবিধের, না লম্বা কোঁচা ধুতির।

নাতির প্রশ্নের দাদুর জবাব,— পেন্টুল পাজামা তো তোদের একালে জমিদারে পরে, জমাদারেও পরে। কিন্তু লম্বা কোঁচা? কই দেখা দিকি কোনো জমাদারের... টেবিলে খাওয়া?

যেন অফিসকাছারিতে কাজ করতে বসা। মাটিতে আসন পেতে ছড়িয়ে বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা। হিসেব করে দ্যাখ।

তা সে যাক।

এখন জগদীশ যে-হিসেব নিয়ে বসেছেন, সেটি বেশ জটিল।

প্রতাপপুরের 'বাবুদের বাড়িটি' মানে নৃসিংহপ্রতাপের বানানো সেই প্রাসাদটির এখন এমন জরাজীর্ণ অবস্থা ঘটেছে যে, মেরামতি করে একটু ভদ্রস্থ করতে হলেও লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। আসবে কোথা থেকে সে-টাকা? আর সারিয়ে তুলেই-বা কী হবে? কে বাস করতে যাবে সেই ভুরসুট পরগনায় প্রতাপপুরে?

ছেলের মতে বেচে দাও বরং ঘরে কিছু আসবে। মরা হাতি লাখ টাকা। ওই ভাঙা বাড়িরও এখন অনেক দাম পাওয়া যাবে।

—ভিটে আবার বেচব কী?

বলে প্রথমে খুব রাগারাগি করছিলেন জগদীশপ্রতাপ। ক্রমশ যুক্তিতর্কে নিমরাজি! কিন্তু মুশকিল এই — নয় নয় করেও সেখানে এখনও অনেক আসবাবপত্তর। যাওয়াও হয় সেখানে। অন্তত জগদীশ তো যান।

সবাই যে 'বড়োকর্তা' বলে ছুটে আসে, এ-আহ্লাদ গৌরব কি দার্জিলিং, কাশ্মীর, নৈনিতাল পাহাড়ে গেলে হবে?

তা সেসব যখন চুকে বুকে যাচ্ছে জিনিসগুলো কী হবে? ছেলে আর বউমা বলল—এখানে কাজে লাগার মতো যা কিছু আছে নিয়ে আসুন। বাকি বিলিয়ে দিয়ে আসুন।

কিন্তু এখানে কাজে লাগবার মত অনেক কিছু তো একে একে আনা হয়েছে। আর কী আনা হবে? ঘরে ঘরে যে বৃহৎ বৃহৎ পালঙ্ক বসানো আছে, প্রকান্ড প্রকাণ্ড যে-কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকগুলো আছে এখানে সেখানে, বৈঠকখানা বাড়িতে যে-ঝাড়লণ্ঠনটা ঝুলছে সেগুলো বিলোতে চাইলে-বা নেবে কে? কার ঘরে এত জায়গা আছে?

তা ছাড়া আর একটা ভয়ংকর ব্যাপার আছে, যেটা নিয়েই এখন সমস্যা আর হিসেবনিকেশ। জগদীশের ঠাকুমা একদা বড়োলোকের গিন্নির দেমাকে আবদার করেছিলেন, তাঁর 'লক্ষ্মীর ঘরটি'র অর্থাৎ পুজোর ঘরটির পুরো মেজেটা টাকা গেঁথে গেঁথে বাঁধিয়ে দিতে হবে। যেমন সব কাশী বৃন্দাবনের মন্দিরে দেখে এসেছেন।

যে-কথা সেই কাজ।

আনানো হল বস্তা ভর্তি চকচকে আসলি চাঁদির টাকা। কোনোটায় মহারানির মুখ, কোনোটায় তাঁর ন্যাড়ামাথা ছেলের মুখ। তা সেটি গুছিয়ে সাজিয়ে গাঁথতে মিস্ত্রিরাই পারবে। ডাকা হল হিন্দু রাজমিস্ত্রি মুকুন্দকে। ঠাকুরঘর বলে কথা! চিরকেলের রাজমিস্ত্রী রসিদ আর আবদুল হেসে হেসে বলল,— বাড়িখানা কিন্তু আমরাই বানিয়েছিলুম মা ঠাকরুন। আপনার ওই লক্ষ্মীর ঘরটিও।

তা হোক। এখন ঘরে উঁচু তাকে লক্ষ্মীর পট। নতুন ধানের হাঁড়ি। সেসব থাকবে। শুধু মেজেটা খোঁড়াখুঁড়ি। তারপর টাকা গেঁথে গেঁথে মেজে বানিয়ে ফেলা।

এখন জগদীশ মহাফাঁপরে পড়েছেন ওই ঘরটার হিসেব নিয়ে। ক-হাত বাই ক-হাত ঘর। তার মেজেটা জুড়ে যে টাকা পোঁতা হয়েছে সে কত টাকা।

পুরোনো তথ্য পুরোনো সব খাতাপত্তর থেকে মজুর মিস্ত্রিদের দৈনিক 'রোজ'-এর হিসেব।

মুকুন্দর 'রোজ' ছ'আনা, তার মজুরের রোজ দু-আনা। কিন্তু ক-দিন লাগল আর কতগুলো টাকা পুঁতল, তার হিসেব পাচ্ছেন না কোথাও। তাই রাত জেগে সেই আদ্যিকালের খেরো বাঁধান খাতা নিয়ে আঁতিপাঁতি খুঁজছেন।

ছেলে বলল,—অত হিসেবের কী আছে?

যখন খোঁড়াখুঁড়ি করতে লাগবে, তখন কেউ পাহারা দিতে উপস্থিত থাকবে। যত যা ওঠে।

তবে সত্যি টাকার এখন অনেক দাম। ষোলো আনার টাকা এখন অনেক বেশি দামে বিক্রি করা যাবে।

কিন্তু কে বসে বসে পাহারা দেবে?

ছেলে বলে,—আপনার ঠাকুমার আবদারকেও বলিহারি যাই বাবা। ঘরের মেজেয় টাকা গেঁথে বাহার করে দিতে হবে। তিনি টাকা মাড়িয়ে মাড়িয়ে হাঁটা চলা করবেন। অথচ টাকা নাকি মা লক্ষ্মী, পা ঠেকে গেলে নমস্কার করতে হয়।

ছেলের বউ বলল,— সেকালে জমিদার গিন্নিদের অহংকারই ছিল আলাদা। সত্যি টাকা মাড়ানো উচিত?

জগদীশ বললেন,— এ-প্রশ্ন আমিও করেছিলাম বাবাকে। বাবা বলেছিলেন, দেবমন্দিরে তো থাকে। এ তো ওঁর পুজোর ঘর লক্ষ্মীর, মন্দির।

এখন পরের জেনারেশান বুঝুক ঠ্যালা।

বাড়ি বেচে দেব চুকে যাবে। তা নয় তার মেজে খোঁড়াও টাকা ওপড়াও। তো গুনে দেখেছেন কখনও কত টাকা গাঁথা আছে?

ওরে বাবা! কে আবার কবে গুনে দেখতে গেছে।

কিন্তু এখন ভাবছেন জগদীশ, গোনা থাকলে ল্যাঠা মিটে যেত। খোঁড়াখুঁড়ির মিস্ত্রিকে কড়া করে বলে দেওয়া যেত দ্যাখো বাপু, এই আছে, একটুও যেন এদিক-ওদিক না হয়।

সে-শাসানির উপায় নেই।

তবু এই সত্তর বছরের জগদীশ এই রাত বারোটায়, বাড়ির সবাই যখন ঘুমে কাদা, আর রাস্তা নিঃঝুম, তখন পালঙ্কের ওপর বাবু গেড়ে বসে সামনে খেরোর খাতা খুলে সেকালের নায়েব গোমস্তাদের 'অনিন্দ্যনীয়' ছাঁদের হাতের লেখা সব হিসেবপত্তর তন্নতন্ন করে দেখছেন, যদি কোথাও লেখা থাকে কত টাকা পোঁতা হয়েছিল।

হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ পড়ে গেল। আর চোখ যেন সেখানেই ফ্রিজ হয়ে গেল।

'কলিকাতার ট্যাঁকশাল হইতে আনয়ন করা হইল দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা ও ... সের গিনি।'

কত সের? বোঝবার উপায় নেই। ঠিক সেইখানটাই পোকায় খেয়েছে।

দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা।... এত সের গিনি।'

হঠাৎ ভারি রাগ হয়ে গেল জগদীশপ্রতাপের। কর্তারা সব যা ইচ্ছে করে গেছেন। আর পরের জেনারেশানের ভাগ্যে শুধু ডুগডুগি।

টাকার হিসেব, গিনির হিসেব সংখ্যা দিয়ে নয়, মণ সের দিয়ে। সাপের পা দেখছিলেন সব।

টাকা থাকলেই এইভাবে নয় ছয় করতে হবে?

রাগের চোটে জগদীশ প্রতাপের মনে পড়ল না চিরকালের পৃথিবীতে আদি অনন্তকাল তাই হয়ে আসছে। টাকা থাকলেই নয়ছয়। শুধু 'নয়ছয়ের' রীতি পদ্ধতিটাই স্থান কাল পাত্রের হিসেবে আলাদা হয়।

নবাব বাদশারা তাদের নাগরা জুতোয় হিরেমুক্তো সেঁটে বাহার করতেন। খানদানি বাবুরা পোষা বেড়ালের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করতেন। আর বড়ো

মানুষের গিন্নিরা শখ হলে তাঁর দাঁড়ের ময়না পাখি টিয়াপাখির দাঁড়টাকে সোনা দিয়ে গড়িয়ে নিতেন।

তা শুধু সে-যুগে কেন, এ-যুগেও কি টাকা নয়-ছয়ের কোনো হিসেব আছে? হুঁ। এ-যুগে অত সোনা রুপোয় বাহার না দিক শখের খাতিরে লাখ লাখ টাকা আকাশেই উড়িয়ে দেয়, বাতাসে ছড়িয়ে দেয়। কে ভাবতে যাচ্ছে দেশের কত লোক খেতে পাচ্ছে না।

রাগটা একটু প্রশমিত হলে জগদীশপ্রতাপ ভাবলেন, তা তো হল। রুপোর টাকা ঠাকুরঘরের মেজেয় আর দেয়ালের খানিকটা পর্যন্ত যে গেঁথে রাখা হয়েছে, সেটা তো চাক্ষুষই দেখেছি। তবে টাকাগুলোর ওজন যে দেড় মণ তা কে ভাবতে গেছে?

বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় জগদীশ আর তাঁর পিঠোপিঠি দিদি ঠাকুরঘরে গেলেই গুণতে বসতেন, কতগুলো টাকা মহারানি মার্কা, কতগুলো ন্যাড়ামাথা রাজা মার্কা।

কিন্তু গিনি?

গিনি তো কোথাও সাঁটা থাকতে দেখেননি।

অথচ খাতায় পষ্ট করে গিনির হিসেব লেখা রয়েছে। গিনি... সের লক্ষ্মীছাড়া কাগজে পোকারা কেটে খাবার আর জায়গা পায়নি। ওই ‘কত’ সের তার সংখ্যাটি হাপিস করে দিয়েছে।

তা দিক, ছিল তো কিছু। দশ সের, পাঁচ সের, এক সের, আধ সের যা হোক। কিন্তু কোথায় তারা?

মাথাটা আরো ঝুঁকিয়ে খাতাটা আরো তন্ন তন্ন করে দেখছেন, হঠাৎ যেন সামনে একটা ছায়া পড়ল।

কে?

চমকে উঠলেন জগদীশ।

— কে? কে? কে রে ব্যাটা।

ব্যাপারটা কী? যতই রোগা সিড়িঙ্গে আর তোবড়ানো চেহারা হোক রাত বারোটায় বন্ধ ঘরের মধ্যে ঢুকে এল কীভাবে?

তবে কি আজ জগদীশ দরজায় খিল লাগাতে ভুলে গেছলেন? কিন্তু এমন ভুল তো হয় না জগদীশের।

গিন্নি চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়ার পর থেকে ঘরে তো একাই থাকতে হয়। কাজেই বেশ জম্পেস করেই সব বন্ধ করে তবে শোন।

ওঃ। দৈবাৎ একদিন হয়তো ভুলে গেছেন, আর অমনি ব্যাটা চোর এসে সেঁধিয়েছে? কোথায় ওত পেতে বসে থাকে?

যাক সাবধানতার ঘাটতি নেই জগদীশের। কারণ এই ঘরেই লোহার সিন্দুক। এখন সব ব্যাঙ্কের ভল্টে।

সংসারের সব গয়নাপত্তর আর দরকারি কাগজপত্তর ভল্টে রেখে আসার ফ্যাশান হয়েছে। জগদীশ এ ফ্যাশানের গাড্ডায় পড়তে রাজি নয়। ছেলে বউ যত বলে বলুক।

চোখের সামনে না থাকলে জিনিসটা ক্রমেই ছায়া ছায়া হয়ে যাবে না? একবার খুলে দেখবার ইচ্ছে হলে দেখতে পাবেন?

কেন, মজবুত সিন্দুকের অভাব আছে বাজারে?

আর তোমার গিয়ে ব্যাঙ্কই-বা কী নিরাপদ? রাতদিনই তো 'ব্যাঙ্ক ডাকাতি।' 'ব্যাঙ্ক লুঠ'।

জগদীশের মাথার শিয়রে লোহার সিন্দুক, মাথার বালিশের তলায় রিভলভার।

এর থেকে বুকের বল আর কীসে?

'কে?' বলে উঠেই জগদীশ হাত বাড়িয়ে মাথার বালিশের তলায় হাত চালিয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের মূর্তিটা বলে উঠল, উঁ-হু-হু, দোহাই বড়োকত্তা অমন কাজটি করবেন না। ওতে আপনার লোকসান বই লাভ হবে না?

বড়োকর্তা।

তার মানে চেনা চোর।

অর্থাৎ প্রতাপপুরের জানিত।

হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললেন,— হুঁ। তা সত্যি। তোর মতন একটা ছুঁচোকে মেরে গুলিটাই লোকসান। তো কে তুই?

আজ্ঞে কেউ না।

কেউ না। বটে? তামাশা? তবে তো দেখছি মরণের কাল ঘনিয়ে এসেছে তোর। ইষ্টনাম স্মরণ কর ব্যাটা। এই চালালাম হাত বালিশের তলায়।

আজ্ঞে বড়োকর্তামশাই, আমাদের মতো নিকৃষ্ট জনের আবার ইষ্টনাম! আর বাঁচাই-বা কী, মরাই-বা কী!

—হুঁ। খুব কথা জানিস দেখছি। তো বড়োকর্তা বললি কোন সুবাদে?

—শৈশবাবধি শুনে আসছি, ওই সুবাদে।

—বুঝেছি। প্রতাপপুরের 'মাল'! তো বাঘের ঘরে ঘোগ? বড়োকর্তার ঘরে এসে সেঁধিয়েছিস চুরি করতে?

— আ ছি ছি! অমন কথা বলবেন না কর্তা! আপনার ঘরে সেঁদুবো চুরির মতলবে?

— বটে? তা মাঝরাত্তিরে দোরটা একটু খোলা পেয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে এসেছ কীসের মতলবে জাদু? কর্তার পা টিঁপে দিতে? না পাকাচুল তুলে দিতে?

—হিসেবের খাতার পাতা পোকায় কেটেছে দেখে চিন্তে করছিলেন। তাই ভাবলুম...।

জগদীশ সোজা হয়ে চড়া গলায় বলে ওঠেন,— বলি তুই লোকটা কে? নাম কী?

—আজ্ঞে, জ্ঞানাবধি তো দেখে আসছি সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে।

—বটে। নাম জানে না? সবাই বৈকুণ্ঠ বলে ডাকে সেটাই জানো। পাজি বদমাস। একটা কথার সিধে জবাব দিতে জানো না? বলি প্রতাপপুরে তো মেলাই বৈকুণ্ঠ। টাক বৈকুণ্ঠ, খোঁড়া বৈকুণ্ঠ, কুমির-খাওয়া-বৈকুণ্ঠ...।

—আজ্ঞে ওনারা তো সব সজ্জন। এ হতভাগা হচ্ছে মুকুন্দ মিস্ত্রির ব্যাটা, মিস্ত্রি বৈকুণ্ঠ! এখন অবশ্য পাবলিকে বলে...

—অ্যাঁ, কী বললি?

স্প্রীঙের পুতুলের মতো ছিটকে খাড়া হয়ে বসলেন জগদীশ।

—চালাকি খেলতে আসার আর জায়গা পাওনি ব্যাটা? রাগের মাথায় আপন খুড়োর মাথাটা থান ইঁটের ঘায়ে গুঁড়ো করার দায়ে তার না ফাঁসি হয়েছে! আর তুমি ব্যাটা...।

লোকটা অকুতোভয়ে বলে, আজ্ঞে ফাঁসি হয় নাই, এ কথা তো বলি নাই। সেই তরেই তো বলতে যাচ্ছিলুম, এখন পাবলিকে নামটা উচ্চারণ করতে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠ।' আমার ঘরখানাকে বলে 'খুনে বৈকুণ্ঠর বাড়ি।'

— ওঃ। তা ফাঁসির ফাঁস আলগা করে ফেলে জেলখানা থেকে পালিয়েছিলি তাহলে? বদলে আর একটা নকল বৈকুণ্ঠ ফাঁসিতে ঝুলল?

আ, ছি ছি।— শিউরে উঠল লোকটা ঃ

ও কথা বলবেন না কর্তা। প্রাণে বড়ো দাগা পাবো। তবে হ্যাঁ ঘটছে এমন ঘটনা রাতদিনই। জেলখানার মধ্যে কত্তজনাই যে অপরের নামে 'প্রক্সি' দিয়ে ঘানি ঘোরাচ্ছে, পাথর ভাঙছে, তার সীমে সংখ্যা নাই। আর ফাঁসি? তাও মাঝে মধ্যে দু-একটা প্রক্সি চলে বই কী! তা ওসব হল গে পয়সাওলা লোকদের কারবার। হতভাগা বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রির বলে পান্তার ওপর নুন জুটত না। সে কিনতে যাবে ফাঁসি খাবার মানুষ! ছ্যা।

—থাম বদমাশ! কেবল প্যাঁচানে কথা।

জগদীশ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়ে উঠে রিভলভারটা টেনে বের করে বাগিয়ে ধরে বললেন,— সিধে জবাব দে। বলি ফাঁসিটা শেষতক হয়েছিল, না রদ হয়ে গিয়েছিল?

—আজ্ঞে গরিবগুর্বোর কি আর শাস্তি রদ হয় বড়োকর্তা? সেও বড়ো মানুষদের ঘটনা।

—ফের?

বললাম না, সিধে জবাব দিবি। বলি ফাঁসিটা হয়েছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কার হয়েছিল?

—ওই তো রাজমিস্ত্রির বৈকুণ্ঠর।

—তাহলে তুই কে?

—ওই তো বললুম আজ্ঞে 'কেউ' বললে ওই বৈকুণ্ঠ মিস্ত্রির! আবার 'কেউ না' বললেও চুকে যায়।

—আবার!

জোরে একটা ধমক দিতে যাচ্ছিলেন জগদীশপ্রতাপ। হঠাৎ দরজায় ধাক্কা পড়ল। তাব সঙ্গে জগদীশ -এর ছেলে অমিতপ্রতাপের উদবিগ্ন গলার স্বর,— বাবা; দরজাটা একটু খুলুন তো!

জগদীশ একটু হতচকিত হলেন। তাহলে তো ঘরের দরজা বন্ধই আছে। ভুলে খুলে রাখিনি। তবে? ওই পাজিটা অথবা পাগলটা ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মাথায় খেলে গেল, তার মানে ব্যাটা আগেই কোনো ফাঁকে ঢুকে পড়ে খাটের নিচে-টিচে লুকিয়েছিল। জগদীশ যখন খাওয়া-দাওয়া করছিলেন তখন তো আর দরজায় তালা লাগিয়ে যাননি। এবার থেকে তাই করতে হবে দেখছি।

তা এসব তো মুহূর্তের চিন্তা।

খাট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে দরজাটা সাবধানে খুলতে গেলেন, পাছে বৈকুণ্ঠবাবাজি ফস করে বেরিয়ে সটকান দেন।

কিন্তু এ আবার কী! কোন ফাঁকে ফট করে কোথায় গা-ঢাকা দিল?

কোথায় আর সেই খাটের নীচেই। আচ্ছা থাকো বাবাজি। দ্যাখো তোমার কী হয়।

দরজাটা খুলেই নিজেই প্রশ্ন করলেন,— কী হল?

ছেলে বলল,— আমাদের আবার কী হবে? আপনার কী হল তাই জানতে এলাম। মনে হল হঠাৎ যেন কাউকে ধমকে উঠলেন।

জগদীশ মনে মনে হাসলেন। বাবুর কান মাঝরাতেও খাড়া।

—ও হ্যাঁ। তা দিয়েছিলাম বটে।

—এত রাত্তিরে— বন্ধ ঘরের মধ্যে কাকে?

খাটের নীচের দিকে একটু অলক্ষ্যে তাকিয়ে জগদীশ একটু মজা করার গলায় বললেন,—'কাউকে' বললে কাউকে। আবার কাউকে নয় বললে নয়।

ছেলের পিছু পিছু বউমাও চলে এসেছে। দুজনে একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করে বলল,— মানে?

— মানে এক ব্যাটা ছুঁচো এসে জ্বালাচ্ছিল...।

বউমা ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটার দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে বলল, —এই ওপরের ঘরে ছুঁচো!

— সেই তো...।

ছেলে চমকে উঠে বলল, —বাবা, আপনার রিভলভারটা খাটের ওপর পড়ে কেন?

—ওই তো...।

জগদীশ অম্লান গলায় বলেন,— ভেবেছিলাম, জ্বালাচ্ছে নিকেশ করে দিই। তো ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ করতে আর ইচ্ছে করল না।

কী কাণ্ড! ঘরের মধ্যে ছুঁচো।

তো সেটাকে তো তাড়াতে হবে।

ছেলে ফট ফট ঘরের আর দুটো আলো জ্বেলে দিয়ে আলনায় ঝোলানো জগদীশের শৌখিন ছড়িটা নিয়ে খটাখট খটাখট তাড়া লাগিয়ে ঘর তোলপাড় করে তুলল।

খাটের নীচেটায়?

তাও দেখল বৈ কী। টর্চ জ্বেলে হেঁট হয়ে।

ইত্যবসরে নাতিও ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে।

— কী হয়েছে দাদু? এত রাত্তিরে সবাই হট্টগোল করছ কেন?

দাদু অপ্রতিভভাবে বলেন,—কিছু না দাদু, ঘরের মধ্যে একটা ছুঁচো ঢুকে পড়েছিল, সেটাকে তাড়াতেই— কিন্তু কোন ফাঁকে যে হাপিস হয়ে গেল। অবশ্য ছুঁচো, 'চোর বললে চোর'।

— চোর! অ্যাঁ! কই? কোথা দিয়ে পালাল?

জগদীশের চিন্তার সুর,— তাই তো ভাবছি।

—বাবা!

অমিতপ্রতাপ বলল,— আপনি রাত অবধি জেগে জেগে ওইসব পচা পচা ভুতুড়ে খাতাগুলো দেখতে বসবেন না। খাতাগুলো দেখলেই তো আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আর ছেলের কথা শেষা হতে না হতেই বউমা বলে উঠলেন, -- আর রাতের খাওয়াটাও একটু হালকা হলে ভালো হয়। আপনাদের প্রতাপপুরের পাঠানো ক্ষীরের সঙ্গে খাজা কাঁঠাল, পাকা আম, আর তার সঙ্গে খাস্তা লুচি চটকে মেখে— ওঃ! আমার তো দেখেই পেট ব্যথা করে। খাবার কথা ভাবতেই পারি না।

— হা-হা-হা।

জগদীশপ্রসাদ এই মাঝরাত্তিরেই ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন।

— তা পারবে কোথা থেকে? জন্মাবধি তো ভয়ে ভয়ে না খেয়ে খেয়ে নাড়ি মরা। আমার ঠাকুরদা একটা আস্ত কাঁঠাল খেতেন বুঝলে? একাসনে বসে এককুড়ি বড়ো সাইজের ল্যাংড়া আম। আর একটা ছাগলও একটা সাবাড় করতে পারতেন। আমার ঠাকুমাটিও কম যেতেন না। বলতেন, আমের সময় আবার দু-বেলা ভাত খেয়ে মরি কেন?... তাই তাঁর রাতে ভাতের পাট থাকত না। দাসীরা কেউ একজন এক ঝুড়ি আম, এক গামলা জল আর একখানা বঁটি নিয়ে বসতো। আর ঠাকুমা বসতেন একখানা খালি থালা আর এক কাঁসি ভর্তি মাছের ঝাল নিয়ে। একটির পর একটি আম ছাড়িয়ে পাতে দিয়ে চলেছে, আর তিনি খেয়ে চলেছেন। গোনাগুনতির ধার ধারতেন না। তবে সঙ্গে ওই সর্ষে-লঙ্কায় গরগরে মাছের তেল ঝালের টাকনা। নিজের গাছের আম, পুকুরের মাছ গোনাগুনতি কিসের?

নমস্য মহিলা।

বউমা বললেন,—তা না হলে আর অমন সব প্ল্যান মাথায় আসে? টাকা পুঁতে পুঁতে ঠাকুরঘরের মেজে বাঁধাব। 'মোজাইক' কোথায় লাগে। এ একেবারে বাহারের চূড়ান্ত।

জগদীশ আবার হেসে উঠলেন।

—তা যা বলেছ বউমা। এই তো হিসেবের খাতায় সেই টাকার ওজন দেখে, চক্ষু-চড়কগাছ।... কলিকাতার ট্যাঁকশাল হইতে দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা আনয়ন করা হইল।

—দেড় মণ রৌপ্যমুদ্রা। শুনে মাথা ঘুরছে বাবা। শুতে যাচ্ছি।

বউমা নেমে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নাতিও। শোনা গেল প্রশ্ন করছে,— মণ কী মামণি?

অমিতপ্রতাপ বলল,— রিভলভারটা আমায় দিন তো।

— কেন? তুমি আবার কী করবে?

— থাক না আমার কাছে। আপনি ঘুমের ঘোরে কী করতে কী করে বসবেন, কী বলা যায়!

—হা-হা-হা। ভাবছিস বাবাটার মাথার গোলমাল হয়েছে। না রে বাবা না। এখন পরামর্শ দে দিকি। বাড়িখানা হাতছাড়া করার আগে ওই দেড়মণ রৌপ্যমুদ্রা উপড়ে নেওয়া যাবে কীভাবে?

— কাল দিনের বেলা ভাবা যাবে বাবা। এখন শুয়ে পড়ুন।

আবার ফটাফট জোরালো আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে ছেলে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

জগদীশ তাড়াতাড়ি দরজার খিল ছিটকিনি দুটো লাগিয়ে ঘুরে এসে আবার খাটের ওপর বসতেই যেন খিক খিক করে একটা হাসির শব্দ পেলেন।

—কে? কে? অ্যাঁ!

— খুব বেপোটে পড়ে গেছলেন বড়োকর্তা, কী বলেন? ছেলে বউমা নাতি পর্যন্ত ছুঁচো খুঁজতে হাল্লাক।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বলেন,— তোর রকমসকম দেখে তো তোকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে না বাপু?

—আজ্ঞে আপনি হচ্ছেন বিচোক্ষোণ বেক্তি।

—ফাঁসি খেয়ে মরে অপদেবতা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস নাকি?

—আহা, বড়ো ভালো নামটি তো দিলেন কর্তা। অপোদেবতা। বাড়তি একটা 'অপো' থাকলেও দেবতার দরে চলে এলুম তা'লে?

—হুঁ। তো হঠাৎ আমার এখানে এলে কেন বাপু, মতলবটা কী?

জগদীশ রিভালভারটা বালিসের তলায় গুঁজে রেখে খাতার বোঝা বন্ধ করে সরিয়ে রেখে, বাবুগেড়ে গুছিয়ে বসে বললেন, —শুনি তোর মতলব!

—কোনো কুমতলোব নাই বড়কর্তা। সাত পুরুষে আপনাদের খেয়ে মানুষ। ওই যে আপনার ঠাকুরমার টাকা পোঁতা ঘর, ও ঘর তো আমারই বটঠাকুর্দা বানিয়েছিল।

— অ্যাঁ, তাই না কী? কে সে? নামটা কী?

— আজ্ঞে বাবার জ্যাঠা। নাম ছিল পাতকীচরণ। হিন্দু সম্প্রদায়ের মিস্ত্রিদের মধ্যে খুব নাম ডাক ছিল। দেবমন্দিরের কাজ-কম্মো তো অহিন্দু মিস্ত্রি দিয়ে চলত না।

— বটে নাকি? খুব যে ভাঁওতা দেচ্ছিস। বলে, ঘরবাড়ি মঠমন্দির পুজোর দালান এসব কারা বানায়? আমি তো বরাবর দেখছি রসিদ মিস্ত্রি আর তার ছেলে বাহার মিস্ত্রি...!

—বড়োকর্তা। সেসব হলে গে পুজো পাঠ আরম্ভ হবার আগে। আরম্ভ হয়ে যাবার পর কোনো কাম পড়লেই ডাক পড়ত এই আমাদের।

—বুঝলুম। তো তোর বাবার জ্যাঠাকে তুই দেখেছিস?

— দেখেছি। একশোর কাছে বয়েস হয়েছিল। নামিয়ে বসিয়ে দিতে হতো। আমারে খুব ভালোবাসত। যত গপ্পো আমার সঙ্গে।

—হুঁ। শৈশব থেকেই এঁচোড়ে পাকা! তো খাতায় হিসেব দেখছি, রুপোর টাকা, ওজন দেড়মণ। তা থেকে কতটা সরিয়েছিল ঠাকুরদা, সে গপ্পো কখনও করেছিল তোর কাছে?

সিড়িঙ্গে বৈকুণ্ঠ সড়াৎ করে একদম সোজা।

—ছি ছি। অমন পাপকথা মুখে আনবেন না হুজুর। এ কি বৈঠকখানা ঘরের কাজ-কাম? যে তা থেকে কিছু মারবে? ঠাকুর ঘর বলে কথা!

—ওঃ। ধর্মজ্ঞানী পুরুষ। তো বল দিকিনি গিনির হিসেবটা কী? সেও নিশ্চয় তোর বড়ো ঠাকুরদা...।

থামতে হল।

আবার দরজায় ধাক্কা।

—বাবা! দরজাটা আর একবার খুলুন তো।

জগদীশ গলা নামিয়ে বললেন,— আজ আর হল না। এখন যা। কাল আবার আসিস।

উঠে দরজা খুললেন জগদীশ।

—কী? আবার কী হল?

—কী হল সেটাই তো জানতে এসেছি।

ছেলের স্বর বেজায় বিরক্ত উত্তেজিত।

—মনে হচ্ছে আপন মনে কথা বলে যাচ্ছেন। শুনতে পাচ্ছি তখন থেকে।

জগদীশ আত্মস্থ।

বললেন,— কইছি? তাই নাকি?

—মাঝরাত্তিরে একা একা কথা বলবেন মানে? ঠিক আছে আমি এ-ঘরে শুই।

—মাথা খারাপ। তুই আবার কী করতে শুতে আসবি?

—তো আপনি যদি...।

—আরে বাবা কিছু না, কিছু না। আমার মেজো মামা বলত রাত্তিরে যদি ঘুম

না আসে তো খবরদার ঘুমের ওষুধ খেতে যাবি না। এক মনে ধারাপাতে পড়া ‘কড়াকিয়া’, গণ্ডাকিয়া’, ‘কাঠাকিয়া’ আউড়ে যাবি। দেখবি ঘুম ‘বাপ বাপ’ করে আসতে পথ পাবে না! যা যা শুতে যা। আর কথা-টথা শুনতে পাবি না।

ছেলেকে প্রায় ঠেলে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন, কাল আবার আসতে বললাম। আসবে তো? এসে খুব ফিসফিসিয়ে কথা বলতে হবে।

কিন্তু আচ্ছা, ভুত-টুত বলে তো মনে হচ্ছে না। কই কথা বলতে তো গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল না। ভয় ভয় ভাবও করছিল না। অথচ ঢোকা বেরোনোও তো টের পাওয়া গেল না। একা আমার বুড়ো চোখ নয়, আরও তিন জোড়া চোখ তল্লাশ করছে ঘর।

আমাদের প্রতাপপুরে ছেলেবেলায় দেখেছি গোষ্ঠ তেলির ঠাকুমা একটা বিদ্যে আনত। ধুনোপড়া।

চোরেরা নাকি গোষ্ঠর ঠাকুমার কাছ থেকে ওই ধুনোপড়া শিখে নিয়ে চুরি করতে বেরোতো।

না এলো তো চুকেই যাবে। না এলে বোঝাই যাবে চোর জোচ্চোর। আর একে...।

ঘুমটা সবে এসেছে, কানের কাছে মাছির পাখা নাড়ার মতো ফিসফিস শনশন শব্দ।

—বড়োকর্তা। ঘুমালেন না কি?

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলেন জগদীশপ্রতাপ।

নাইলনের মশারি। মশারির মধ্যে থেকেই দেখতে পেলেন একটা ছায়ামূর্তি।

—একী। অ্যাঁ! আবার এক্ষুনি এলে যে? বলে দিলাম না কাল আসতে।

বললেন অবশ্য খুব চাপা গলায়।

—আমাদের আবার কালাকাল। কিবা রাত্র কিবা দিন।... ওই গিনিগুলোর হদিস জানতে বটঠাকুরদার সন্ধানে ঘুরপাক খেলুম, কে জানে কতক্ষণ! তারপর মনে হল ‘কাল’কে এসে গেছে। কিন্তু এসে মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল বড়োকর্তা।

—কেন হঠাৎ খারাপ কেন?

—আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের বড় সন্দ বাতিক। এখনো ভাবতেছিলেন ব্যাটা বৈকুণ্ঠ ভূত না চোর।

—বটে। আমি কী ভাবছিলাম তা টের পেলি কী করে?

—সেই তো। ওই রোগেই তো সুখ শান্তি গেছে। না বলতেই সব বুঝে ফেলি।

—দ্যাখ বাপু, ভুতে বিশ্বাস অবিশ্বাস সবটাই মনুষ্য জন্মের একটা রোগ। তুই যখন বেঁচেছিলি, সহজে ভূত বিশ্বাস করতিস?

—বেঁচে? হতভাগা বৈকুণ্ঠে আবার বেঁচেছিল কবে বড়োকর্তা? মরেই তো থাকত।

—নাঃ। সোজা করে কথা বলার ধাতই নেই তোর। তা তোর বটঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা হল?

—হওয়া খুব কঠিন হচ্ছিল। ওনারা হচ্ছেন পুণ্যাত্মা। স্বর্গে ওনাদের পুণ্যির ওজনমাফিক সব মহল্লা। আমাদের মতন গলায় দড়ি পাপীতাপীদের সেখানে পৌঁছবার পাসপোর্টই নাই। তবে...।

—থাম। থাম। ওই মহল্লাটা কী জিনিস?

—ও আজ্ঞে, অন্য কিছু না নামি নামি শহরের 'এসটাইল'। কে কোন মহল্লায় ঠাঁই পেয়েছে জানতে পারলেই বোঝা যাবে কার কতটা পূণ্যি। এই যেমন আপনাদের রাজধানীতে— বাসার ঠিকানা শুনলেই বুঝতে পারা যায় কে রাজা, কে গজা। কে মন্ত্রী, কে যন্ত্রী। কে অফিসার, কে কেরানি। কে এলেমদার, কে জমাদাব।

—বটে! রাজধানীর এত কথা জানিস তুই?

—আজ্ঞে এখোন তো আর রেলভাড়া লাগে না! সর্বোত্র চরে বেড়াই আর দেখি।

—হুঁ। কিন্তু ঠাকুরদার কাছে যেতে পাসপোর্ট লাগে কেন?

—সে আজ্ঞে ওখানকার আইন। বড়ো কড়া আইন। তবে কিনা পাহারাদারকে একটু ঘুষ-টুষ দিয়ে...।

—অ্যাঁ। স্বর্গেও ঘুষ?

—আজ্ঞে কর্তা, ঘুষ আর কোথায় নাই?

খিক খিক একটু হাসির শব্দ।

—থাক। আমার আর জেনে কাজ নেই। ঠাকুরদা কী বলল তাই বল?

—বলল? বলল যে...

ঘর অন্ধকার। জোর পাখার বাতাসে মশারি উড়ছে।

বৈকুণ্ঠকে এক একবার দেখা যাচ্ছে এক একবার যাচ্ছে না।

—কী রে? কী হল? থেমে গেলি যে? চলে গেলি নাকি?

—আজ্ঞে চুপ চুপ। সিঁড়িতে যেন কার পদশব্দ শুনলুম। আবার না ছোটোকর্তা দরজা ধাক্কায়।

—ধাক্কাক। আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি। ক্যানেস্ত্রা পিটোলেও ঘুম ভাঙবে না।

—বলল, গিনি ছিল আজ্ঞে সাড়ে বারো সের। ঠাকুরদার সাক্ষাতে ওজন হয়েছিল।

—সা-ড়ে বা-রো সের গিনি!! বৈকুণ্ঠ, এখন তার কত দাম?

—জানা নাই বড়োকর্তা। চিরদিনই আদার বেপারি, জাহাজের খবর রাখি না।

—আমিই বলছি— অনেক দাম। হিসেব করতে গেলে মাথা গুলিয়ে যাবে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। এখন কী উপায়, তা বল?

—আজ্ঞে কীসের উপায়?

—ওই সোনা রুপো উদ্ধারের। ... বৈকুণ্ঠ! চুপ করে গেলি যে? এই বৈকুণ্ঠ!

—আজ্ঞে ঠাকুর্দাকে শুধিয়ে এলাম।

—এক্ষুনি শুধিয়ে আসা হয়ে গেল?

—তা হল আজ্ঞে। মনোরথে চেপে যাওয়া আসা। তো ঠাকুরদা বলল, উদ্ধারের উপায় কম। মিস্ত্রি উপড়োতে গেলে চুরি করে সাফ করে দেবে।

—আরে বাবা, পাহারা থাকবে।

—যে রক্ষক সেই ভক্ষক হবে। আর চুরি না করে, তো গরমেন্টের ঘরে খবরটা তুলে দেবে। ব্যস। পুলিশি জেরা চলবে। এত অবধি তোমার পূর্ব পুরুষ পেল কোথায়? হিসেব দাও। না দিতে পারলে গারদে যাও।

—ওই সেরেছে। তাহলে তো বড়ো বিপদ।

—আজ্ঞে আপনাকে আর আমি কী বলব? তবে ঠাকুদ্দা বলত, সম্পদই বিপদ। তো এখন ঠাকুর্দা বলল বড়োকর্তাকে বলগে, যা করার তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে। পুরাতন অট্টালিকাখানা দানই করুন আর বেচেই দিন, যেন চটপট করেন।

জগদীশ সন্দেহের গলায় বললেন,— কেন রে বাপু? বড়োকর্তার দিন ফুরিয়ে আসছে নাকি?

— আহা। ইস। তা নয় আজ্ঞে। ওই অট্টালিকাখানারই দিন ফুরিয়ে এসেছে। কোনোদিন না হুড়মুড়িয়ে ভূমিসাৎ হয়। মেরামত তো হয় নাই দু-পুরুষ কাল।

মেরামত। হুঁঃ। ও বিশাল বাড়ি মেরামত করা বড়ো সোজা? তা বলে এক্ষুনি পড়ে যাবে?

— আজ্ঞে যেতে পারে তো! আমি বলি কি কর্তা এই মওকায় বেচে দিন। মোটা টাকা ঘরে আসবে। তারপর হিঁঃ হিঃ, পড়ুক হুড়মুড়িয়ে। আপনার কাঁচকলা।

জগদীশ রেগে বললেন,— তার মানে জেনে বুঝে লোক ঠকানো!

— তো সে যদি বলেন তো একখানা ধম্মোপুণ্যির আখড়া খুঁজে দানই করে দ্যান।

— তাও তো ঠকানো। জানছি যখন পড়ে যাবে।

—বাঃ, তাতে আর ঠকানোটা কোতা? তানারা তো গাঁটের কড়ি খরচ করে কিনচেন না? তানাদের আগেও ছিল না। পরেও থাকবে না। মাঝখানে দু-দিন নেত্য করে নেবে। তা ছাড়া আপনার পুণ্যির ছালাখানায় মোটা খানিকটা পুণ্যি জমা পড়বে।... যখন দানটা করবেন, খপরের কাগজের লোক আসবে। ফটাফট ফটক উঠবে।

জগদীশ একটা নিশ্বাস ফেললেন।

— বৈকুণ্ঠ। বললি তো ভালো। কিন্তু ওই দেড় মণ মহারানি মার্কা টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনি!!

— ও আর চিন্তা করে লাভ নেই বড়োকর্তা। ওসবও তো আপনার গাঁটের থেকে যাবে না? যাদের গেল তেনারা তো আগেই পগার পার হয়ে গেছন।

— ঠিক। ঠিক। অ্যাঁ। তাই তো। বাঁচালি রে বৈকুণ্ঠ।

— তো এখন যাই বড়োকর্তা। আবার আসতে অনুমতি করবেন তো? আপনার কাচে এলে বড় সুক পাই।

বড়োকর্তা কিছু জবাব দেবার আগেই দরজায় টোকা।

ব্যস। বড়োকর্তা চাদর মুড়ি দিয়ে সপাট।

টোকা। টোকা থেকে ধাক্কা।। ধাক্কা থেকে দুমদাম। দমাস-দমাস।

কিন্তু জগদীশ তো অঘোরে নিদ্রায়।

তবে ভয় খাবার কিছু নেই। নাক ডাকছে বাঘের গর্জনে।

সকালবেলা ছেলে বলল,— বাবা। আপনাকে আর একা শুতে দেওয়া হবে না।

—কেন? কেন হে বাপু? আমার অপরাধ?

— আপনি রাতের বেলা সারারাত বিজবিজ করে কথা বলে চলেন। এটা একটা ব্যাধি।

— ব্যাধি! ওঃ! সারারাত বিজবিজ? বলি নাক ডাকায়টা কে?

— সেটা শেষরাতে। আপনার ঘরে আজ থেকে কেউ শোবে।

— কেউ শোবে না। আমি আজই প্রতাপপুরে যাচ্ছি।

— প্রতাপপুরে? একা?

একা ছাড়া... তোমাদের সময় আছে? দেখার অভাবে ওই বিশাল অট্টালিকা-খানা ধ্বংস হতে বসেছে। ওটাকে আমি ওখানেই হরিসভায় দান করে আসব।

ছেলে-বউ দুজনেই একসঙ্গে চমকে উঠল।

— অ্যাঁ! দান করে আসবেন? এখন ওর দাম কত ভেবেছেন? আমি তো একটা খদ্দের ঠিক করার চেষ্টায় আছি।

জগদীশ মনে মনে বললেন, লবডঙ্কা। তোমার চেষ্টা সফল হবার আগেই বাড়ি মাটিতে শোবে।

মুখে বললেন,— না না। পিতৃপুরুষের ভিটে বেচা হবে না। দানই করে দেব।

— আর ওই ঠাকুর ঘরের মেজেয় আর দেয়ালে পোঁতা খাঁটি রুপোর টাকাগুলো?

— পারিস তো উপড়ে নিয়ে আয়।

— সে তো আর সোজা কথা নয়।

— তাই তো বলছি যেটা সোজা সেটাই হোক। দান করে দেয়া হোক। আমি আজই যাচ্ছি। একটা টিকিট আনিয়ে রাখি।

ছেলে রাগমাগ করে বলল, — একটা নয় দুটো। আপনাকে তো আর এই বয়েসে একা ছাড়তে পারি না।

— তবে চল। ভালোই হবে। ফটাফট ফটো ওঠবার সময় তোরও উঠে যাবে। কাগজে ছাপা হবে।

শুনে বউ বলল,— আমিও যাব।

—বেশ তো। চল একবার শেষমেষ ভিটেবাড়ির দেশে।

যাওয়া হল।

দিব্যি সমারোহ করেই যাওয়া হল। ছেলে বউ নাতি চাকর সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু?

কারোর ভাগ্যেই কি ফটো ওঠা জুটল, কাগজে ছাপা হতে?

নাঃ কপালে ঘি না থাকলে কী হবে?

সন্ধেরাতে পৌঁছলেন। সাপখোপের ভয়ে পুরোনো বাড়িতে না উঠে ওখানের বাসিন্দা জ্ঞাতিদের বাড়িতে উঠলেন। ব্যস, সন্ধের পর থেকেই বৃষ্টি! ওঃ কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। যেন প্রলয়কাল ঘনিয়ে এসেছে। শুধু তো বৃষ্টিই নয়, সঙ্গে ঝড়ও।

জ্ঞাতিরা বলল,— দশ বছরের মধ্যে এমন ঝড়বৃষ্টি দেখিনি। গাছ উপড়ে পড়ছে মড়মড়িয়ে, ঘরের চালা টালা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে দু-দশ মাইল দূরে। দিঘি পুকুরের জল উপছে উঠে লোকের বাড়িতে ঢুকে আসছে। কতজনের কত কী ঘটল।

আর?

আর সেই রাতেই ঘটে গেল সেই ভয়ংকর ঘটনাটি। বৈকুণ্ঠর ঠাকুর্দা যার ওয়ার্নিং বেল দিয়েছিল।

কিন্তু সকালবেলা দিব্যি আকাশ ফর্সা।

ঘুম টুম নেই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লেন জগদীশ।

দেখলেন সেই দেড়মণ রুপোর টাকা আর সাড়ে বারো সের গিনির ওপর হাজার হাজার মণ ইঁট পাথর লোহালক্কড়ের স্তূপ।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছেন জগদীশ।

কানের গোড়ায় সহসা ফিসফিস।

—মন খারাপ করবেন না বড়োকর্তা। ভবিষ্যৎকালে কোনো একদিন এই স্তূপ খনন হয়ে এইসব পুরাতন মুদ্রা... ইয়ে আবিষ্কার হবে।

—তুই? তুই এখানেও?

আজ্ঞে, আমাদের তো এখানেই বাস।

তিনপুরুষ যাবৎ।

জগদীশ এদিক-ওদিক তাকালেন।

কাউকেই দেখতে পেলেন না। কেউ কোথাও নেই।

—দিনের বেলাও ঘুরিস?

—আজ্ঞে আমার আবার দিন আর রাত। আমি তো সবসময়ই আপনার সঙ্গে সঙ্গে।

—তা তোর ঠাকুর্দার তো দেখছি গণনায় ভুল। পুণ্যির ছালাটা ভরতে তো তর সইল না।

—না হোক গে। এমনিই আপনার অনেক আছে। পরের ধনে পোদ্দারি করে লাভটা কী? সে ভদ্দরলোক যা করে মঙ্গলের জন্যেই করে।

—সে 'ভদ্দরলোক'! মানে?

— কর্তা! আমার আবার ও-নামটা মুখে আসে না। আপনি নিজে বুঝে নিন।

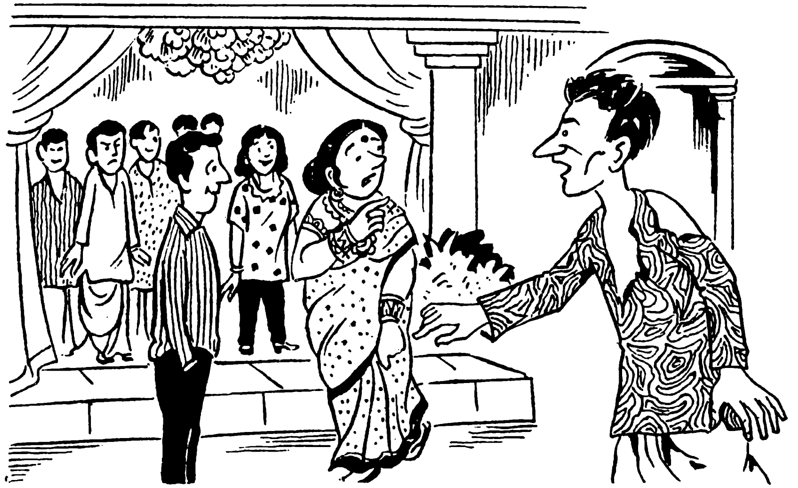

দিব্যেন্দুসুন্দরের দিব্যজ্ঞান লাভ

নিকট আত্মীয়ের বিয়েবাবাদ দুটো দিন ছুটির জন্যে দরখাস্ত করতেই 'বস' একেবারে মারমুখী হয়ে বলে উঠলেন,— আপনারা সব ভাবেন কী বলুন তো? এটা অফিস না মামারবাড়ি? সর্বদাই আবদারের চাষ! নিজের অসুখে বিসুখে তো কামাই আছে, সে-ছুটি কোম্পানি দিতে বাধ্য। কিন্তু বাড়ির লোকের মাথা ধরলে, পেটব্যথা করলেও কামাই, রাস্তায় জল জমলে কামাই, ট্রাম বাসের স্ট্রাইক হলে কামাই, বছরে ক-টা দিন ঠিকমতো কাজ হচ্ছে? অ্যাঁ! এর ওপর যদি বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাবার জন্যেও—

একটানা এই জ্বলন্ত অভিযোগটি জানিয়ে বস মুখার্জি সাহেব একটু দম নিতেই দিব্যেন্দু কাঁচুমাচু হয়ে বলেন,—স্যার শালার বিয়ে!

—শালার বিয়ে? মানে? এই যে কিছুদিন আগে 'শালার বিয়ে' বলে দু-দিন ডুব মারলেন? ক-বার বিয়ে হবে শালার? আমাদের চাপরাশিদের মা মরার মতো নাকি? বছরে বছরে মাতৃহীন হয় তারা। নাকি শালার এরই মধ্যে দ্বিতীয়পক্ষ হতে চলেছে?

যদিও মুখার্জিসাহেবের থেকে দিব্যেন্দু সরকার বয়সে দু'বছরের বড়ো বই ছোটো নয়, কিন্তু চেহারার গড়ন আলাদা জিনিস। তাই মুখার্জি সাহেব অনায়াসে

তড়পান আর দিব্যেন্দু সরকার আরও কাঁচুমাচু হন— সেবার ছিল প্রথম শালার বিয়ে। এ হচ্ছে মেজো শালার।

—ও! মেজো শালার। তার মানে শালার মালা গাঁথা আছে। ভবিষ্যতে আরও চলতে থাকবে?

কী করব বলুন? না যেতে চাইলে স্ত্রী রেগে যাবেন, অন্য আত্মীয়রা নিন্দে করবে।

—ঠিক আছে। স্ত্রীর রাগ আত্মীয়দের নিন্দে, এই সবই সামলান গে। আমার কিছু বলার নেই। ক'দিন লাগবে এই আপনার শালার ব্যাপারে?

—বেশি না, মাত্র দুটো দিন। বিয়ের দিনটা—মানে এই পরশু, আঠারো তারিখটায় অফিস করেই বরযাত্রী যাব। শুধু তার পরদিন আর তার পরদিন। বউভাত সেরেই—মানে কলকাতার বাইরে বিয়েটা হচ্ছে কিনা।

—ও। রেলগাড়ি চড়ে বিয়ে বাড়ি যাওয়া। যান মশাই যান। আপনারাই সুখী। কেন যে 'কেরানি' হয়ে জন্মালাম না।

মুখার্জি সাহেবের ওই প্যাঁচানো আর অহংকারী নাকটার মুখটার দিকে তাকিয়ে খোঁচা নাকের আগাটাকে ধরে একপাক মুচড়ে দেবার দুর্দান্ত ইচ্ছেটাকে অতিকষ্টে সামলে নিয়ে ছুটির দরখাস্তটায় সই করিয়ে নিয়ে চলে এলেন দিব্যেন্দু!

রাগ আর অপমান হজম করতে করতেই জীবন গেল। দিব্যেন্দু বাসে চেপে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবতে থাকেন অফিসে এই। বাড়িতে গিন্নির দাপট, ছেলেমেয়েদের বেপরোয়া চালচলন, এমন কী 'কাজের লোক'রা পর্যন্ত যেন থোড়াই কেয়ার!

... কী আর বলা—সর্বত্র ওই নাকউঁচুপনা। বাজারের মাছ তরকারিওলা থেকে রিকশাওলাটা, বাস কনডাকটারটা পর্যন্ত চড়া সুরে ভিন্ন, নরম সুরে কথা বলতে জানে না। একটা 'বয়স্ক লোক' বলে মানার বালাই নেই। সবসময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব।

অথচ দিব্যেন্দুদের ছেলেবেলায়?

গুরুজনেদের ভয়ে কাঁটা, মাস্টারদের প্রতি কী শ্রদ্ধা, পাড়ার কর্তাব্যক্তিদের পর্যন্ত জ্যাঠা-কাকার মতো সমীহ! এই সেদিন পর্যন্তও তো বাজারের ওলারা খোশামোদ করে ডাকাডাকি করত। দরাদরি করে জিনিস কেনা চলত। অথচ এখন? এখন কোনো জিনিসের দাম শুনে চমকে উঠলে, কি মাছটার দর করতে গেলে মুখের ওপর বলে দেবে, আপনি এখানে কিনতে পারবেন না স্যার। ওই ওদিকে যান পচামাছ, বাসি আনাজ আর কানা বেগুন পাবেন।

হজম করতে হয় এই অপমান! মুখ বুজে!

অথচ বউ ছেলেমেয়ের মতে দিব্যেন্দু নাকি কিপটের 'জাত' বোকার রাজা। বাজার গেলেই পচামাছ আর কচুঘেঁচু নিয়ে আসেন। শুনেশুনেও সব সয়ে যেতে হয়। কারণ দিব্যেন্দু সরকার লোকটা বরাবরই শান্তিপ্রিয়।

কিন্তু সেই দিব্যেন্দুই কিনা এই বাহান্ন বছর বয়েসে এসে পৌঁছে এমন একখানা লোমহর্ষক কাণ্ড করে বসলেন! শুধু 'বসলেনই'-বা বলা চলে কী করে? করেই তো চলেছেন এখনও।

তার মানে কী থেকে যে কী ঘটে যায়! কত সামান্য ঘটনাই 'অসামান্য' গিয়ে ঠেকে।

তাহলে গোড়া থেকেই ইতিহাসটির বিবৃতি দিতে হয়। দিব্যেন্দুর শ্বশুরবাড়িটা অবশ্য এই কলকাতাতেই, তবে ওই মেজো শালাটির বিয়ে হচ্ছে একটু গ্রামের দিকে। তা যে কোনো দিকে কলকাতা ছাড়িয়ে খানিকটা গেলেই তো 'গ্রাম'!

বিয়ের দিন সকালে দিবেন্দু অফিস যাবার মুখে গিন্নি বললেন—বাবা বলে পাঠিয়েছেন, পাঁচটা কুড়িতে বর বেরোবার শুভলগ্ন। একটা প্রকাণ্ড বাস রিজার্ভ করে সব্বাই একসঙ্গে যাওয়ার ব্যবস্থা! তুমি ওই সময়ের মধ্যে অফিস থেকে সোজা আমাদের 'রাসবিহারীর' বাড়িতে গিয়ে হাজির হবে। একটুও যেন দেরি না হয়।

দিব্যেন্দু বললেন— বাঃ! বাড়ি ফিরব না? আমি কি অফিসের জামা-টামা পরেই—

বাড়ি ফিরে সাজুগুজু করতে সাধ, তাহলেই হয়েছে। তাহলে আর তোমায় ঠিক সময় হাজির হতে হবে না। তা ছাড়া বাড়িতে ফিরবেই-বা কী করে? আমরা তো সবাই এই এক্ষুনিই বাড়ি চাবি দিয়ে চলে যাচ্ছি।

মেয়ে বলে উঠল, বাবা! তাহলে একটা কাজ করো, তোমার ওই অফিস ব্যাগের মধ্যেই তোমার একটা ফর্সা ধুতি আর আর্দির পাঞ্জাবিটা ভরে নিয়ে চলে যাও। তোমার তো নেমন্তন্ন বাড়ি যাবার ওই একটাই সেট্ আছে। অফিসের বাথরুম থেকেই ফ্রেশ হয়ে নিয়ে, হিঃ হিঃ বল তো একটা পাউডার কৌটো দিয়ে দিই সঙ্গে!

রাগে হাড় জ্বলে যায় কিনা! তোর আর তোর মায়ের মতো আমারও দুশো আশিখানা 'শাড়ি' থাকবে নাকি? তবু রাগ চেপে বললেন—পাউডার দরকার নেই। একখানা ফর্সা রুমাল দিয়ে দে।

ছেলে বলে উঠল— দেখো সময়টা, আজ আর ওভারটাইম করতে বোসো

না। মনে রেখো, ওই বাসটা মিস করলে, একা সেই নয়নপুর না বদনপুরের ট্রেন ধরে যেতে হবে, কেউ কেউ নাকি পরে তা-ই যাবে।

গিন্নি রেগে মেগে বললেন,—কেন বাসটা মিস্‌ই-বা করা হবে কেন? একদিন কি আর আপিস থেকে একটু সকাল সকাল বেরোনো যায় না? রোজই তো রাত করে ফেরো। ছুটির টাইম সাড়ে চারটে নয়। খবরদার যেন দেরি না হয়!

মেয়ে বাবার হাতে ধুতি-পাঞ্জাবি-রুমাল দিয়ে আবার ছি ছি করে বলল,— তোমার যা টিঙটিঙে চেহারা, পাখিদের মতো উড়েও চলে যেতে পারো বাবা। এই পেটের মধ্যে খাবার-দাবার-গুলো যে কী করে চালান কর।

ছি ছি। এই ফ্যাশান হয়েছে এখন। মা-বাপকে নিয়েও ট্রাপ। অসহ্য! অথচ দিব্যেন্দুকে চুপচাপ সয়ে যেতে হয়। শান্তিপ্রিয় লোকেদের এই হচ্ছে জ্বালা!

তা এই শান্তিপ্রিয়দের কপালে কি যত রাজ্যের উটকো জ্বালাও মজুত থাকে?

সবেমাত্র ফাইলপত্র গুছিয়ে ধুতি পাঞ্জাবিটি ব্যাগ থেকে বার করে হাতমুখ ধুতে যাবেন, মুখার্জি সাহেবের কাছ থেকে জরুরি তলব।

— এই যে দিব্যেন্দুবাবু, ভীষণ জরুরি একটা কাজ এক্ষুণি না করলেই নয়।

দিব্যেন্দু থতমত খেয়ে বললেন—কিন্তু এখন যে আমাকে ইয়ে বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীদের সঙ্গে মিট করতে যেতে হবে।

—দেখুন মশাই, এই কাজটা আপনার শালার বিয়ে বরযাত্রী যাওয়ার থেকে ঢের বেশি জরুরি বুঝলেন।

টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাকটি আরও বাঁকিয়ে মুখার্জি সাহেব আবার বলেন—আপনি যখন বাড়ির জামাই, তখন আপনার 'ভোজ'-এর ব্যবস্থাটি ঠিক থাকবে নিশ্চয়ই।

দিব্যেন্দুর একটু ভালোমন্দ খাওয়ার প্রতি প্রীতি খবরটি, যে অফিসেও এসে পৌঁচেছে। নিশ্চয়ই ওই মলয় বোসটার কাজ। পাড়ার লোক সহকর্মী হওয়া খুবই অসুবিধের, ভালো করতে পারে, মন্দ করতে পারে। রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলেও আবার গিয়ে কাজের টেবিলে বসতে হল দিব্যেন্দু সরকারকে।

ফলে?

ফলে যখন বরযাত্রীর সাজে সেজে বি. বা. দি বাগ থেকে বেরিয়ে রাসবিহারী অ্যাভেন্যুতে শ্বশুরবাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছলেন তখন বাড়ি ভোঁ ভাঁ। থাকার মধ্যে একটা কাজের মেয়ে আর একখানি বুড়ি পিসশাশুড়ি। তিনি 'হায় হায়' করে বলে উঠলেন,— তুমি এই এতক্ষণে এলে বাবা? এই একটু আগে সব্বাই চলে

গেল রিজার্ভ বাসে চেপে। তোমার বউ ছেলেমেয়ে খুব রাগারাগি করে তোমায় যাচ্ছেতাই বলতে বলতে গাড়িতে গিয়ে উঠল!

রাগে মাথা জ্বলে গেল দিব্যেন্দুর। 'গাড়িতে গিয়ে উঠল।' কেন, বলে কয়ে আর একটুক্ষণ গাড়িটাকে আটকে রাখা যেত না? তিনি এ বাড়ির জামাই না? গিন্নির 'পূজনীয়া' স্বামী আর ছেলেমেয়ের 'ভক্তিভাজন' বাবা না?

পিসশাশুড়ি তখন বলে চলেছেন— তোমায় আসামাত্তরই সোজা ইস্টিশানে চলে যেতে বলেছে। রেলগাড়ি করে চলে যাবে। গাড়ির বিত্তান্ত লিখে দিয়ে গেছে। এই যে—

এক টুকরো কাগজ ধরিয়ে দিলেন বুড়ি।

লেখা রয়েছে 'নয়নপুর লোক্যাল! পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ। সাত নম্বর প্ল্যাটফর্ম! ... শেয়ালদা।'

টিকিটি কাউন্টারের ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন—নয়নপুর লোক্যাল? পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের? সে তো এইমাত্র ছেড়ে গেল।

—অ্যাঁ।

—হ্যাঁ, এইমাত্র। তবে আর একটা আছে ছ-টা পঞ্চাশে। মারাত্মক ভিড় হয়। আর লাস্টট্রেনটা হচ্ছে ন-টা দশে।

—ও তে কোনো লাভ নেই। এটাই দিন। কত লাগবে? সেকেন্ড ক্লাস!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝেছি। পাঁচ টাকা আশি। পাঁচ টাকা আশি শুনেই দিব্যেন্দুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।... একেই তো এই হয়রানি। 'ওভারটাইম' খাটাটাও হল না আজ। (যেটা রোজ করেন। আর তাই নিয়েই ছেলেমেয়ে ঠাট্টা করে। অথচ তাদেরই টাকার দরকার বেশি।)... ভেবেচিন্তে দেখার সময় নেই। পিছনে লাইন-এর ঠ্যালা। একটা টিকিট নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ধীরেসুস্থে স্টেশনে এক কাপ চা খেলেন, তার সঙ্গে দুটো বিস্কুট। এতেও একটাকা বেরিয়ে গেল।

—ওঃ, কী আমার শালার বিয়ের নেমন্তন্ন রে।

রাগ চড়ে উঠল মুখার্জির ওপর। সে ব্যাটা অসময়ে কাজ না চাপালে দিব্যি রাসবিহারী থেকে চা-টা খেয়ে এতক্ষণে সকলের সঙ্গে দঙ্গল বেঁধে নয়নপুরের পথে এগিয়ে যেতেন। দলবেঁধে বরযাত্রী যেতে 'মজা'ই আলাদা। কম বয়সে একবার বন্ধুর বিয়েতে দলবেঁধে রানাঘাট গিয়েছিলেন। ওঃ, সারারাস্তা কী আমোদ। এখন অবিশ্যি আর সেদিন নেই। তবু আরামটা তো হতো!... এ দু-দিকেই লোকসান।

ওঃ, ভিড় বটে!

লোক্যাল ট্রেনের এই ফেরত-গাড়িতে যে কী ভিড় হতে পারে তা জানা ছিল না দিব্যেন্দুর। নেহাত নাকি রোগা টিঙটিঙে।

তাই কোনোমতে আলপিন গলবার মতো জায়গাটুকু দিয়ে গলে এসে ভেতরে ঢুকে দাঁড়িয়ে থাকলেন একপায়ে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে। দম আটকে যাবার মতো অবস্থা।

কিন্তু কে জানত এরকম ভিড়ে এইসব লোক্যাল ট্রেনেও টিকিট চেকার ওঠে? এবং আশ্চর্য, ওই চিঁড়েদের মধ্যে থেকে মাথা গুনেগুনে টিকিট চেকও করে।

দিব্যেন্দুর টিকিটটা নিয়ে চেকার ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলে উঠলেন— এ কী? এটা তো হাফ টিকিট!

দিব্যেন্দু গম্ভীরভাবে বললেন—উপায় কী? কোয়ার্টার টিকিট বলে তো কিছু নেই। থাকলে আর একটু আর্থিক সুবিধে হতো।

তিল ধরবার জায়গা নেই, তবু ভদ্রলোক পা ঠুকে (হয়তো কারুর পায়ে ওপরই ঠুকে) বলে উঠলেন—আমি জানতে চাই ব্যাপারটা কী? এই হাফ টিকিটটা কার?

—কার আবার! আমারই!

—আপনার হাফ টিকিট?

—কেন নয়? রেল কোম্পানির রেলগাড়িতে তো একটা পুরো সিট-এর বদলে আমি একটা মাত্র পা রেখে চলেছি। এতে কোয়ার্টার টিকিটই হবার কথা।

—বাজে বকবক রাখুন। 'একসেস ফেয়ারটা' ছাড়ুন।

শান্তিপ্রিয় দিব্যেন্দু হঠাৎ অশান্তিপ্রিয়দের মতো বুনো গোঁয়ের গলায় বলে ওঠেন— কীসের একসেস ফেয়ার? একেই তো দেখছেন আমার এই সিকি সাইজের চেহারা, তায় একখানা পায়েরও পুরোটা মাটিতে রাখতে পাইনি। পাছে কারও পা মাড়িয়ে ফেলি এই ভয়ে হাত শুন্যে উঁচিয়ে রেখেছি! ওই হাফটিকিটই যথেষ্ট অধিক হয়ে গেছে। ব্যস!

চেকার ভদ্রলোক ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠেন,—বাঃ মশাই বাঃ। রেল কোম্পানিকে ঠকাবার এই আবার একটা নতুন পথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন দেখছি। আপনার বয়েসের একটা লোক—

—কী? কী বললেন? এতে রেল কোম্পানিকে ঠকানো হচ্ছে? বলি মশাই, আর কোম্পানি যে রাতদিন অবিরাম পাবলিককে রাম ঠকানো ঠকিয়ে চলেছে, তার কী?

—তার মানে? আপনার এ-কথার মানে?

— মানে বুঝতে পারছেন না? মশাই রেল কোম্পানির কর্তব্য নয়, প্রতিটি যাত্রীকে পুরোভাড়ার বিনিময়ে পুরো একটি সিট দেওয়া? বলুন, নয় কি না? দিচ্ছে তা? এই তো তার প্রমাণ সামনেই। অথচ নিজের কর্তব্যচ্যুতিটি বেমালুম চেপে গিয়ে পাবলিকের ওপর 'নিয়মনিষ্ঠা কর্তব্য পালনের' চাপ!

যদিও ভিড়ে সকলেই চিঁড়েরও অধিক চ্যাপটা হয়ে আছেন, দম আটকে আসছে, তবু এমন একটি মুখরোচক বা 'কর্ণরোচক' প্রসঙ্গে সকলেই কানখাড়া করেন। ভিড়ের খাঁজ থেকে কে একজন বলে ওঠে—বেশ বলেছেন দাদা! মুখের মতো জবাব! এই তো চাই।

চেকার মশাই হয়তো দিব্যেন্দুকে 'পাগলছাগল' ভেবে ছেড়েই দিতেন। রাতদিন তো কতশত বিনাটিকিটের যাত্রীই আমার সঙ্গে নেমে চলুন বলেন। 'রেল কোম্পানি পাবলিককে ঠকাচ্ছে' এ-কথা বলার মজাটি দেখবেন চলুন।

পার হয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ওই 'মুখের মতো জবাব' কথাটা শুনেই ভদ্রলোকের মাথা গেল গরম হয়ে।

তাই বলে উঠলেন—দেখুন, টাকা দিন তো দিন। নচেৎ...

কিন্তু চিরশান্ত স্বভাব দিব্যেন্দু সরকারের আজ কী যে হল। বোধ হয় পেটের মধ্যে আগুনের আর মাথার মধ্যে শ্বশুড়বাড়ির লোকের দুর্ব্যবহারের জ্বালা তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া পাবিলিকের সমর্থন! চিরকাল কিন্তু একটা বলতে গেলেই দেখেছেন দাবড়ানি খান। কেউ তাঁকে সমর্থন করে না।

অফিসে মুখার্জি কর্মচারীরা, বাড়িতে গিন্নি এবং ছেলেমেয়ে কেউ তাঁকে কোনোকিছুতেই বলে না, 'ঠিক বলেছ'। সবাই বলে, 'তোমার যদি কোনো কথার মাথা থাকে।' আর আজ এখন? এরা বলল, 'ঠিক বলেছেন! বেশ বলেছেন।'

আগুনে বাতাস লাগল।

দিব্যেন্দু বলে ওঠেন—ভুলটা কী বলেছি—অ্যাঁ? কোথায় না ঠকছে পাবলিক? রাতদিন লোডশেডিং তবু ইলেকট্রিক বিল, ছ-মাস টেলিফোন অচল তবু টেলিফোন বিল। রাস্তায় গর্ত এক মিনিটের বৃষ্টিতে একহাঁটু জল—তবু—

বলতে বলতেই 'নয়নপুর' এসে গেল।

চেকার ভদ্রলোক বললেন, —চলুন।

দিব্যেন্দু 'আঃ' করে হাত ছাড়িয়ে নিলেন। হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়া লোকেরা হ্যা হ্যা করে হেসে বললেন— ছেড়ে দিন দাদা। ছেড়ে দিন! দেখছেন না হেড অফিসে গণ্ডগোল।'

—হুঁ। তাই দেখছি। বলে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

দিব্যেন্দু তাকিয়ে দেখলেন, কোথাও রিকশা আছে কিনা। ঠিক এই সময় জনাকতক ছেলেছোকরা হঠাৎ মহোল্লাসে ছুটে এল—এসে গেছেন। এসে গেছেন। উঃ। এত দেরি করতে হয়। সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। আর আপনার গিয়ে দিনুবাবু তো ছটফট করছেন।

শুনে প্রাণটা শীতল হয়ে গেল দিব্যেন্দুর। তাঁর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে? দেরি দেখে দিনুবাবু ছটফট করছেন।

কিন্তু দিনুবাবু কে? তাঁর শালার নাম তো দীনেশ, আর শ্বশুরের নাম দিনেন্দ্র' কাকে দিনুবাবু বলছে? ওদের কি এরা এইনামেই—

ভাবতে ভাবতেই এরা দিব্যেন্দুকে প্রায় পাঁজাকোলা করে একটা সাইকেল রিকশায় চাপিয়ে গড়গড়িয়ে নিয়ে চলল।

কিন্তু কোথায় থামল? জায়গাটার চেহারাখানা কী?

একটি ক্লাবঘর। তার মাঝখানে একটি সাজানো আসর। গানের আসর। চৌকির ওপর শতরঞ্চ পাতা। মাঝখানে একটা মোটাসোটা তাকিয়া। তার সামনে একটা হারমোনিয়াম। পাশে আর একটা রোগা খোলা তাকিয়া। তার সামনে একজোড়া বাঁয়া তবলা বসানো। মাঝখানে একটা ফুলদানিতে হাড়জিরজিরে একটা ফুলের তোড়া। তবে আলোটা বেশ জোরালো। এদিকে ওদিকে দু-একটা ছেলে ঘুরছে।

দিব্যেন্দুর সঙ্গের একটা ছেলে চমকে উঠে বলল—এই সর্বনাশ। দেরি দেখে দিনুবাবু চলে গেলেন নাকি?

দাঁড়ানো ছেলেটা বলল—না না! সেক্রেটারির বাড়িতে গেছেন চা জলখাবার খেতে।

এরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল— যা যা খবর দেগে আপনার তবলজি এসে গেছে। এই মশাই, বসে পড়ুন।

দিব্যেন্দু হতভম্ব হয়ে তাকালেন।

বসে পড়বেন মানে? কোথায় বসে পড়বেন? কোনোখানেই তো চা-জল খাবারের ছায়ামাত্র নেই। তা ছাড়া আর কোথায় বসার কথা?

একটা ছেলে দিব্যেন্দুকে ঠেলে সেই রোগা তাকিয়াটার সামনে নিয়ে গিয়ে জোর গলায় বলল,—তবলায় একটা চাঁটি দিন না; শুনে আপনিই বুঝে যাবেন দিনুবাবু। চেনা বোল তো।

কী? আমি তবলায় চাঁটি দেব?

দিব্যেন্দু রেগে উঠে বলেন,—মানে?

এক ছোকরা বলে ওঠে,— মানে আবার কী? আপনি দিনুবাবুর তবলচি। আপনি ওনার সঙ্গে আসতে পেরে ওঠেননি, পরের গাড়িতে আসছেন। সেই অবসরে ওনাকে একটু খাইয়ে আনা হচ্ছে। এতে চটে যাচ্ছেন কেন?

—আমি তোমাদের দিনুবাবুর তবলচি?... একি মামদোবাজি নাকি? বলি দিনুবাবুটি কে শুনি? খুব উঁচুদরের গাইয়ে বুঝি?

—উঁচুদরের নয়? বলেছেন কী ? রামকুমারের পরেই তো ওঁর নাম।.... চটাচটি হয়েছে বুঝি? মিটিয়ে ফেলুন মশাই। চাঁটি বসান। দেখবেন, মেজাজ ঠিক হয়ে যাবে। প্রায় তাকিয়ার ওপর চেপে বসিয়ে দিতে যায়।

দিব্যেন্দু বলতে যাচ্ছিলেন— চাঁটিটা কোথায় বসাব? তোমাদের প্রত্যেকের মাথায় একখানা করে?

কিছু বলবার আগেই সেই দিনুবাবু এসে গেলেন।

এই যে দিনুদা আপনার তবলচি এসে গেছেন।

—কে এসে গেছে?

দিনুদার নাকের নীচের একঝুড়ি কাঁচাপাকা ঝোলা গোঁফ আরও ঝুলে পড়ে, —এটিকে আবার কোথায় পেলে?

—বাঃ, ইনি আপনার তবলচি নয়?

—কস্মিনকালেও নয়। তাই বলেছে বুঝি তোমাদের কাছে?

দিব্যেন্দু ফেটে পড়েন,— আমি বলেছি তাই? আমায় স্টেশন থেকে প্রায় চোর ধরার মতো ধরে এনে বলে কিনা তবলায় চাঁটি বসাও। জন্মে জীবনে কখনও তবলা টাচ করিনি।

দিনুবাবু হ্যা হ্যা করে হেসে বলেন— কী হে! কী ব্যাপার তোমাদের?

ছেলেগুলো মাথা চুলকে বলে,— আপনি তো বলেছিলেন স্যার, পরের গাড়িতে আসছে। দেখলেই চিনতে পারবে। হাড়গিলে চেহারা, গায়ে মিহি আদ্দির পাঞ্জাবী শান্তিপুরী ধুতি—মুখখানা বাংলার পাঁচের মতো । দেখলেই চেনা যাবে।— —ওঃ! আজ কপালে এত অপমানও তোলা ছিল। হাড়গিলে চেহেরা! বাংলার পাঁচের মতো মুখ।... রাগে মুখে কথাই আসে না।

দিনুবাবু বলে ওঠেন,— সেই মহাশয়টি বোধ হয় এসে উঠতে পারলেন না। তো কিছু মনে করবেন না। ছেলে ছোকরার ব্যাপার! এখানে এসেছিলেন কোথায়?

দিব্যেন্দু কষ্টে বলেন,—একটা বিয়েবাড়িতে।

—ও বুঝেছি! এই তোমরা কেউ এঁকে পাড়ায় কোথায় বিয়েবাড়ি আছে পৌঁছে দাও। রিকশাটা রয়েছে মনে হচ্ছে। কাদের বাড়ি?

—মেয়ের বাবার নাম মনে নেই। বরযাত্রী এসেছি। পাত্রের বাবার নাম হচ্ছে—

ততক্ষণে ছেলেরা আবার দিব্যেন্দুকে প্রায় ঠেলে রিকশায় বসিয়ে দিয়ে তাকে কী যেন বলে দেয়।

—চলে যান। এ জানে। ঠিক পৌঁছে দেবে। ভাড়াটা দিয়ে দেবেন।

—ওঃ! আবার খানিকটা গ্যাঁট গচ্চা!

কী আর করা! এখন ভগবানের দয়ায় গিয়েই যদি একটা 'ব্যাচ' পেয়ে যান। পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে।

সাদামাটা বিয়েবাড়ি। গ্রাম-ট্রামে যেমন হয়। বাড়ির সামনে খানিকটা জায়গায় শামিয়ানা টাঙানো। তার মধ্যে দু-চারখানা বেঞ্চি পাতা। তবে এখানে ওখানে কিছু লাল নীল টুনি বালব জ্বলছে।

এক ভদ্রলোক বললেন—আপনি?

—বরের ভগ্নিপতি।

--ওহো। আসুন! আসুন! কে যেন বলছিল, কে একজনার পরে আসার কথা আছে। ওরে এঁকে 'স্পেশাল দিকে' নিয়ে যা। ভালো করে বসাস।

দিব্যেন্দু বুঝলেন, 'স্পেশাল দিকটা' হচ্ছে বরযাত্রীদের জন্যে। গ্রামে গঞ্জে এমন হয়। যাক বাবা, এখনই পাতার সামনে বসে পড়া যাবে। ওঃ! পেটের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলছে।

লোকটার পিছু পিছু দিব্যেন্দু যেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, সেটা প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া একটা দালান । যদিও মেজেটা ফাটাচটা পুরোনো। তো এত বড় দালান পুরোনো বাড়িতেই থাকে। দালানের মেঝেয় মুখোমুখি দু'সারি কুশাসন পাতা। সামনে কলাপাতা বিছোনো। পাতা ঘিরে মাটির গেলাস আর গোটা দশবারো করে খুরি। পাতায় দু-খানা করে লুচি আর লম্বা একখানা বেগুনভাজা এবং কিছু একটা তরকারি। মাটির খুরিগুলোয় যা সব দেওয়া হয়েছে তা থেকে ভীষণ ভালো সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। ওদিকে ভিতরে কোথাও লুচি আর চপ ভাজা হচ্ছে, বাতাসে তার সৌরভও ভেসে আসছে।

দিব্যেন্দুর মনে হল, যেন একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখতে পেলেন।... আহা, কোন ছেলেবেলায় যেন এমন দৃশ্য দেখেছেন!

একেই তো বলে 'যজ্ঞিবাড়ি!'

এখন তো টেবিল চেয়ার কাঁচের প্লেট। তাতে সেই আগের নেমতন্ন বাড়ির ভাব নেই।

বসে পড়লেন একখানা পাতার সামনে। ভিতরে জোর কথাবার্তা চলছে... হ্যাঁ হ্যাঁ আগে বরযাত্রীদের বসানো হচ্ছে। দরবেশটা ভাঁড়ার থেকে আনানো

হয়েছে? কাঁচাগোল্লার বারকোশটা কোথায়?.... এই খবরদার, চিংড়ির মালাইকারি যেন বরযাত্রীদের ছাড়া আর কাউকে না দেওয়া হয়।...

দিব্যেন্দু লুচিটা ছিঁড়তে গিয়েও হাত সামলাচ্ছেন। অন্য সবাই এসে না বসলে খাওয়া শুরু করাটা ভালো দেখায় না।

উঃ! এক একটা মিনিট, না এক একটা বছর।... যাক এসে পড়লেন বরযাত্রীদের দলবল।...

একজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন,—ইনি কে?

কন্যাপক্ষের একজন বললেন,—ওই যে বলেছিলেন কার যেন পরে আসার কথা ছিল!

বরযাত্রীদলের কর্তা যিনি, তিনি বললেন—আমাদের একজন! ঠিক চিনতে পারছি না তো!

দিব্যেন্দু বললেন—বরের বাবাকে ডেকে আনুন, চিনতে পারবেন। বসে পড়ুন তো এখন।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন,—আমিই বরের বাবা!

দিব্যেন্দু বেগুনভাজার মধ্যে লুচি জড়িয়ে বললেন— তামাশা রাখুন মশাই, খিদেয় নাড়ি ভূঁড়ি জ্বলছে।

—তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু পরিচয়টা না পেলে—

বললাম তো বরের বাবাকে ডাকুন।

—বললাম তো আমিই বরের বাবা।

—বললেই হল? আমি চিনি না? তিনি হচ্ছেন আমার খোদ শ্বশুর। বর আমার শালা। আর আপনি—

—শালা। শ্বশুর। একেবারে মোক্ষম চাল।

—তা নামটি কী?

—আঃ এ তো ভালো মুশকিল। খেতে বসার সময় কিনা নামধাম, কুলশীল। আপনি বুঝি পাত্রের দূরসম্পর্কের কেউ? আমায় চেনেন না, নাম দিব্যেন্দু।

—দিব্যেন্দু কী?

—কী মানে? শুধুই দিব্যেন্দু। 'ভূষণ' 'সুন্দর' এসব কিছু না। হাত বাড়িয়ে মাছের কালিয়ার খুরিটা কাছে টানেন দিব্যেন্দু। আর কন্যাপক্ষের একজন পরিবেশক চড়া গলায় বলে ওঠে—পাকা ঘুঘু মনে হচ্ছে। খুব যে ন্যাকা সাজছেন! পদবিটা কী সেটাই জানতে চাওয়া হচ্ছে।

পদবী 'সরকার', সেটাও যে আবার নতুন করে বলতে হবে তা তো—

কথা আর শেষ হল না। রে রে করে জনাকতক ছেলে দিব্যেন্দুর ওপর

ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোর! চোর! চোর চল বাইরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে ধোলাই দিই গে।... ব্যাটা সরকার, তুমি চাটুজ্যে বাড়িতে পোলাও কালিয়া সাঁটতে এসেছ বরের ভগ্নিপতি সেজে?

পাঞ্জাবির ঘাড় ধরে টেনে তুলতেই সেটা চড়চড়িয়ে ছিঁড়ে আসে, লম্বাকোঁচার ধুতিটার খানিকটা খুলে ছড়িয়ে পড়ে।

দিব্যেন্দু বোঝেন, ভুল বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে তাঁকে রিকশাওলা।... কিন্তু এও বোঝেন, বাইরে গিয়ে ধোলাই দেওয়া মানে কী।... তার মানে এই নয়নপুরের মাটিতেই তাঁর শেষ।

আশ্চর্য! এত আয়োজনের মধ্যে একটা ফালতু লোক যদি ভুল করে খেতেই বসে পড়ে তাকে গণপিটুনি দিয়ে ফিনিশ করতে হবে?

এদিকে চারদিকে ততক্ষণে ধিক্কার বাণী উঠছে,—দড়ি পাকানো চেহারা, বোঝবার উপায় নেই! তবু মনে হচ্ছে যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, ছেলেছোকরা নয়! তবু এই জোচ্চুরি প্রবৃত্তি! দিব্যি লম্বা কোঁচা দুলিয়ে পাতার সামনে বসে গেছে। চল ব্যাটা, তোকে 'খাওয়া কাকে বলে বুঝিয়ে দিই! একেবারে যমের খাওয়া!

দিব্যেন্দুবাবুর মাথাটা বোঁ করে ঘুরে ওঠে। দিব্যেন্দুবাবু অনুভবেই বুঝতে পারেন, সেই 'খাওয়াটা' কী বস্তু।... সেই সঙ্গেই দিব্যেন্দুর হঠাৎ সেই স্টেশনের ঘটনাটা মনে পড়ে যায়।... কে যেন বলে উঠেছিল 'ছেড়ে দিন মশাই। মনে হচ্ছে হেড অফিসে গণ্ডগোল।'

তাতেই ছাড়া পেয়েছিলেন।

তার মানে পাগলের সাত খুন মাপ!

তার মানে বিপদে পরিত্রাণ পেতে পাগল সাজাই একমাত্র গতি। বাঁচবার একটাই পথ।

হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে একটু ঝুঁকে পড়ে ওইসব সাজানো পাত থেকে ঝপাঝপ দুটো কালিয়া আর ছোলার ডালের বাটি তুলে এদের গায়ে ছুঁড়ে মেরে বলে ওঠেন—বটে। বটে। ব্যাটা। আমি বলছি—তুই ব্যাটা। তোর সাতপুরুষ ব্যাটা।... ওরে মারে— খেতে দিবি নারে—

কন্যাকর্তা এসে পড়ে বলেন,—ছেড়ে দে বাবা ছেড়ে দে। দেখছিস না পাগল!

—পাগল না হাতি! বদমাশ।

সদ্য দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত দিব্যেন্দু জোরে কেঁদে উঠে বলেন—ওরে মারে—আমায় বদমাশ বলছে!

কর্তা আবার মিনতির গলায় বলে ওঠেন,—দে বাবা, ছেড়ে দে তোরা। যাও

বাপু পালাও। নইলে এরা মারবে। শুভকাজের সময়—... পালাও। পালাও...!

তা দিব্যেন্দুকে তখন পাগলতুল্যই দেখাচ্ছে!

পাঞ্জাবিটা ফালাফালা চেঁড়া, কোঁচার আগা মাটিতে লুটোচ্ছে... চুলের মুঠি ধরার দরুন চুলগুলো কাকের বাসা। মুখে কিছু লুচির টুকরো, বেগুনভাজার আঠায় সেঁটে বসা।

এই অবস্থায় কোঁচার আগা হাতে করে খালি পায়ে ছুট মারতে থাকেন দিব্যেন্দু।... বোঁ বোঁ। পাঁই পাঁই।... হাতে একটা ভাঙা ইঁট। কারণ পিছনে এখনও দুষ্টু ছেলের দল তো 'চোর চোর' বলে হল্লা করছে। ওদের ভয় দেখানো তো দরকার।

দিব্যেন্দু যে কীভাবে কোনদিকে ছুট মারছিলেন তা কে জানে। হঠাৎ দেখতে পেলেন আর একটা আলোয় ভাসা খুব সমারোহের বিয়েবাড়ি। সামনে প্যান্ডেল লোকজন গমগম করছে। ভিতর থেকে শাঁখের আওয়াজ আসছে।...

আর—আর প্যান্ডেলের সামনে একখানা প্রকাণ্ড বাস দাঁড়িয়ে আছে দিব্যেন্দুর পেটটার মতো খালিপেটে।

ওঃ! তার মানে এইটিই হচ্ছে দিব্যেন্দুর মেজো শালার নতুন শ্বশুরবাড়ি।... এই বাড়িটির মধ্যেই দিব্যেন্দুর সমস্ত নিজজনেরা। হয়তো মনের সুখে ভালো ভালো সব খাদ্যবস্তু সাঁটছে! আর হতভাগা দিব্যেন্দু!... আচ্ছা! দেখে নেবেন সবাইকে।...

প্যান্ডেলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ তার বড়ো শালার গলা শুনতে পেলেন, কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে আসছে,— কই! এখানও তো দেখা নেই। পরের ট্রেন তো শুনলাম সেই অনেক রাত্তিরে। তুই ঠিকই বলেছিস দিদি, আজকেও বোধ হয় জামাইবাবু ওভারটাইমের সময়টা কাটাতে পারেনি। সেই লাস্ট ট্রেনটাই— এ কী? কে? এখানে কে? দিদি!

'দিদি' সেই আর্তস্বরে এগিয়ে এসেই চেঁচিয়ে ওঠে,— একী! এর মানে?...

মানে? মানে হচ্ছে এই।... যত নষ্টের গোড়া। স্বার্থপর! চক্ষুলজ্জাহীন!— বলেই দিব্যেন্দু হঠাৎ খ্যাঁক করে তাঁর গিন্নীর গোলগাল জামরুলের মতন নাকটার ওপর একটা কামড় বসিয়ে 'হা হা' করে পাগুলে হাসি হেসে ওঠেন। তবে কামড়টা তেমন জোরালো দেননি। যতই হোক গিন্নি তো!

তারপর?

তারপর যা ঘটে সে তো বিশদ বলতে গেলে মহাভারত! জামাইকে

কোনোমতে বাড়ির মধ্যে এনে মাথায় ঠান্ডাজল ঢেলে পাখার বাতাস করে শুইয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু দিব্যেন্দু সেই দিব্যজ্ঞানের মন্ত্রটি জপতে জপতে বলে ওঠেন— বা আ— আ! আমি বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন খাব না? আমার খিদে পায়নি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। খুব সাবধান আর পরম সমাদরে দিব্যেন্দুকে খাওয়ানো হল স্পেশাল ডিশ সাজিয়ে।

তারপর? ঘুমের জন্যে ভালো বিছানা অন্ধকার ঘর। তারপর? পরদিন সকালে অতি সন্তর্পণে সমবেত যত্নে সবাই দিব্যেন্দুকে সেই 'বাসে' চাপিয়ে বরকনের সঙ্গে কলকাতায়!

তারপর?

তারপর রাজার আদরে বা গুরুদেব তুল্য ভক্তিভরে বাড়িতে এনে প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত দিব্যেন্দু এখন যেন একদম সহজ মানুষ। কিছুটি জানেন না।

মেয়ে নাকে আঁচল চেপে এসে আস্তে আস্তে বলে—বাবা, বাবা আমরা কি একবার বিয়েবাড়ি ঘুরে আসব? আজ বউভাত!

কী আশ্চর্য! যাবি না কেন? আলবাৎ যাবি। মামার বউভাত! তো আমিই-বা যাব না কেন?

না না তোমার গিয়ে কাজ নেই। তোমার শরীর—

দিব্যেন্দু হঠাৎ হো হো করে হেসে বলে ওঠেন—তবে থাক। না যাওয়াই ভাল। সেখান তো আবার দেদার লোক। মেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট মারে।

খানিক পরে গিন্নি সাজাগোজা করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, যাচ্ছি তাহলে। তাড়াতাড়ি ফিরব। তোমার জন্যে সব খাবার গুছিয়ে নিয়ে আসব।...

দিব্যেন্দু খুব নিরীহ আর অবাকের গলায় বলেন,—তোমার নাকে কী হয়েছে? ফুলে রয়েছে মনে হচ্ছে।

গিন্নি মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, ও কিচ্ছু না। বোধহয় মশা-টশা কামড়েছে।

তারপর?

শ্বশুর খুড়শ্বশুর শালাদের সমবেত চেষ্টায় মেডিক্যাল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে আরও সাতদিন অফিসে ছুটি মঞ্জুর করানো হয়েছে। দিব্যেন্দু দিব্যি আছেন! বাজার যেতে হয় না, অফিস যেতে হয় না, ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া।

ছেলে মেয়ে গিন্নি কাজের লোক সব্বাই দিব্যেন্দুর জন্যে একপায়ে খাড়া। আগে যাদের ডেকে ডেকে সাড়া মিলত না আর যখন মিলত, তখন এসে আগেই একখানা ঝংকার দিতো, তারা এখন সর্বদা দিব্যেন্দুর ঘরের বাইরে মোতায়েন থাকছে। যাতে একটু ডাক দিলেই ছুটে আসা যায় তাই ঘরের মধ্যে থাকতে পারে না। কতক্ষণ আর নাকের আগা সামলাতে ঢেকে রাখা যায়?... 'নাক' দেখলেই যে দিব্যেন্দুর দাঁত সুড়সুড় করে। ডাক্তারকে তাই বলেছেন দিব্যেন্দু।

রোগলক্ষণ বলতে তো কিছুই না। দিব্যি খাচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন, কাগজ পড়ছেন, ইচ্ছে হলে কিছু করছেন, না ইচ্ছে হলে কিছু করছেন না। তা নিয়ে কেউ একটি কথাও বলতে আসছে না।

বলবে কী? এই খুব স্বাভাবিকের মধ্যেই হঠাৎ হঠাৎ যে দিব্যেন্দুর কারুর নাকের কাছাকাছি এসে দাঁত ছড়িয়ে বলে উঠছেন, খ্যাঁক।... ব্যস। ওতেই সবাই ঠান্ডা। গিন্নি বরফজল, মেয়ে 'মালাই কুলপি', ছেলে সেই আদ্যিকালের ছেলেদের মতো 'নরমের নরম।'

এখন দিব্যেন্দু সরকার দিন গুনছেন, কবে কখন সেই শুভক্ষণটি আসবে!... অফিসে গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র মুখার্জি সাহেব তাঁর সেই টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাকটি কুঁচকে ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলে উঠবেন— কী দিব্যেন্দুবাবু, শালার বিয়ের এমন ফাঁকির খাওয়া খেলেন যে সাতদিনের মতো অফিস বন্ধ?

তখন ওই 'খ্যাঁক' মন্ত্র!

না চাকরি যাবে না।

দাঁতটা তো আর সেই নাকটিকে 'টাচ' করবে না! শূন্যে খ্যাঁক করলে চাকরি যায় না। হেডঅফিসে গণ্ডগোল জানতে পারলে ক্ষ্যামাঘেন্না করে ছেড়ে দেয়। তবে সমঝে চলে সবাই। নাকের মায়া আর কার নেই?... আঃ! কী সহজেই এমন শান্তি স্বস্তি আরাম আর 'সমীহ' টি লাভ করা যায়। শুধু একটু ভান। একটু পাগল সাজা!

মুখার্জি রে!... কবে সাতদিন কাটবে আমার।

গোয়েন্দা গল্প আর কাকে বলে

'আকাশ পাতাল' পত্রিকার সম্পাদক— বিদ্যুৎ বাগল, সাহিত্যিক প্রলয় চাকলাদারের কাছে এসে ধরে পড়লেন,— এবারে 'আকাশ পাতাল'-এর 'পৌষালী সংখ্যা, মানে আর কি বড়োদিন সংখ্যাই' বলতে পারেন 'গোয়েন্দা সংখ্যা করছি। জম্পেস একখানা গোয়েন্দা উপন্যাস লিখে দিতে হবে দাদা!

শুনে প্রলয় চাকলাদ্দার আকাশ থেকে পাতালে পড়লেন,—গোয়েন্দা গল্প! আমি? কস্মিনকালে কবে আবার গোয়েন্দা গল্প লিখতে দেখলেন?

বিদ্যুৎ মহোৎসাহে বললেন,— দেখিনি বলেই তো দেখতে চাই স্যার। আর 'আকাশ পাতাল'-এর পাঠকদের দেখাতে চাই। আপত্তি করার কোনো প্রশ্ন নেই দাদা।

প্রলয় চাকলাদার নস্যাৎ করা গলায় বলেন,— বললেই তো হবে না। গোয়েন্দা-গল্প আমি কোনোকালে লিখিনি—কেন? আমায় কেন? যারা ওসব লেখেন টেখেন তাঁদের বলুন না।

তাঁদের?—আবেগের মাথায় ফস করে সত্যি কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়: তবে আর বলছি কী? রণজিৎ রায় এই লাস্ট মোমেন্টে আমায় ডোবালেন। উনিই ওই উপন্যাসটা লিখবেন বলে ঠিক, হঠাৎ ফোনে জানিয়ে দিলেন, জরুরি

কাজে দিল্লি যাচ্ছেন, সেখান থেকে হয়তো বম্বে, অনেক কাজে জড়িয়ে পড়েছেন, কাজেই লেখা দিতে পারবেন না। বুঝুন!

প্রলয় চাকলাদার সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন,—বুঝলুম। কিন্তু আমার কী করার আছে? গোয়েন্দা গল্প-টল্প আমার দ্বারা হবে না। আমায় ছাড়ুন।

তাহলে বিদ্যুৎ বাগল তো এইটুকুতে ছাড়তে পারেন না?

অতএব বলে উঠলেন,—তাহলে আমার জন্য একটা গুলি খরচ করুন দাদা! এখানেই শেষ হই!

—কী আশ্চর্য, কী যা তা বলছেন? যে-জিনিস আমি জন্মেও লিখিনি—

—বললুম তো— লেখেননি! লিখুন! কথা আদায় না করে নড়ছি না স্যার!

—কী মুশকিল! সে-লেখা ভালো হবে? শেষে কি লোক হাসাব?

—আপনার কলম 'জাদু' কলম দাদা। যাতে ছোঁয়াবেন তাই সোনা হয়ে যাবে।

প্রলয় প্রায় ধমক দিয়েই ওঠেন,—থামুন তো! ওসব কথা রাখুন। আপনি আর কাউকে বলুন গিয়ে।

—আর কাউকে?

বিদ্যুৎ বাগল হতাশ গলায় বলেন,— আর কে এমন আছে স্যার যে সাত দিনের মধ্যে আমায় একটা বিগ সাইজের জম্পেস উপন্যাস লিখে দেবে? অথচ ওটি না পেলে স্রেফ মারা যাব।

সর্বনাশ! একে জম্পেস তায় বিগ সাইজ, তার ওপর আবার সাতদিনের মধ্যে এবং প্রলয় চাকলাদার জীবনে যা না লিখেছেন, তাই।

তিনিও হতাশ হয়ে বলেন,—আপনি তো আচ্ছা মুশকিলে ফেললেন? হঠাৎ একটা ডিটেকটিভ গল্প লিখে ফেলা সোজা? আমি তো আপনার রণজিৎ রায় নই যে, চেনাজানা গোয়েন্দা আর তার অ্যাসিসট্যান্ট হাতে মজুত, একবার তাদেরকে টেনে এনে কলমের মুখে ছেড়ে দিলেই হল? তারা আপনিই তরতরিয়ে এগিয়ে যাবে?... আমায় তো প্লট ভাবতে অনেক মাথা ঘামাতে হবে! তারপর গিয়ে 'সিচুয়েশান' 'ক্লাইম্যাক্স' এসব চিন্তা করতে দেদার কাঠ খড় পোড়াতে হবে। অথচ সময় মাত্র সাতটি দিন।... আর দেখছেন তো আমার অবস্থা? সর্বদা লোক আর লোক -এই 'সাক্ষাৎকার' এই 'শুভেচ্ছা' এই পাড়ার পুজোর সুভেনিরের জন্যে গল্প, কিছু না হোক কোনো নতুন কবি তাঁর প্রথম কবিতার বইখানি আমায় উপহার দিতে এসেছেন! তা শুধু তো দিয়েই ক্ষান্ত হবেন না, আবার দু-দিন পরে অভিমত চাইতে আসবেন।... এইসব ঝামেলার মধ্যে— মাথা কাজই করতে চায় না।

বিদ্যুৎ বাগল হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে বলে ওঠেন,— আপনার অসুবিধেটি বুঝতে পেরেছি স্যার। তো আমি বলি কী কয়েকটা দিন এই শহরে থেকে পালিয়ে অজ্ঞাতবাসে গিয়ে থাকুন। দেখবেন মাথা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, লেখা চড়চড়িয়ে বেরিয়ে আসবে।

প্রলয় চাকলাদার আরও হতাশ গলায় বলেন,— পালিয়ে গিয়ে অজ্ঞাতবাস? সেই স্বর্গীয় জিনিসটি পাচ্ছি কোথায় হে বাগল মশাই?

বিদ্যুৎ বাগল দরাজ গলায় বলেন,— পাবেন। পেয়ে যাবেন।... কালই বেরিয়ে পড়ুন। আমি এক্ষুনি গিয়ে নবকুমারকে পাঠিয়ে একখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটিয়ে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা করিয়ে ফেলছি। আপনি কয়েকটা দিনের মতো জামা-টামা নিয়ে সুটকেসটা গুছিয়ে ফেলুন। ওঃ যখন 'অ্যাডভার্টিসমেন্টে' জানিয়ে দেওয়া হবে, 'প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রলয় চাকলাদারের কলমে— এই প্রথম গোয়েন্দা গল্প'।— তখন যা একখানা মারকাটারি হবে!

প্রলয় ব্যস্ত হয়ে বলেন,— আঃ, আপনার যে দেখছি 'আকাশ পাতাল'-এর 'স্পেশাল সংখ্যার' চিন্তায় মাথার মধ্যে আকাশ পাতাল তোলপাড় হতে বসেছে।... টিকিট কাটিয়ে রাখবেন মানে? কোথাকার টিকিট? কোথায় গিয়ে উঠতে হবে?

বিদ্যুৎ বাগলের মুখে একচিলতে বিদ্যুৎ খেলে যায়। এখন বেশ আত্মস্থ গলায় বলেন,—সে সব কী আর মনে মনে ঠিক করে না ফেলেছি স্যার? এই বিদ্যুৎ বাগলের কাজ সব আগে থেকে আটঘাট বেঁধে! এখনই মনের মধ্যে আটঘাট বেঁধে ফেললুম! যাবেন গোমোয়।

—গোমোয়!

—হ্যাঁ। কেন? গোমো কি একটা যাবার যোগ্য জায়গা নয়?... তা হয়তো তেমন ডাকসাইটে কুলিন জায়গা নয়। তবে সেটি হলেই তো আপনার গিয়ে সেই ডিসটার্ব! ধরুন আপনি একরকম অজ্ঞাতবাসে চলে যাচ্ছেন ক-টা দিনের জন্যে।... গোমোয় আমার এক মামাতো শালার মাসতুতো ভায়রাভাইয়ের একখানা ফাইন বাগানওয়ালা বাড়ি আছে। সারা বছর পড়েই থাকে। মাত্র পুজোর সময় সবাই দলবল বেঁধে যায়। ভাল বাড়ি, কেয়ারটেকার আছে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না দাদা! মনস্থির করে ফেলুন।

প্রলয়ের একবার মনটা দুলে উঠল। সত্যি এতদিন যেন কলকাতার বাইরে দু-চার দিন কাটিয়ে আসা হয়নি। ভেবে ভালো লাগছে।

কিন্তু ওই যে এক মস্ত ফ্যাসাদ। গোয়েন্দা গল্প। সুখ স্বস্তির বারোটা বাজিয়ে

দিচ্ছে।... আঃ, যদি ক-টা দিন বাইরে কোথাও গিয়ে শুধু ইজি-চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কাটিয়ে দেওয়া যেত!

একটু হেসে বলেন,— আপনার যা এনার্জি দেখছি, আমাকে না পাঠিয়ে ছাড়বেন না। তবে কতদূর কী করে উঠতে পারবো, তা বলতে পারছি না।

—ও কিছু না। ও কিছু না। ওর জন্যে কিছু ভাববেন না। কলম হাতে নিলেই আপনার হাতে মা সরস্বতীর ভর হয়ে যাবে।... আপনার সঙ্গে দিস্তে কয়েক ফুলস্ক্যাপ কাগজ দিয়ে দেব, আর গোটাকতক ডট্ পেন।... আর...।

—আহা, কাগজ কলম কেন? সে কি আমার নেই?

বিদ্যুৎ দ্রুতগলায় বলেন, —আমি কি তাই বলেছি স্যার? তবে কি না, বলছেন যখন আগে কখনও এধরনের লেখা লেখেননি, তখন মকশো করতে ধরুন অনেক ছিঁড়তে হবে, কাটতে হবে, ফেলতে হবে। হাতের কাছে দেদার মজুত থাকলে সুবিধে।... হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, আপনি খুব উৎকৃষ্ট কাগজে ছাড়া লিখতে পারেন না। তা সে ঠিক থাকবে। বাজার সেরা কাগজই—আর ইয়ে ওই ডট পেনও বরং পুরোপুরি এক ডজনই থাকবে।... আমি যতদূর জানি ওদের সেই বাড়িতে একটা মালি-কাম দারোয়ান আছে। রান্নার হাত অতি ভালো। আপনাকে নিজের জন্যে কোনো ভাবনা করতে হবে না স্যার।... তবু আমি আজই ভালো করে খোঁজ নিচ্ছি। গোমোর এখনকার স্টেশনমাস্টার আমার চেনাজানা। মানে, আমার এক ভাগনের কাকা। কাকার দৌলতে ট্রেনের টিকিট তো লাগে না। পাস পায়। ওই ভাগনের এক বন্ধু চৌধুরীদের ওই বাড়ির কেয়ারটেকার। ভাগ্নে কীজন্যে যেন কালই এসেছে কলকাতায়। আজ ফিরে যাবে। তার হাতেই সব খবর জানিয়ে!...

ঝড়ের বেগে বলে চলা এই কথাগুলো শে, হতেই প্রলয় বলে উঠলেন, —দেখুন, আপনার ওইসব রিলেশান-টিলেশান-এর ব্যাপার শুনে আমার তো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। মামাতো মাসতুতো 'বন্ধু' চেনাজানা 'ভাগনে' কতগুলো যেন বললেন! আসলে আমার সঙ্গে তো কারুরই—।

— কী আশ্চর্য! তাতে কী? আমি আমার ভাগনের হাত দিয়ে তার বন্ধুর কাছে সব লিখে একটা চিঠি দিয়ে দেব। যে আপনাকে স্টেশন থেকে কালেক্ট করে নিয়ে যাবে। আরে দাদা, সবকিছু আটঘাট বেঁধে—পুরো ব্যাপারটাই এক্ষুনি এক্ষুনি মনের মধ্যে ছকে ফেললুম। ব্যস্, এবার কাজে হাত। কাজ নাম্বার ওয়ান, —এক্ষুনি একটা ফার্স্টক্লাস টিকিট আর রিজার্ভেশানের জন্যে লোক পাঠানো। নাম্বার টু,— চিঠিটা গুছিয়ে লিখে ফেলে ভাগনের কাছে গছিয়ে দেওয়া। আর নাম্বার থ্রি হচ্ছে, আমার মামাতো শালাকে জানিয়ে দেওয়া, তাদের সেই

গোমোর 'মনোরঞ্জন ভবন'-এ একজন বিশিষ্ট বিখ্যাত বিশেষ সম্ভ্রান্ত অতিথিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, কয়েকটা দিন ওখানে থেকে বাড়িটাকে ধন্য করে আসতে।

—ওঃ। বিদ্যুৎবাবু, আপনার কথার মধ্যেকার বিশেষণ অলংকারগুলো পরিপাক হওয়া শক্ত।... তবে কথা হচ্ছে বললেন তো 'অজ্ঞাতবাসের' মতো, অথচ এত প্রচার?

—মাই গড! আপনি কী ভেবেছেন আমি আপনার নাম পরিচয় দেব?... মোটেই না। বিশিষ্ট তো কতদিকেই হয় লোকে।... বিশিষ্ট নিধনে যত্ন-টত্ন করার ব্যাপারে বেশি ওয়াকিবহাল হতে মালিটাকে নির্দেশ দিয়ে দেবে। সেই নির্দেশ পত্রটিও আজই আদায় করে ভাগনের হাতে দিয়ে দেব। সে তার বন্ধু কেয়ারটেকারকে—মানে—।

প্রলয় চাকলাদার বলে ওঠেন,— হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। বন্ধুর মামাতো স্টেশনমাস্টারের মাসতুতো ভাগনে না ভায়রাভাই ইত্যাদি তো?-- ঠিক আছে।... কিন্তু আমায় যে স্টেশন থেকে কালেক্ট করে নিয়ে যাবে, চিনবে কী করে?

—দাদা! আমায় কি তেমন বন্ধু পেয়েছেন? তার ব্যাবস্থা না করেই কি আর?... তবে হ্যাঁ নামটা একটু দিতেই হবে। ওই ইনিসিয়ালই দিয়ে দেব শুধু। পি. চাকলাদার—বয়েস চল্লিশ বিয়াল্লিশ, গায়ের রং ফর্সা। আর ইয়ে—বাঁ-দিকে কানের কাছে একটি লাল জড়ুল আছে এবং সঙ্গে আপনার একটা ছবিও দিয়ে দেব।

প্রলয় তালুকদার হা-হা করে হেসে ওঠেন,—আরেব্বাস! এ যে প্রায় 'নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা'র মতো। রওনার কালে পরনে কী থাকবে তারও বিবরণ দিতে হবে নাকি?

বিদ্যুৎও হেসে ফেলেন,—না, অতটা কিছু নয়। তবে আপনি তো সবসময় ধুতি পাঞ্জাবিই পরেন। ওটাও অ্যাড্ করে দিচ্ছি।

প্রলয় বললেন,— ট্রেনজার্নিতে কিন্তু আমি ধুতি পাঞ্জাবি চালাই না, শার্ট ট্রাউজারই সুবিধে মনে হয়।

—ও বটে বটে। তাই নাকি? ভাগ্যিস বললেন। যাক্, ঠিক আছে। তাহলে উঠি স্যার। আঃ, প্রাণে বড়ো শান্তি নিয়ে যাচ্ছি। ওঃ। আমাদের রণজিৎ রায় দেখবেন, তিনি ছাড়াও গোয়েন্দা গল্প লেখার লোক আছে। দেখে হাঁ হয়ে যাবেন।

প্রলয় বলে উঠলেন,—কী যে বলেন? উনি হলেন ও-বিষয়ে—যাকে বলে স্পেশালিস্ট। ওঁর কাছে আমি?

—কার কাছে কে কী, সে কথা আমি মানি না স্যার। কার মধ্যে যে কোন

প্রতিভা লুকিয়ে থাকে, সে নিজেই জানে না।... কে বলতে পারে, ভবিষ্যতে একদিন আপনিই বাজারের সেরা গোয়েন্দা গল্প লিখিয়ে হয়ে উঠবেন কি না।

প্রলয় একটু হেসে বলেন,— হলেও সেটা ভেবে খুব একটা রোমাঞ্চিত হচ্ছি না।

বিদ্যুৎ বাগল উদ্দীপ্ত হন,— কেন নয়? জানেন আজকাল আপনাদের ওই সাইকোলজি নিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা গল্প উপন্যাসের থেকে গোয়েন্দা গল্পের চাহিদা অনেক বেশি। বিশেষ করে আজকের তরুণ কিশোর সমাজে। গোয়েন্দা গল্প, রহস্য গল্প, আর ওই 'বৈজ্ঞানিক রূপকথা'র গল্প তাদের প্রচণ্ড টানে। এসবের মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার কত স্কোপ। গোয়েন্দা গল্পকে আপনি তুচ্ছ ভাববেন না।

প্রলয় চাকলাদার হেসে ফেলে বলেন,— আপাতত আপনার কাণ্ড কারখানা দেখে আর তুচ্ছ ভাবতে পারছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে।

—ঠিক আছে।... আমি তাহলে কাল একেবারে চিঠিটা নিয়ে আর ট্যাক্সি নিয়ে চলে আসছি। আপনাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে তবে নিশ্বাস ফেলব।... আচ্ছা ফোনে ট্রেনের টাইমটা সঠিক জানিয়ে দেব। একদম রেডি থাকবেন কিন্তু কাউন্ডলি।

বিদ্যুৎ বাগল চলে যেতেই ঘরের ভিতরদিকের দরজার পর্দা সরিয়ে একটা মুখ উঁকি মারল। চালাকচতুর একটু দুষ্টুমি ভাব মাখানো। বছর বাইশ তেইশ বয়েসের ছোকরার মুখ। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে এসে বলল,—বিদায় নিয়েছেন, তিনি?... উঃ। মাসিমা কি আর সাধে বলে, 'যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস।' আপনার কাছে যিনিই যখন আসবে, এক ঘণ্টার কম উঠবে না। ওদিকে মাসিমা ছটফটাচ্ছে আপনার নাওয়া-খাওয়ার বেলা হয়ে যাচ্ছে বলে।

প্রলয় তাড়াতাড়ি উঠে বলেন,—মা বুঝি খুব রেগে গেছেন?

—নতুন করে আর কী রাগবে? রোজই তো এক বিত্তান্ত! তো উনি যেন আপনাকে কোথায় যাবার জন্যে বলছিল?

প্রলয় চাকলাদার রেগে বলেন,—আড়ি পেতে সবই তো শোনো মানিক। আবার ন্যাকা সাজছো কেন? যা—আমার কয়েকটা দিনের মতো জামা-টামা আর সাবান তোয়ালে-ফোয়ালে যা যা লাগবে, সব ঠিক করে একটা সুটকেস গুছিয়ে রাখগে।... ইতিমধ্যে মাকেও বলা হয়ে গেছে বোধ হয়?

— আজ্ঞে না। ওনারে আপনিই বলবেন। আমারে তো দু-চক্ষের বিষ দেখে।

—বটে? মা তোকে দু-চক্ষের বিষ দেখেন? সারাক্ষণই তো শুনতে পাই কানাই! কানাই! কানাই বলতে চক্ষে হারা।

—সে তো এই কানাইটিই সংসারের ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো বলে। তো এখন চলুন চান-টান করতে।

কানাই কাজে দারুণ। পারে না এমন কাজ নেই, আর জানে না এমন ব্যাপার নেই। শুধু ওই একটা দোষ, বড্ড বেশি মাতব্বরি! ও যেন বাড়ির আর দুটো লোকের গার্জেন। হ্যাঁ। আর 'দুটোই' মাত্র। মা আর ছেলের এই সংসার। তবে ওই কানাইটি একাই একশো, এই যা।

কানাইয়ের কাছে মাকে রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তেই কোথাও যেতে পারেন প্রলয় চাকলাদার তা ভালোই জানেন তার মা, তবু তিনি না বলে ছাড়েন না। আমায় ওই 'কেনো'র হাতে সমপর্ণ করে যাচ্ছিস? এসে মাকে দেখতে পেলে হয়!

কানাই সতেজে বলে,—কেন? কানাই আপনারে হাতে পেয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসবে?

সুধাহাসি বলেন,— তোকে আর কষ্ট করে দিতে হবে কেন? আমাকেই তোর জ্বালায় হয় বিবাগি হয়ে যেতে হবে, নয় গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে হবে।

—ওঃ। তাই! দাদাবাবু আপনি রওনার আগে কানাই পালকে ছাড়ান দিয়ে যান। কানাইয়ের ত্রিভুবনে কেউ কোথাও না থাক, সেই দেগঙ্গাপুরে একখানা ভাঙা ভিটে এখনও পড়ে আছে। সেখানে গিয়ে পড়ে থাকবে।

প্রলয় চাকলাদার হেসে ওঠেন,— তোর বুঝি বিশ্বাস তোর সেই ভাঙা ভিটেটা এখনও 'তোর' আছে?

—তো ভিটে না থাক, গাছতলা তো কেউ কেড়ে নেয় নাই।

সুধাহাসি বলেন,—খুব যে বোলচাল! দাদাবাবু কলকাতা ছাড়বে, আর তুমি সোনার চাঁদ দাদাবাবুর মাকে চোর ডাকাত খুনে গুণ্ডা জোচ্চোর মস্তানদের হাতে ফেলে রেখে দিয়ে গাছতলায় বসে হাওয়া খাবে? কেমন? যাবার নাম যদি মুখে আনিস কানাই তোর রক্ষে থাকবে না।

বলে সুধাহাসি ছেলেকে বলেন,— তো যাচ্ছিস কোথায়?

—গোমা।

— এ রাম! রাম! ওটা কি একটা বেড়াতে যাবার জায়গা হল?

প্রলয় আর আসল কথা না ভেঙে বলেন,—ওই আর কি। অমনি থাকতে পাওয়ার জন্যে একখানা বাগান-টাগানওলা ভালো বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে— বিনিময়ে বেড়িয়ে আসা!

কানাই গম্ভীরভাবে বলে,— তা তো ঠিক। বিনি পয়সায় পেলে 'ফলিডল'ও খাওয়া যায়! কী বলেন?

—ওঃ। তোকে দেখছি ছাড়ান দিতেই হবে। এত বাক্‌তাল্লা।

—ঠিক আছে এই মুখে তালাচাবি।

—তা দাও মানিক। তবে আমার সুটকেসটা গুছিয়ে একটা তালাচাবি মারতে ভুলো না।

দুই

হাওড়া স্টেশনে তুলে দিতে এসে বিদ্যুৎ বাগল পই পই করে বলেছিলেন বটে,—কোনো চিন্তা নেই, স্টেশনে লোক থাকবে, আপনাকে রিসিভ করতে।... কিন্তু কোথায় কী? প্রলয় চাকলাদারকে নিতে এসেছে, এমন কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না।

কী আশ্চর্য! মানুষ এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়?

আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্ম তো ফাঁকা হয়ে এল। এখন কী করা?... একটা মাত্রই কথা মনে আছে সেই বাড়িটার নাম 'মনোরঞ্জন ভবন।"... ভগবান জানেন বাপ-ঠাকুরদা কারওর নামে, না মনের রঞ্জনতুল্য বলে?

এখনও রিকশা স্ট্যান্ডে দু-একখানা সাইকেল রিকশা রয়েছে। জংশন স্টেশন, হয়তো একটু পরেই আবার কোনো ট্রেন এসে পড়বে। তখন হয়তো আর জুটবে না।... হাতছানি দিয়ে একটাকে ডাকলেন।

—যায়েগা কাঁহা সাহাব?

সেরেছে। হিন্দি বলতে হবে! এটা আবার প্রলয়ের ঠিক আসে না। তবু সাবধানে বলেন,—মনোরঞ্জন ভবন কোঠি জানতা হ্যায়?

—মানো রাঞ্জানা? চৌধুরী বাবুকো?

প্রলয়ের তো জানা নেই সেই 'আকাশ পাতাল' সম্পাদকের সেই মামাতোর মাসতুতোটি 'চৌধুরী' না 'চ্যাটার্জি'! তবু ধাঁ করে বলে দিলেন,—হাঁ হাঁ, ওহি কোঠি। বাগান থা।

রিকশাওলা প্যাডেল মেরে বোঁ বোঁ চালিয়ে দিল!

ঘড়ি দেখলেন প্রলয়। সকাল আটটা!

নভেম্বরের শেষ, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস বইছে। তার সঙ্গে রোদের আঁচও পাওয়া যাচ্ছে। বেশ ভালোই লাগবার কথা। কিন্তু মন বেশ বেজার। অত অমন করে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও স্টেশনে লোক না থাকা। ভাবা যায় না! তার মানে বাগলের সেই ভাগনে না ভাইপো, প্রলয় চাকলাদারের পরিচিত পত্রটি এখানে কারও কাছে যদি দাখিল করে না থাকে, তাহলে উপায়?... প্রলয়কে কি ঢুকতে দেবে?...

কিন্তু কত দূর রে বাবা? যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন।

কত রকমের ঘরবাড়ি রাস্তা বাগান দেখতে দেখতে অবশেষে একটু নির্জন দিকে একটা বাগানওলা বাড়ির ফটকের সামনে থামল রিকশা।

—এই কোঠি!

প্রলয় চাকলাদার দেখলেন সত্যিই বটে, ফটকের মাথায় তোরণাকৃতিভাবে

ধনুকের মতো গোল করে একেবারে সিমেন্টের গাঁথুনিতে লেখা রয়েছে 'মনোরঞ্জন ভবন।'

স্বস্তি পেয়ে রিকশা থেকে নেমে পড়ে বলেন,— কেতনা ভাড়া?

—পন্দরা রূপাইয়া।

—অ্যাঁ, বল কী হে? পনেরো টাকা?

—ওহি রেট!

প্রলয় ভাবলেন, ভালো রে ভালো। কোথায় কেয়ারটেকার নিজে এসে নিয়ে যাবে, তা নয় এই ফ্যাচাং!

প্রলয় একখানা কুড়ি টাকার নোট বার করে বললেন,—পাঁচ রূপেয়া দেও।

—নেহি।

—নেহি মানে?

মানে আর কি, তার কাছে খুচরো পাঁচ টাকা নেই।

উঃ। এ এদের চালাকি! 'নেহি' বলে ওই পুরো কুড়িটা টাকা হাতাবে। একটু উচ্চগ্রামেই বললেন,— খুচরা রাখতা নাই কাহে?

সে আত্মস্থভাবে খইনি বার করে টিপতে লাগল।

কী আশ্চর্য! গেটে দারোয়ানও তো দেখা যাচ্ছে না। রাগ করে বললেন,— তব্ পুরা বিশ রূপেয়া লে লেও! তো মাল সামনে কোঠির অন্দরমে ভেজ দেও।

বললেন তো। কিন্তু 'অন্দরে' ঢুকতে দেবে কে? কাউকে তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে গেটে তালা লাগানো নেই এই যা রক্ষে।

টাইম নেহি। —বলে রিকশাওলা কুড়ি টাকার নোটটি ট্যাকস্থ করে নিজাসনে উঠে বসে ঘন্টি মেরে পা চালিয়ে দিল।

তা ওই ঘন্টিটায় কাজ হল। ভিতর থেকে একটা রোগাপটকা ছেলে শার্ট পায়জামার ওপর একখানা মোটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এল। আর এসেই প্রলয় কিছু বলার আগেই বলে উঠল,—কী ব্যাপার? 'খানিকটা ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে আবার এক্ষুনি ফিরে এলেন যে? আবার এত সব মালপত্র? এইখানেই কোথাও ছিল বুঝি?

প্রলয় বললেন,—কী বলছেন এলোমেলো? এই তো স্টেশন থেকে আসছি।... বিদ্যুৎ বাগল মশাই বলে দিয়েছিলেন, 'স্টেশনে লোক থাকবে'।— অথচ—

রোগাপটকা একবার প্রলয় চাকলাদারের আপাদমস্তক যাকে বলে জরিপ করে নিয়ে গম্ভীরভাবে বলে,— স্টেশনে কেউ যায়নি বলছেন?

—তা বলব না তো কী, বলব কেউ গিয়ে আমার যত্ন করে নিয়ে এল?

'পটকা' আরও গম্ভীরভাবে, আরও স্থিরভাবে প্রলয়কে যাকে বলে অবলোকন করে বলে,— যদি বলি সেটাই আনা হয়েছে স্যার! এই অধম নান্টু সরকারই নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে। এবং আপনাকে ঘর বুঝিয়ে দিয়ে সঙ্গের মালপত্র সেই ঘরে তুলিয়ে—

রাগে হাড়পিত্তি জ্বলে যাওয়া আর কাকে বলে?

তিনি সাহিত্যিক প্রলয় চাকলাদার, একজন পাঠক-মান্য ব্যক্তি, আর তাঁর সঙ্গে কিনা এইভাবে ইয়ার্কি মারা কথা? কিন্তু ঠাট্টা তামাশার উদ্দেশ্যটাই-বা কী?

প্রলয় বলেন,— দেখুন, স্বীকার করছি আপনার কথাবার্তা বুঝতে অক্ষম আমাকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল, স্টেশনে লোক থাকবে। এসে তেমন কাউকে না দেখতে পেয়ে নিজেই একটা সাইকেল রিকশা নিয়ে বাড়ি খুঁজে নগদ পনেরো টাকা ভাড়া দিয়ে চলে এসে এই দাঁড়াচ্ছি, আর আপনি কি না—

যদিও ওই পটকাকে আদৌ 'আপনি' বলে কথা বলতে মন চাইছে না তবু ভদ্রতা বলে কথা। পটকা, অর্থাৎ নান্টু সরকার কিন্তু আসল কথায় কান না দিয়ে চমকে উঠেছ বলে, — অ্যাঁ! বলেন কী? পনেরো টাকা? স্টেশন থেকে মাত্র পাঁচ টাকা হবার কথা!

প্রলয় বলেন,—আপনাদের কথা আপনারাই জানেন। কোনো কথারই তো ঠিকঠাক দেখছি না। তবে দূরত্ব-ও তো কম দেখলাম না। অনেক সময় লেগেছে।

—ওঃ। সরি তার মানে ব্যাটা আপনাকে বোকা পেয়ে, সরি, ইয়ে ভালোমানুষ পেয়ে, হোল টাউনটা ঘুরিয়ে এনেছে। তবে আমি যখন নিয়ে এলাম তখন তো দেখলেন, কত কম সময়ে—

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

প্রলয় চাকলাদার কড়া গলায় বলেন,— সেই থেকে কী একটা বাজে কথা বলে চলেছেন। মাথায় কোনো গন্ডগোল আছে নাকি?

নান্টু বিড়বিড় করে বলে,— তাই মনে হচ্ছে। তবে আমার নয়, মশাইয়ের।

—কী বলছেন?

—না না বলিনি কিছু। ও হ্যাঁ, বলছি। আপনি বলছেন আপনি এই এক্ষুনি, প্রথম এলেন? আমি আপনাকে স্টেশন থেকে রিসিভ করে আনিনি?

—বলছিই তো।

খুব জোর দিয়ে বলেন প্রলয়।

নান্টু কিন্তু নির্বিকার,—তার মানে, আমি আপনাকে রেস্ট নিতে এবং চা-টা

খেয়ে তবে বেরোতে অনুরোধ করিনি? আপনি তা সত্ত্বেও 'জরুরি কাজ আছে' বলে মালপত্র ঘরে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েই দরজায় চাবি লটকে বেরিয়ে যাননি?

প্রলয় হতাশভাবে বলেন,—বুঝতে পারছি না, আমি কোনো পাগলের পাল্লায় পড়লাম, না কোনো ধান্দাবাজের পাল্লায়! উঃ বিদ্যুৎ বাগল তো আচ্ছা জব্দ করল আমায়।... আপনি যদি পাগল বা কোনো চক্রান্তকারী ধান্দাবাজ না হন, তো বলতে হবে স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন।.. স্বপ্নের মধ্যে ভেবেছেন 'ডিউটি' পালন করতে স্টেশনে গিয়ে অতিথিকে নিয়ে এসে ঘরে ঢোকালাম। তারপর জেগে তাকে দেখতে না পেয়ে ভাবছেন সে আপনার চায়ের অফার ফেলে চলে গেছে।

—ওঃ। তাই বলছেন? বলি, আপনার নাম পি. চাকলাদার কি না?

—কে বলেছে নয়? আলবাত তাই।

—আচ্ছা এখন দেখুন তো, এই ছবিখানি কার?

বলে নান্টু সরকার তার পকেট দেওয়া পায়জামার পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে প্রলয়ের চোখের সামনে মেলে ধরে।

ফটো নয়। ছাপা ছবি। এই গত পুজোসংখ্যা 'আকাশ পাতাল'-এ প্রলয় চাকলাদারের যে বড়োগল্প বেরিয়েছিল, তার শিরোনার কাছে ছাপা হয়েছিল। ছবির নীচের নামটি কাটা হয়েছে।

প্রলয় বোঝেন বিদ্যুৎবাবুই এটির প্রেরক। সাবধানের মার নেই হিসেবে—বিশদ পরিচিতি দিয়ে, ওই ছবিটার কাটিংও পাঠিয়েছেন। অথচ প্রলয় দিব্যি একখানা 'মার' খাচ্ছেন।

ছবিটার দিকে এক নজর তাকিয়ে প্রলয় বলেন,—কার আবার? আমারই!

—স্বীকার করছেন তাহলে? বেশ বেশ। আমি তখন এই ছবি মিলিয়েই আপনাকে নিয়ে, আর আপনার মালপত্র নিয়ে, একটা সাইকেল রিকশায় চাপিয়ে চলে এসেছিলাম।

ছেলেটার যে মাথা খারাপ, তাতে আর সন্দেহ থাকে না প্রলয়ের। যেটা করার কথা, সেটাই করে ফেলেছে ভেবে— নিশ্চিতভাবে বলেছে।

কী আর করা যায়? ভালো বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছে বটে বিদ্যুৎ বাগল।

একটু ভেবে প্রলয় চাকলাদার বলেন,—আচ্ছা, আপনি ছাড়া আর কেউ সঙ্গে ছিল? যে আমায় দেখেছে!

—সঙ্গে ছিল না। বাড়ি ফিরে দেখছে দারোয়ান-কাম-মালি-কাম-কুক, রামসেবক। আজন্ম এই 'মনোরঞ্জন ভবনে' আছে। বেহারি হলে কী হবে, বাংলায় আমাদের কান কাটতে পারে।

উঃ। কী মস্তান-মার্কা কথা!

প্রলয় বিরক্তভাবে বলেন,—অতি উত্তম। তা তিনি কোথায়? ডাকুন তো তাঁকে।

—বাঃ। আপনি তো আচ্ছা ভুলো লোক মশাই? মনে হচ্ছে ভুলে যাওয়াটাই আপনার একটা ব্যাধি। তাকে আপনার সামনেই আপনার জন্যে মুরগি আনতে পাঠালাম না? আপনাকে জিজ্ঞেস করলুম—বললেন মুরগি আপনার ফেভারিট! বেশি কিছু চাই না, শুধু মুরগির ঝোল আর ভাত হলেই চলবে? কি? মুরগি পছন্দ করেন না আপনি?

—করি না তা বলছি না। তবে আপনাকে এত সব কখন বললাম, সেটাই রহস্য।... তো সেই 'বাংলার কানকাটা'টি মুরগি নিয়ে ফিরবে কখন?

প্রলয় আসলে এই পাগলের পাল্লা থেকে ছাড়ান পেতে আর একটা সুস্থ লোকের সন্ধান করছিলেন। কিন্তু নান্টু ও'র 'ছাড়ান পাওয়ায়' জল ঢালল। বলল,— স্টেশন বাজার থেকে আনলে তো এখুনি চলে আসত। কিন্তু ব্যাটা কি আর তা আনবে? নির্ঘাত সেই যে ওর কে দোস্ত মুরগি পালন করে, তার কাছ থেকে কিনতে যাবে। ওদের দোস্তপ্রীতিটা বড্ড বেশি!... কিন্তু এভাবে বাইরে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ কথা হবে? চলুন, আপনার এই মালগুলোও ঘরে তুলিয়ে দিয়ে, চা-টা'র ব্যবস্থা করি।... কী এখন সময় হবে তো? নাকি আবার জরুরি কাজে বেরিয়ে যাবেন?

হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে, একটু চা খাবার ইচ্ছেটা দারুণ-ই হচ্ছিল, তাই এই 'পাগলটির' সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে প্রলয় চাকলাদার বলে,— চলুন।

গেট থেকে লন পার হয়ে বেশ গোটাকতক শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। তার সামনে শ্বেত পাথরের চওড়া বারান্দা। মাঝখানে একটা দরজা। সেই দরজার মধ্য দিয়ে ঢুকলেই বড়ো একটি হল এবং হল-এর দু-পাশে সারি সারি কয়েকটি ঘর। ডান দিকের সব ঘরেই তালা ঝোলানো। ডান দিকের প্রথম ঘরটার সামনে এসেই নান্টু হাত বাড়িয়ে বলে,— এইতো আপনার ঘর। দিন চাবিটা দিন! খুলে আপনার এই বাড়তি মালপত্রগুলোও ঢুকিয়ে দিই।

চাবি!—প্রলয় আকাশ থেকে পড়েন ঃ আমি চাবির কী জানি?

—বাঃ। আপনি ঘরে তালা দেওয়ার পর চাবি আপনার প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন না?

প্রলয় এবার রীতিমতো রেগে গিয়ে বলেন,— দেখুন, এসে পর্যন্ত আপনার অনেক আবোল-তাবোল কথা সহ্য করছি। কিন্তু ক্রমেই মাত্রা ছাড়চ্ছেন। ঠিক আছে, ফেরত ট্রেন কখন বলুন, ফিরে যাচ্ছি। আচ্ছা বলবার দরকার নেই, আমি

ফিরে গিয়ে স্টেশনেই ওয়েট করছি।... বিদ্যুৎবাবু যে আমায় এভাবে একটা পাগুলে জায়গায় পাঠিয়ে দেবেন স্বপ্নেও ভাবিনি। দয়া করে একটা সাইকেল রিকশা আনিয়ে দিন।

নান্টু মনে মনে বলে, আমিও বাবা স্বপ্নেও ভাবিনি এরকম একটা 'বেভুল' লোক পাঠিয়ে আমার 'জান' খিঁচে নেবে। এই একটু আগে লোকটাকে জামাই আদরে স্টেশন থেকে নিয়ে এসে ঘর-টর দেখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলাম। ঘর দেখে দিব্যি সন্তোষও দেখাল, আর 'কাজ আছে' ছুতোয় 'একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে গিয়ে, মিনিট চল্লিশ পরেই ফিরে এসে একদম মগজ ফর্সা করে আনকোরার মতো ভাব দেখাচ্ছে। মানসিক রোগী? না কোনো ধাপ্পাবাজ?

মনে মনে এইসব ভাবলেও, লোকটা চলে যেতে চাইছে দেখে নান্টু সরকার একটু ঘাবড়ায়। দেখতে তো ভদ্রলোক রীতিমতো রেস্‌পেকটেবল ভদ্রলোকের মতোই! সাজসজ্জাও দিব্যি দামি। অবশ্য আজকাল জোচ্চোর ধাপ্পাবাজ বা সমাজ বিরোধী খুনে গুন্ডাদের সাজসজ্জার সঙ্গে অতি উচ্চমানের ব্যক্তিদের সাজের কোনো তফাত নেই। শুধু জামা-টামা নয়। এখন আর জুতো চশমা অ্যাটাচি কেস-এর কোয়ালিটি দেখেও ধরে ফেলা যাবে না, লোকটা কী দরের। আগে আগে নাকি গোয়েন্দা গল্পের গোয়েন্দরা ওইসব থেকেই ধরে ফেলতে পারত, লোকটা কোন শ্রেণির। নান্টুর মনে পড়ল, ছেলেবেলায় একটা ডিটেকটিভ গল্পে পড়েছিল, একজন খুনিই সেজে বেড়ানো ঘর-পালানো রাজকুমারকে শুধু তার নখের চাকচিক্য দেখে বুঝে ফেলেছিল এ জাত খুনি নয়।... এখন ওসব নেই। এখন সবাই সমান।

মনে মনে কথা বলা নান্টুর একটা রোগ। তবে ততক্ষণে নান্টু ঠিক করে ফেলেছে, তার প্রাণের বন্ধু বাহাদুরের সঙ্গে দেখা না করে একে যেতে দেওয়া চলবে না। বাহাদুর তো ওই বিদ্যুৎবাবুর মামা। যিনি জেনে বুঝে, (কিবা না জেনে, না বুঝে) অভাগা নান্টুকে একটি পাগল সাপ্লাই করেছেন।

এইসব ভেবেই নান্টু তাড়াতাড়ি বলে,—কী আশ্চর্য, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন? চাবিটা মনে হল তখন আপনি প্যান্টের পকেটে রাখলেন,—ঠিক আছে ডুপ্লিকেটটা দিয়েই খুলছি।

বলে দু-মিনিটের জন্যে কোথায় যেন ঘুরে এসে একটা চাবি এনে তালাটা খুলে দরজা হাট করে দিল।

তা ঘরটি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করা চলে।

মস্ত ঘর। খাট বিছানা, টেবল চেয়ার, আয়না, সোফা ওয়ার্ডরোব, হ্যাটর্যাক বুক সেলফ ইত্যাদি যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে সাজানো। বিছানায় বেশ সুন্দর

বেডকভার। দেয়াল ধারে রাখা রয়েছে একটি নতুন অ্যারিস্টোক্র্যাট সুটকেস আর একটি মাঝারি মাপের ঈষৎ পুরোনো চামড়ার সুটকেস এবং বইয়ের প্যাকেটের মতো কী একটা প্যাকেট।... সর্বদা ব্যবহারের চটিও হতে পারে।

প্রলয় চাকলাদার জিনিসগুলো একবার অবলোকন করে স্থির স্বরে বলেন, —কস্মিনকালেও এসব জিনিস আমার নয় ভাই। মনে হচ্ছে আপনি আর কারও সঙ্গে কিছু একটা ভুল করছেন।

—আর কারও সঙ্গে? কিন্তু এই ছবিটা আপনার তা স্বীকার করবেন তো?

অস্বীকার করব কী জন্যে? হান্ড্রেড পার্সেন্টি আমার।

—আপনার নাম যে পি. চাকলাদার, তা ও ঠিক।

—অফকোর্স!

—অথচ আপনি—ঠিক আছে এখন আপনার এই নতুন জিনিসগুলো এখানে রাখিয়ে দিই? ওই অ্যাটাচড ব্যথরুমে ঢুকে পড়ে হাত মুখ ধুয়ে নিন। পরে কথা হবে।

প্রলয় বললেন,—না না মশাই। সেটা হবে অন্যের ঘরে অনধিকার প্রবেশ। আমায় বরং আর একটা ঘরে—

নান্টু কাঁচুমাচু মুখে বলে,—আর একটা ঘরে? সে কিন্তু এভাবে সদ্য ফিটফাট করা নয়।

—না হোক। যা হোক একখানা ঘর হলেই চলবে। তবে অ্যাটাচড বাথরুমটি থাকা দরকার।

—সে তো এখানের সব ঘরেই।

নান্টু মনে মনে বলে, মনে হচ্ছে তুমি একটি ধড়িবাজ ঘুঘু লোক। এইসব প্যাঁচ কষে দু-খানা ঘরের দখল চাও। মুখে বলে,—তবে চলুন, মুখোমুখি ওই ঘরটা খুলে দিই। একই রকম। তবে ইয়ে, তেমন ফ্রেশ নেই।

যাহোক একটু করিয়ে দিন, তাতেই চলবে। উঃ। খুব একটা এক্সপিরিয়েন্স হল।

নান্টু মনে মনে বলে, আমারও।

তারপর বলে,—আচ্ছা মশাই, কিছু যদি মনে না করেন, এখানে এভাবে একা বেড়াতে আসার উদ্দেশ্যটা কী?... কর্তাদের যেসব আত্মীয়-টাত্মীয় মাঝে মাঝে আসেন বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে, নয়তো দল বেধে বেড়াতে। তাই জিজ্ঞেস করছি—

প্রলয় বলেন,—বিশেষ কিছু না। কিছুদিন একা একটু নিরিবিলিতে থাকা, এই আর কি।

—বাড়িতে বুঝি অনেক লোক?

—সেসব কথা পরে হবে, এখন একটু ফ্রেশ হতে পেলে—

নান্টু মনে মনে বলে, তখন কিন্তু তুমি ঠিক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলে, 'এদিকে একটু বিজনেস আছে।'... আর বলেছিলে, 'একজন বন্ধুকে একটু থাকার জায়গার জন্যে বলেছিলাম, সে যে এত ভালো ব্যবস্থা করে রেখেছে ভাবিনি। গ্র্যান্ড বাড়ি।' স্টেশনে নিতে গেছি দেখেই তো আহ্লাদে বিগলিত।.. অথচ, এখন নাঃ, ভেতরে কোনো গভীর রহস্য আছে!

প্রলয় দেখলেন, এ-ঘরটাও ওই একইরকম। শুধু বেডকভারটা তেমন বাহারি নয় এবং সবটাই যেন একটু ধুলোধুলো ভাব। তা হোক, এতটাই আশা ছিল না। এই 'মনোরঞ্জন ভবনের' মালিক বেশ বড়োলোকই মনে হচ্ছে। তবে ওই কেয়ারটেকারটা তো পাগল। দেখা যাক।

বাথরুমে ঢুকে প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। কাচের জানলা থেকে দেখা যাচ্ছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। গোলাপের বেড় রয়েছে বেশ খানিকটা।

বেশ আধুনিক ব্যবস্থাযুক্ত বাথরুম। সাবান তোয়ালে বার করে একেবারে স্নানটা সেরে নিয়েই চলে এলেন ঘরে। পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবী বার করে পরে নিয়ে, চুলে চিরুনি চালিয়ে, ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

এখন আর কেউ বড়ো একটা ধুতি পরে না। কিন্তু মা সুধাহাসির 'ধুতি' সম্পর্কে ভারী ভালোবাসা। তিনি বলেন,— পেন্টুল আর পায়জামা, এ তো দুনিয়া সুদ্দু জন পরছে। রিকশাওলা থেকে পানওলা পর্যন্ত। কিন্তু এই মুগা ধাক্কা ধুতি, আর চিকনের কাজ পাঞ্জাবি ক-জন পরে? ক-জনের জোটে? পাঞ্জাবিটা যদি বা পরে, ধুতি তো মোটেই নয়। তো বাড়িতে কানাই-ও পায়জামা পরে বেড়াবে, তুইও পায়জামা পরে বেড়াবি, এ আমার তেমন জুত লাগে না বাপু! আহা ধুতির কোঁচা, তার বাহারই আলাদা।

প্রলয় অবশ্য মায়ের কথায় হেসেছিলেন,—কানাই-ও ভাত খায়, আমিও ভাত খাই মা!

—তা হোক। তুই তো বাপু কলকারখানা অফিসে ছুটোছুটির কাজের লোক নয়? মা সরস্বতীর মুহুরি! তিনি যা বলেছেন তুই তাই লিখে চলেছিস। বসে বসে কাজ! মা সরস্বতীর মনের মতনটি হলেই ভালো না?

মা সরস্বতীর 'মনের মতনটি' কী? তাঁর দাদা কার্তিক? ফুলকোঁচা ধুতি উড়ুনি?—বলে হাসেন প্রলয়। তবু মায়ের ইচ্ছে পূর্ণ করেন। তবে ট্রেনে ওঠা উঠির জন্যে আছে দু-এক প্রস্থ পোশাক।

এখন স্নানের পর অভ্যস্ত সাজটাই করে নিলেন প্রলয়। যদিও শীতের মুখ, তবে এখন অনেকটা বেলা, রোদ উঠেছে চড়চড়িয়ে। তাই আর শাল গায়ে দিলেন না।

দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে হল-এ পা ফেলতেই একটা বাজখাঁই গলা প্রায় উথলে উঠল,—আবেব্বাস! সাহাব যে এখন বাঙালিবাবু বনে গেল।

হল-এর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোকটা। এক হাতের আঙুলে পেঁচানো দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা বেশ বড়োসড়ো রুই মাছ, অন্যহাতে দড়িতে ঝোলানো একজোড়া বেশ পুরুষ্টু মুরগী।

তার মানে ইনি রামসেবক।

কিন্তু এও কি পাগল না কী? এও তো এমন ভাব করল, যেন আগে দেখেছে প্রলয়কে। কিন্তু প্রলয় চাকলাদার তো ইহজীবনেও দেখেননি ওকে। ব্যাপারটা কী?... এটা কি এদের কোনো কারসাজি? অন্য কাউকে 'প্রলয় চাকলাদার' বলে চালিয়ে, আসল প্রলয়কে গোলমালে ফেলে ভাগাতে চায়?

কেন?

তাহলে কি এই মস্ত সুন্দর বাড়িখানা ওই দুটো মাইনে করা লোকের হাতে ফেলে রাখার সুযোগে, ওরা কোনো গোপনীয় ব্যবসা-ট্যবসা চালাচ্ছে? তাই ধরা পড়ে যাবার ভয়ে এই কৌশল?

তাহলে কি বিনা চেষ্টায় একটা গোয়েন্দা গল্পের প্লট পেয়ে যাবেন প্রলয়?... যার জন্যে বিদ্যুৎ বাগলের এত আকুলতা।

তবে মনের কথা ভাঙেন না প্রলয়। হল-এ পাতা সোফায় বসে পড়ে বলেন, —কই? আপনার চায়ের কী হল?

এই তো স্যার! সব রেডি, আপনার অপেক্ষাতেই।— নান্টু জোর গলায় হাঁকল ঃ বুনো।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা বছর বারো-তেরোর ধোপদুরস্ত পায়জামা আর পুরোহাতা শার্ট পরা ছেলে কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এল একটি ট্রে হাতে নিয়ে। নামিয়ে রাখল সামনের সেন্টার পীস-এ।

আয়োজনটি ভালোই। মোটা করে মাখন মাখানো খান চারেক টোস্ট, দুটি ডিমসেদ্ধ, দুটি পুরুষ্টু সিঙ্গাপুরি কলা, দুটো বেশ বড়োসড়ো মেঠাই, আর চারটি ডালমুট।

প্রলয় বললেন,—ওরেব্বাস। এত খাওয়া যায়? অর্ধেক কমান।

নান্টু বললো,—না না, এ এমন কী? এখানের হাওয়ায় খিদে বাড়ে। হাত লাগান।

প্রলয় তবু হাত লাগালেন না। বললেন,— না না, অর্ধেক কমান।

রামসেবক তখন মাছ মুরগি নিয়ে রান্নাঘরের দিকে কোথায় চলে গেছে। নান্টু বললে,—এই বুনো, তবে একটা প্লেট আন।... এ হচ্ছে স্যার রামসেবকের ভাতিজা, মানে ভাইপো। নাম বনোয়ারিলাল। আমরা অবশ্য 'বুনো' বলে ডাকি। দেশ থেকে কিছুদিন হলো এসেছে জ্যাঠার কাছে। এখানে তো আউটহাউসে যা ঘর আছে, আরও পাঁচটা ভাতিজা এনে পুষতে পারে।

বুনো একটা প্লেট আনল।

প্রলয় সত্যিই সবকিছু অর্ধেক তুলে দিয়ে টোস্টে কামড় দিলেন।

নান্টু বলল,—কলকাতার লোকের খাওয়া খুব কম। এত বেলায় ব্রেকফাস্ট করছেন—কী হল?

হঠাৎ কান খাড়া করল। সাইকেল রিকশার শব্দ না? আবার কে এল এখন?

সঙ্গে সঙ্গে রামসেবক সেই বাজখাঁই গলায় প্রায় একটা আর্তনাদ উঠল,— কৌন? কৌন? আপ কৌন হ্যায়?

এখন আর বাঙালির কানকাটা বাংলায় নয়, স্রেফ মাতৃভাষায়! কারুরই কি আর্তনাদের সময় মাতৃভাষা ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছু বেরোয়?

তিন

স্টেশনমাস্টার সত্যহরি সরখেল বলে উঠলেন,—বলিস কী বাহাদুর? তুই যে তাজ্জব করলি? একটা নয়, একজোড়া পি. চাকলাদার? তোর সেই 'আকাশ পাতাল' মামা চিঠিতে কী লিখেছিল, আর একবার বল তো শুনি?

—আঃ কাকা, দু-বার তো শুনিয়েছি। এই তো—পকেটেই রয়েছে চিঠিটা। আর একবার শোনো।

'একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। সেই 'মনোরঞ্জন ভবনে'— যেখানে সেবার আমরা গিয়ে কয়েকদিন থেকে এসেছিলাম। ভালোভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবে। তোমার সেই প্রাণের বন্ধু কী যেন নাম, যে ওই বাড়িটির কেয়ারটেকার তাকে বিশেষ, করে বলে দেবে যেন আতিথ্যের একটুও ত্রুটি না হয়। 'চোধুরীদের' সঙ্গে ফোনে কথা কয়ে নিয়েছি। তারা তো খুবই খুশি।... সেই চমৎকার রান্না করিয়ে-মালি-কাম দারোয়ানটি আছে তো?... এই সঙ্গে মিঃ পি. চাকলাদারের একখানি ছবি রইল, সেই কেয়ারটেকারটি যাতে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার সময় সহজে চিনতে পারে।'

—এসব থেকে আর বেশি বিশদ কী লিখতে পারা যায় কাকা?

সত্যহরি বলে,—কই সে-ছবিটা দেখি, কেমন লোক।

—বাঃ। সেটা এখন আমি কোথায় পাব? সে তো নান্টুকে দিয়ে দিয়েছিলাম।

ভদ্রলোককে এক নজরে চিনে নিয়েই ও যত্ন করে নিয়ে এসেছিল। তারপর এই কাণ্ড !

—বলছিস? দুজনেরই এক চেহারা?

—অবিকল। এমনকী কানের কাছে গালের পাশে একটু লাল জড়ুল পর্যন্ত।

—তাজ্জব! তার মানে দুজনের মধ্যে একজন ধাপ্পাবাজ। কী মতলব কে জানে? তো এখন কে জেনুইন, কে ছদ্মবেশী নকল কী করে ধরা যাবে?

—সেই তো প্রবলেম! মামা অন্য কথা এত বিশদ করে বলেছে, অথচ একবারও বলেনি তাঁর রেস্‌পেকটেবল গেস্ট-এর পেশাটা কী? কী কাজে এখানে আসছেন!... সেটা জানতে পারলেই—অথচ দুজনের কেউই নিজেদের পেশার অথবা আসার উদ্দেশ্যটা কী তা ভাঙছে না।... একজন একবার বলেছিল 'এখানে একটু বিজনেস আছে'—বাস!

সত্যহরি বলেন,—এটাই তো দেখছি আসল প্রবলেম? যে লোকটা 'জেনুইন', ধরে নিচ্ছি তোর 'আকাশ পাতাল মামা' যাকে পাঠিয়েছে, তার তো কোনো কিছু গোপন করার দরকার নেই। অফিসের কাজেই আসুক, বা নিছক বেড়াতেই আসুক, বলতে বাধা কী?

সত্যহরি বললেন,—তা দুজনে যখন দেখা হলো তখন?

—আরে বাবা! দেখা আবার কখন হল? একজনকে তো নান্টু স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিল, ছবির সঙ্গে মিলিয়ে, সে নাকি মালপত্তর রেখে 'জরুরি কাজে যাচ্ছি' বলে চলে গিয়ে, খানিক পরে আবার কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এসে বলে, সে এইমাত্র স্টেশন থেকে আসছে। কেউ তাকে আনতে যায়নি। অথচ কথা ছিল কেউ যাবে।... তারপর কিনা নিজের রাখা জিনিসগুলোকে ঝেড়ে অস্বীকার। বলে, 'না না এসব মালপত্র আমার নয়।' সেই ঘরটাতেই থাকতে রাজী হলো না। নান্টু ভেবেছিল, বোধ হয় কোনো স্মৃতি-হারিয়ে-ফেলা রোগের রুগি। তাই আর একটা ঘরে তাকে প্রতিষ্ঠা করা হল।

তিনি আরামসে চান-টান সেরে ফুলকোঁচা ধুতি পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে সবে চা খেতে বসেছেন, ঠিক সেই সময় রামসেবক ভূত দেখার মতো হাঁকপাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। আরও একটা পি. চাকলাদার।... তো এ-লোকটা নাকি রামসেবকের 'কৌন কৌন' বলে চিৎকার শুনে রেগে আগুন। বলে নাকি 'সক্কালবেলা দারু পিয়েছ? তারপর গটগট করে ঢুকে এসে পকেট থেকে চাবি বার করে সেই ঘরটার তালা খুলে ঢুকে দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে—ঘণ্টাখানেক ধরে চান চালাচ্ছিল। ততক্ষণে 'ধুতি পাঞ্জাবি' ব্রেকফাস্ট সেরে 'যাই একটু বেড়িয়ে আসি' বলে বেরিয়ে গেছেন। রামসেবকের

চেঁচামেচিটা বিশেষ গ্রাহ্য করেননি। বোধ হয় ভেবেছেন, কোনো ফালতু লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তো সেকেন্ড ম্যানটি চান সেরে বেরিয়ে আসার আগেই তো—হ্যাঁ, দুজনের মধ্যে একটা তফাত, একজন ‘ধুতি পাঞ্জাবি’, আর একজন ‘পায়জামা পাঞ্জাবি’। তা ছাড়া—

সত্যহরি অভিনিবেশ সহকারে সব শুনে বলেন,— আমার মনে হচ্ছে যে-লোকটা পরে একা একা এল, সেই লোকটাই ধাপ্পাবাজ, ছদ্মবেশী।

—কী করে বুঝছ?

—আরে বুঝছিস না, ছবি দেখে মিলিয়ে যাকে নিয়ে এল সেই লোকটাই ঘরের চাবি পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল!

—বাঃ। তাতে কী প্রমাণ হল?

—প্রমাণ হল যে, সে খাঁটি বলেই কোনো উলটোপালটা কথা বলেনি। সপ্রতিভভাবে চাবি খুলে ঘরে ঢুকেছে। হ্যাঁ। আর একটা কী বলছিলে—‘তা ছাড়া’ বলে?

—ওঃ। বলছিলাম, বাহাদুর হেসে উঠে বলে, ধুতি পাঞ্জাবিটির হচ্ছে পাখির আহার। আর পায়জামা পাঞ্জাবিটি নাকি স্রেফ বকরাক্ষস!

—অ্যাঁ!

—নান্টু তো তাই বলল। বলল, ‘ধুতিবাবু’ নাকি খাবারের অর্ধেকটা তুলিয়ে দিয়ে তবে হাত দিয়েছিলেন, আর ‘পায়জামা বাবু’ নাকি কেবলই বলেছে--আউর লাও। এক ডজন টোস্ট, হাফ ডজন ডিম সেদ্ধ, আটটা কলা, ছ-টা মেঠাই, খান চারেক চিজ্, আর তিনশো গ্রাম তো মাখন—

—য্যাঃ। তোর বন্ধু মজা করতে বানিয়েছে।

—বাঃ। বানিয়ে তার লাভ? তা ছাড়া তার কি এখন ওসব মজা মাথায় আসছে? কী একখানা সাংঘাতিক বিপদে পড়েছে ভাবো কাকা? কত সুখে কাটছিল, হঠাৎ একসঙ্গে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল একজোড়া চাকলাদার!... এখন কাকে রাখে, কাকে ফেলে।

সত্যহরি বলেন,— তা বটে। তবে ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং! ঠিক ডিটেকটিভ গল্পের মতো। একটা শখের গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলে সে ধরে ফেলতে পারত কে আসল, কে নকল। এবং নকলের অভিসন্ধিটা কী? তবে আমার তো মনে হচ্ছে নকলটি একটু গুজগুজে আর চাপাচাপা হবে!

—নান্টু বলছে দুজনেই গুজগুজে আর চাপাচাপা! কী উদ্দেশ্যে এসেছে এখানে, দুজনের কেউ নাকি ভাঙেনি!

সত্যহরি আর একবার বলেন,— ভেরি ইন্টারেস্টিং।

চার

বেড়াতে বেরিয়ে প্রলয় চাকলাদার একটু পরেই ফিরে এসেছিলেন। রোদ চড়া হয়ে গেছে, তা ছাড়া ঠিক বেড়াবার মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্পন্ন কোনো জায়গাও নয়। আর সবচেয়ে বড়ো কথা এক সপ্তাহের মধ্যে একখানি জম্পেশ গোয়েন্দা গল্প খাড়া করে তবে কলকাতায় ফিরতে হবে।

ফিরে আসতেই নান্টু বলল,—আপনার ডুপ্লিকেটটি তো এসেই স্নানে ঢুকেছে ওই ও-ঘরে।

প্রলয় থমকে বলেন,—আমার ডুপ্লিকেট? মানে?

মানেটা তো স্যার আমার কাছেও পরিষ্কার নয়। যাঁকে সকালে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছিলাম, তিনি এবং আপনি দুজনে তো দেখছি একই মূর্তি! একদম 'জেরক্স কপি'। অথচ—

প্রলয় চাকলাদার বাধা দিয়ে বলেন,— এই বাড়িটার কি 'ভূতের বাড়ি' বলে কোনো সুনাম আছে?

—কী যে বলেন? এ-বাড়িতে বলে কত জনা এসে— প্রলয়, আবারও বাধা দেন,— তাহলে জিঞ্জেস করতেই হয়, আপনি কি সম্প্রতি কোনো মেন্টাল হসপিটাল থেকে ছিটকে পালিয়ে এসেছেন?

—কী? কী বললেন? আমাকে পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন?

—কী করব বলুন? তার আগে যে আপনি আমায় পাগল বানিয়ে ফেলতে চাইছেন।... এসে পর্যন্তই এত অদ্ভুত উলটোপালটা কথা শুনতে হচ্ছে। ভালো এক জায়গায় পাঠালেন আমায় বিদ্যুৎবাবু!

—ওঃ। বলতে চান বিদ্যুৎবাবু আপনাকেই পাঠিয়েছেন?

—বলতে 'চাইছি' মানে? যেটা সত্যি সেটাই তো বলছি!

—কাইন্ডলি তাহলে বলুন তো স্যার আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী? সাধারণ স্বাভাবিক ভদ্রলোক হলে বলতে বাধা থাকার কথা নয়।

রাগে কানমাথা ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে প্রলয় চাকলাদারের। ইচ্ছে হয় এক্ষুনি গটগট করে বেরিয়ে যান 'নিকুচি করেছে তোদের মনোরঞ্জন ভবনের' বলে। যতক্ষণ না ট্রেন পাবেন, ওয়েটিং রুমে কাটিয়ে দেবেন।

কিন্তু রাগটা সামলে নিলেন।

নাঃ, চলে গেলে তো চলবে না। ভেতরে নির্ঘাত কোনো একটা রহস্য চক্রান্ত আছে বলেই মনে হচ্ছে। যাতে করে প্রলয় চাকলাদারকে অপমান অপদস্থ করে, রাগিয়ে দিয়ে, যেভাবেই হোক এখান থেকে বিতাড়ন করা যায়। তা এদের

উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করার সহায়, হওয়া তো ঠিক নয়! চলে যাওয়া চলবে না। বোকামি হবে। গেঁড়ে বসে থেকে রহস্যটি ভেদ করার চেষ্টা করতে হবে।... কে জানে— বিরাট একটা গ্যাংই ধরা পড়ে যাবে কিনা এ থেকে। তবে বোঝা যাচ্ছে আমার ছবিটা আগে থেকে হাতে পেয়ে মেকআপ দিয়ে একটি জাল 'পি. চাকলাদার' বানিয়ে রেখেছে।...

সেই সেকালের 'জাল প্রতাপচাঁদ, বা জাল 'ভাওয়াল সন্ন্যাসীর' মতো।... কিন্তু কেন রে বাবা? আমার তো আর কোনো সম্পত্তি-টম্পত্তি নেই যে 'জালের' জালে জড়িয়ে হাতিয়ে নেবে। তবে দেখতে হবে!

মনে মনে এটি স্থির করে ফেলে ব্যাঙ্গর গলায় বলেন,— তাহলে ধরে নিন, আমি একজন অ-সাধারণ অ-স্বাভাবিক অভদ্র ব্যক্তি!... আচ্ছা ঠিক আছে তাই ভাবুন। তো আপাতত আমার আসার উদ্দেশ্যটি বলছি না। আচ্ছা এখন নিজের কাজ করতে দিন।... লাঞ্চের আগে আর ডাকাডাকি করবেন না। হ্যাঁ, লাঞ্চটা আপনাদের ক-টার সময়?

নান্টু বিরত গলায় বলে,— একটা, দেড়টা।

—ঠিক আছে। একটার সময়ই দরজায় 'নক' করবেন।

বলে, ধীরভাবে সেই নিজের নির্দিষ্ট ঘরের মধ্যে ঢুকে যান। এবং ঢুকেই ভিতর থেকে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দেন। না দিলেই ঠিক ডিস্টার্ব করতে আসবে।

ঢুকে এসে বিদ্যুৎবাবুর দেওয়া কাগজের পাহাড় থেকে এক গোছা বার করে নিয়ে টেবিলে রাখলেন। বার করলেন নিজের কলমটি। গুছিয়ে চেয়ারে বসে দু-হাতে মাথাটা চেপে ধরে গোয়েন্দা গল্পের প্লট খুঁজতে থাকলেন।

কিন্তু দু-নম্বর চাকলাদার?

তিনি তো স্নান সেরে পায়জামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে এসে সেই বাহাদুর বিকৃত বকরাক্ষসতুল্য আহার্যগুলি পেটে চালান দিয়েই বলেন,— আচ্ছা, আমি আর একটু বেরোচ্ছি! লাঞ্চের আগেই ফিরব। ক-টার সময় খান আপনারা?

— ওই আর কি— একটা দেড়টা।

—ঠিক আছে। এসে যাব। হ্যাঁ, লাঞ্চের মেনুটা কী? আমার আবার দুপুরের খাওয়াটা একটু জম্পেশ না হলে—হাঃ হাঃ!

নান্টু থ হয়ে যায়। এইমাত্র পেটের মধ্যে একটি গন্ধমাদন চালান করে ফেলেছে না? এক্ষুনি আবার হিসেব নিতে ইচ্ছে হচ্ছে দুপুরে কী মেনু?

এ-লোকটার ওপর এখন একটু বিরাগ আসে। যেরকম ভোজন রসিক লোক, নির্ঘাৎ ওই পুরুষ্টু মুরগি দুটো আর পাকা রুইটার বারো আনাই এঁর গহ্বরে যাবে।

ব্রেকফাস্টে বসেই আবদার চালান,—কী মশাই আর কিছু নেই? বার করুন তাই আরও কিছু। আমার কিন্তু আপনাদের মতো 'হোমিওপ্যাথি ভোজে' হবে না। কবিরাজি ভোজ লাগবে!

কিন্তু রাগ বিরাগ যাই হোক, মেনে নিতেই হবে। চৌধুরী কর্তাদের অর্ডার— অতিথিকে চব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয়য় পরিতৃপ্ত করতে হবে। পরে যেন না শোনেন তেমন যত্ন হয়নি।... আসলে ওঁদের তিন ভাইয়েরই এই অতিথি বাতিক। তার জন্যে ওনাদের একটা 'ফান্ডই' আছে।...কিন্তু কে যে সত্যি গেস্ট, আর কে 'জাল' তা তো বোঝা যাচ্ছে না। কাজেই দুজনকেই সমান খাতির করতে হবে।

'কবিরাজি ভোজ' বাড়ি থেকে বেরোবার পরই বাহাদুর এল। বন্ধুর মুখে সব শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলে উঠল,— একটা উপায় আছে।

—কী উপায়?

—মামাকে যদি একটা ট্রাঙ্ককল করে জেনে নেওয়া যায়, মামা যাকে পাঠিয়েছে, সে 'কবিরাজি' না 'হোমিও!'

নান্টু একটু উৎসাহিত হয়ে বলে,— তা মন্দ বলিসনি। তো ট্রাঙ্ককলটা হবে কীভাবে?... এ-বাড়ির টেলিফোন তো দোতলায় কর্তাদের খাসমহলে। ওরা তো বছরে একবার আসে— সারাবছর অকেজো হয়েই পড়ে থাকে। দোতলার সিঁড়ির দরজার তালার চাবিটা আমার কাছে থাকে না।

—কেন বল দিকি? তোকে সন্দ করে নাকি?

—ধ্যাৎ। তা ঠিক নয়। তবে তিন ভাইয়ের ব্যাপার তো! কার কোথায় কী দামি জিনিস আছে! বউদের গয়না-টয়নাও থাকতে পারে। কোনোভাবে কিছু লস গেলে, আমারই ঝামেলা। তাই আমিই রাখি না।

—ঠিক আছে স্টেশনে কাকার অফিসঘর থেকেই করা যাবে।

—সে তো অনেক দেরি হবে।

—ততটুকু সময় ধৈর্য ধর।... কিন্তু কথা হচ্ছে, কাকে রেখে কাকে ভাগাতে হবে, সে ডিসিশান কে নেবে?

—জানি না। তোর মামা আচ্ছা এক বিপদ চাপিয়ে দিল বাবা আমার মাথায়!

বাহাদুর বলল,— বাড়ির মধ্যে যিনি রয়েছেন এখন, সে তো হোমিও ভোজ? মানে সেকেন্ডম্যান? তো দরজা বন্ধ করে করছেটা কী, দেখার উপায় নেই?

—একেবারে নেই, তা নয়। অ্যাটাচড বাথরুমের জানলাটা কাচের। আর সেটা বাগানের দিকে। একটা টুলে উঠে জানলায় উঁকি দিয়ে দেখলে হয়। যদি অবশ্য ঘরের মধ্যে থেকে বাথরুমের দরজাটা খোলা থাকে!

—কাউকে না জানিয়ে চল না দেখে আসি একবার।

—কাউকে না জানিয়ে? টুলটা এনে দেবে কে?

—কেন? আমরা একটা টুল বয়ে আনতে পারি না?

—তা পারব না কেন? তবে ওসব জিনিসপত্তরের ঘরের চাবি তো রামসেবকের কাছে।

—বাপস্! তোদের 'চাবির বন্ধন' দেখে মাথা ঘুলিয়ে যায়। বড়োলোকদের ব্যাপারই আলাদা। তো বাগানে কোনো শক্তপোক্ত গাছ আছে? যাতে চড়া যায়? চড়তে গিয়ে ডাল ভেঙে পড়ে হাত-পা না ভাঙে?... না কি শুধুই গোলাপ বাগান?

—না না শক্ত গাছও আছে কিছু। আম গাছ, জাম গাছ, জারুল গাছ ইউক্যালিপটাস গাছ—

—হয়েছে হয়েছে। ওই একটা আম জামেই হবে। তবে চল চুপিচুপি। তোর ওই রামসেবক না টের পায়। কেউ গাছে চড়েছে দেখলে 'কৌন' 'কৌন করে নির্ঘাত বাজখাঁই হাঁক ছাড়বে।

নিঃশব্দে বাগানে বেরিয়ে এল ওরা একটা পাশের প্যাসেজের দরজা দিয়ে।

গাছটা জানলার খুব কাছাকাছি নয়, তবে চড়ে বসে অবলোকন করলে দেখা যায়। কাচের জানলা দিয়ে ঘরে আলো ঢোকায় ঘর স্পষ্ট।

অনেকক্ষণ পরে গাছ থেকে নামল বাহাদুর।

নান্টু রেগে বলে,—অতক্ষণ কী দেখছিলি? জানলা খোলা ছিল?

বলে অবশ্য চাপা গলাতেই।

বাহাদুর বলে,— ঘরে চল বলছি।

—এই তো ঘরে এলাম, কী বলবি বল!

বাহাদুর বলে,— আমার লাক্, গাছের ডালে পা রাখতেই দেখি বাথরুমে এসে বেসিনের কল খুলে দু-হাতে জল নিয়ে চোখেমুখে দিচ্ছে, মাথায় দিচ্ছে। দিচ্ছে তো দিচ্ছেই।... তারপর আনলা থেকে তোয়ালে নিয়ে মুখ মাথা মুছল।

—চটপট কর বাহাদুর।

—বাঃ। ও চটপট না করলে, আমি করব কী করে? একে একে বলতে হবে তো?... তারপর ঘরে ঢুকে গেল। দরজাটা খোলাই রইল।... তারপর টেবিলের ধারে চেয়ারে বসে, কাগজ কলম নিয়ে খসখস করে খানিকক্ষণ কী যেন লিখল।... তারপর মাথার চুল খামচাল।... তারপর বাথরুমের জানলাটার দিকে তাকাল—

—অ্যাঁ। দেখতে পেল নাকি?

—ভগবান জানেন!... মনে তো হল আকাশপানে তাকিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছে।... তারপর আবার উঠল, আবার মুখেচোখে জল দিল। তারপর ঘরে ঢুকে বাথরুমের দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

—বাহাদুর! তাহলে নির্ঘাত দেখতে পেয়েছে।

—গড নোজ। ... আকাশচোখো হয়ে ছিল তো একটু।

—কাজটা বোধ হয় ভালো হল না রে বাহাদুর।

বাহাদুর অবহেলায় বলল,—খারাপটা কী? যদি জোচ্চোর হয়, তাহলে প্রাণে একটু ভয় ঢুকবে। বুঝতে পারবে আমরা ওকে সন্দেহ করে ওয়াচ করছি।

—কিন্তু কী লিখছিল বল তো?

—কী জানি। চিঠি বলে মনে হল না। লম্বা সাইজের কাগজের গোছা যেন!

—তার মানে কোনো ষড়যন্ত্রের ব্যাপার।... এখানে এসে কী কী হল, তা লিখে দলকে রিপোর্ট দেবে। নিশ্চয় পেছনে কোনো গ্যাং আছে।... কী করা যায় বল তো বাহাদুর? কী মতলবে এসেছে বোঝা যাচ্ছে না। কর্তারা সব দিল্লি বোম্বাই মাদ্রাজে বসে থাকেন, এই ব্যাটা নান্টু সরকারের ঘাড়ে যত ঝক্কি। এত 'গেস্ট প্রেমিক' হবার দরকারটা কী? তোমাদের বাড়ি ঘর বাগানপত্তর আগলালাম, চুকে গেল কেয়ারটেকারের কাজ। তা নয়, নিত্যি গেস্ট আসার ধুম। তাদের জামাই আদরে খাওয়াও-দাওয়াও! দেখ-ভাল করো।

বাহাদুর মুচকি হেসে বলে, —তাতে অবশ্য তোদের কিছু লোকসান হয় না। জামাই আদরের খরচা তো আসে ফান্ড থেকে! তো সেই গেস্ট-এর অনারে তোদেরও তো যখন তখন রাজার মতোই খাওয়া-দাওয়া!... শুধু কেয়ারটেকার আর মালির জন্যে তো আর যখন তখন মুরগি, মাটন, পাকা রুই, গলদা চিংড়ি, ভেটকি বিরিয়ানি, ফ্রায়েড রাইসের বরাদ্দ থাকে না? যা থেকে কেয়ারটেকারের বন্ধুবান্ধবদের পর্যন্ত জুটে যায়।

নান্টু হেসে ফেলে বলে,—তা যা বলেছিস। আর সত্যি এরকম গোলমেলে গেস্ট তো কস্মিনকালেও আসেনি। ভাবনা হচ্ছে কর্তাদের কোনো বিরোধীপক্ষ ওনাদের কোনা ক্ষতি করার মতলবে—

—ধ্যাৎ! ওঁরা অত ভালো লোক। তা ছাড়া ওঁরা তো পলিটিক্স করেন না। ওঁদের আবার বিরোধীপক্ষ কী?... আমার মনে হচ্ছে এই দুজনার মধ্যেই কোনো ব্যাপার আছে। যাকগে মামাকে ফোন করে অন্তত জেনে নেওয়া যাক, মামা যাকে পাঠিয়েছে সে 'হোমিও ভোজ' না 'কবিরাজি ভোজ!' তা ছাড়া লোকটা করে কী... এদিকে তো ফুল বাবুটি! চেহারাখানাও তো দিব্যি!

—তো তোর 'আকাশ পাতাল' মামাকে এটাও বল না, একজোড়া 'পি চাকলাদার' এসে হাজির হয়েছে।

বাহাদুর তাতে রাজি হল না। বলল,— স্টেশনমাস্টারের অফিসঘরের ফোনে অতসব সিক্রেট কথা বলা চলে না। নানান কান হবার ভয়। তাহলে এরা সাবধান হয়ে যাবে!... ইস, যদি একটা ভালোমতো প্রাইভেট গোয়েন্দা পাওয়া যেত! রহস্য ফাঁস হয়ে যেত।

নান্টু নিশ্বাস ফেলে বলল,— মনে হচ্ছে কোনা বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

বাহাদুর গম্ভীর গলায় বলল,— হাতের সামনে তো একটা মস্ত বিপদ দেখতেই পাচ্ছি রে নান্টু। তোর ওই কবিরাজি ভোজ কি আর তোদের কোনো কিছু রাখবে? হয়তো সবই মেরে দেবে।

—দুর ওসব আর এখন ভাবছি না। ভাবছি, লোকটা দরজায় খিল লাগিয়ে লিখছেটা কী? নিশ্চয় কোনো গোপন ব্যাপার।

পাঁচ

কিন্তু কী লিখছিলেন প্রলয় চাকলাদার?

মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলেও একটা গোয়েন্দা গল্পর 'প্লট' মাথায় আনতে না পেরে, লিখতে বসেছিলেন,— ঠিক করতে পারছি না চলে যাব না থেকে যাব।... ব্যাপারটি বেশ ঘোরালোই মনে হচ্ছে।... একটু আগে চোখেমুখে জল দিতে গিয়ে বাথরুমের জানলা দিয়ে নজরে পড়ল, কাছেই একটা গাছের ওপর উঠে পাতার আড়ালে গা ঢেকে কেউ একজন আমাকেই ওয়াচ করছে। তা ছাড়া আর কী হবে? গাছটা তো আগেই দেখেছি। আম গাছ। তো এই নভেম্বর মাসে কি সেই গাছের ডালে ডালে আম ঝুলছে? যে পাড়ার পাজি ছেলেরা আম চুরি করতে গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়বে? 'ছেলে' বলেই মনে হল। দ্বিতীয়বার চোখমুখে জল দেবার ছুতোয় ভালো করেই দেখে নিলাম। ছেলেই, তবে ওই মস্তান মার্কা কেয়ারটেকারটি নয়। সে তো রোগাপটকা। এর একটা পা গাছের ডাল থেকে ঝুলছিল, খুব গোবদা গোবদা!

... কিন্তু আমায় ওয়াচ করবার মানেটা কী? তবে কী! কী মতলবে কে জানে আমার একটা ডুপ্লিকেট বানিয়েছে, বলছে, একদম 'জেরক্স কপি', তাকে ভালোমতো তালিম দিতে?... আকৃতিতে জেরক্স কপি বানানো যত সহজ 'প্রকৃতি'তে তো তত সহজ নয়!... এই যে সিনেমা থিয়েটারে দরকার মতো 'মেকআপ ম্যান' অভিনেতাদের দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই 'নেতাজী' বানাচ্ছে

'গান্ধীজী' বানাচ্ছে, 'বিদ্যাসাগর', 'রাজা রামমোহন', 'ঠাকুর রামকৃষ্ণ', 'স্বামী বিবেকানন্দ' বানিয়ে ফেলছে, 'প্রকৃতি'টি ঠিকমতো আনতে অনেক রিহার্সাল দিতে হয়।... কাজেই হয়তো লক্ষ করছে, আমি কীভাবে শুই বসি, চলি।

তা এসব নাহয় বুঝলাম। কিন্তু আসল কারণটি তো অবোধ্য!... তাহলে কি ওই জোচ্চোর লোকটাকে বাড়ির মধ্যে এনে প্রতিষ্ঠা করে, তলে তলে মনিবের সবকিছু 'ফর্সা' করিয়ে ফেলে, পরে দোষ দেবে, তখন শুধু বিদ্যুৎ বাগলের পাঠানো গেস্ট চাকলাদারই ছিল।

তাহলে? আগে থেকে থানায় গিয়ে পুলিশে খবর জানিয়ে রাখব?... কিন্তু কে জানে এখানে থানা-টানা কোথায়?... তা ছাড়া তারা কি আর আমার মতো একটা অজানা অচেনার অভিযোগ ডায়েরি করবে? দায় পড়েছে। উলটে হয়তো আমাকেই জেরায় জেরায় জেরবার করে ছাড়বে।

'শরীর ঠিক নেই' বলে চলেই যাব?

তা তাতে তো ও-ব্যাটার সুবিধেই হবে। বলবে, চুরি-টুরি করে চোরাই মাল হাতিয়ে ভেগেছে! ওঃ! বিদ্যুৎ বাগল, তুমি আমায় কী বিপদেই ফেললে! রোসো গিয়ে তোমায় 'একহাত' নিচ্ছি।

কিন্তু... ফিরে যেতে পারব তো? রাতারাতি আমায় খুন করে লাশ হাপিস করে ফেলে, ওই ডুপ্লিকেটটাকেই একমেবাদ্বিতীয়ং বলে চালাবে না তো?... মা গো! সুধাহাসি তোমার তাহলে কী হবে? তোমার হাসিটি যে জন্মের শোধ ঘুচে যাবে।

মায়ের কথা মনে পড়তেই কান্না এসে গিয়েই হঠাৎ ভীষণ হাসি পেয়ে গেল প্রলয় চাকলাদারের। আরে দুর! ওই একটা মুখ্যু পটকা ছেলেকে নিয়ে আমার এত ভয় ভাবনা? ছিঃ! আর কিছু নয়, স্টেশনে আমায় আনতে গিয়ে আমার মতো আর কাউকে দেখে হয়তো ভুল করে তাকেই নিয়ে এসেছে। কেউ তো কাউকে চেনে না। তারপর আমায় দেখে কেয়ারটেকারবাবু চোখে অন্ধকার দেখছে। আচ্ছা—আমি একবার সেই 'জেরক্স কপিকে' দেখি! হয়তো দেখব তেমন কিছুই নয়, আমার সঙ্গে একটু সাদৃশ্য আছে।... বিদ্যুৎবাবু আমার ছবিখানা পাটিয়েই তাদের গোলমালে ফেলেছে। শুধু চেহারার বর্ণনা আর পরিচয় দিলেই হতো। অচেনা লোককে স্টেশন থেকে আনতে যেতে হয় না লোককে? নতুন চাকরিতে এসেছে, কিম্বা নতুন কুটুমবাড়ি এসেছে।... আরে আমাকেও যে কলকাতার বাইরে এখানে ওখানে সাহিত্য সভা-টভায় নিয়ে যায়। কর্মকর্তারা দেখা করে বলে যায়, নয়তো চিঠিপত্রের মধ্যে ব্যবস্থা হয়, কিন্তু স্টেশনে রিসিভ করতে তো দু-পাঁচটা ছেলেছোকরাই আসে। চিনে নেয় না?... রোসো এই থেকেই একটা প্লট আবিষ্কার করে ফেলা যাবে।

লেখা কাগজগুলো ফ্যাসফ্যাস করে ছিঁড়ে গোল্লা পাকিয়ে টেবিলের তলায় রাখা 'ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে' ফেলে দিয়ে, আবার লিখতে বসলেন প্রলয়।

পেন ঠুকতে ঠুকতে ভাবলেন, সেদিন স্টেশনে তুলে দিতে এসে বিদ্যুৎ বলেছিল,— গোয়েন্দা গল্পে স্যার এমন কিছু বাহাদুরি নেই। দেখছি তো আমার 'আকাশ পাতালের ' গোয়েন্দা সংখ্যা'গুলো। দুটো চারটে খুন থাকলেই হল।

প্রলয় চমকে উঠেছিলেন,—দুটো চারটে খুন?

বিদ্যুৎ বাগল হেসে উঠেছিল,—আরেব্বাস। আপনি এমন চমকে উঠলেন, যেন সত্যিই দুটো চারটে তাজা মানুষের গর্দানে কোপ দিতে বলা হচ্ছে। কাগজের মানুষকে আবার খুন করতে কী?... দুটো চারটে না হোক একটা খুন অন্তত থাকা দরকার। নাহলে জম্পেশ হয় না। প্রথমেই একটা খুন দিয়ে শুরু করলেও মন্দ হয় না। গল্প তরতরিয়ে এগিয়ে যায়।

এখন বিদ্যুৎ বাগলের সেই কথাটা মনে পড়ল। আচ্ছা বাগলের ফর্মুলাটাই ট্রাই করে দেখা যাক। লিখলেন?—

'গতকাল রাত্রেও আবহাওয়া ছিল সুন্দর। বাড়ির সকলেই খাওয়া-দাওয়া করেছে শুয়েছে। কে জানত তার মধ্যে একজন রাতারাতি শেষ হয়ে যাবে।'

লিখেই ভাবতে শুরু করলেন, 'কে' শেষ হবে? মানে কলমের খোঁচায় কাকে শেষ করবেন প্রলয় চাকলাদার? কাকে?... কর্তা গিন্নী ছেলে মেয়ে? রাঁধুনি চাকরানি? মালি? কেয়ারটেকার? কাকে খুন করলে গল্প চটপট এগোবে?... তা ছাড়া খুনটা কীভাবে? রক্তগঙ্গা বইয়ে, না গলায় ফাঁস দিয়ে? না কি—

ভাবতে ভাবতে যে সেই কথাগুলোও লিখে চলেছেন, তা খেয়াল করেননি। হঠাৎ দেখে, নিজের মনে একা ঘরেই প্রায় শব্দ করে হেসে উঠলেন।

কাগজটা কুচিকুচি করে ছিঁড়ে গুলি পাকাচ্ছেন, এমন সময় দরজায় শব্দ হল। টক টক টক!

—কে?...

বলেই মনে পড়ে গেল নান্টু না পান্টু কাকে যেন বলেছিলেন, বেলা একটার সময় দরজায় টোকা দিতে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন।... উঃ। খুব পাংচুয়াল তো!

হাতের গুলি ক-টা ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করে, লেখার সরঞ্জামে একটা বই চাপা দিয়ে রেখে ঘরের দরজা খুলে হাস্যবদনে বলে উঠলেন,—কী? লাঞ্চ রেডি?

নান্টু ভাবল, পাকা ঘুঘু! মুখ দেখে বোঝাবার উপায় নেই ভেতরে কোনো গলদ আছে। তবে নিজেও সে তেমনি পাকা ঘুঘুর ভূমিকায় একগাল হেসে

বলে উঠল,—হ্যাঁ সার। রামসেবকের হাত হচ্ছে মেশিন। আসুন। তো এই অবকাশে লম্বা একখানা ঘুম ঘুমিয়ে নিলেন বোধ হয়।?

—ঘুম? ঘুম মানে? এইটা কি ঘুমের সময়?

—না মানে, ঘরে একা একা দরজা বন্ধ করে আর কী করা যেতে পারে? ঘরের সিলিঙের সঙ্গে তো আর গল্প করবেন না।

প্রলয় ব্যঙ্গের গলায় বললেন,—একা একা আর কিছুই করা যায় না? বই কাগজ কালি কলম এসব জিনিসগুলো পৃথিবী থেকে উপে গেছে নাকি?

—ওঃ! তাই বলুন।

নান্টু খুব ইনোসেন্ট গলায় বলে,— লেখাপড়া করছিলেন? আমরা আর ওর কী মর্ম বুঝব বলুন?... বাড়িতে চিঠিপত্র লিখলেন বুঝি? আমায় দিয়ে দিতে পরেন। পোস্ট অফিসের দিকে একবার যাবার আছে।

—নাঃ। চিঠিপত্র কিছু নেই।

নান্টু আর ইনোসেন্ট,—আহা বাড়ির লোক পৌঁছনোর খবর না পেয়ে ভাবনা করবেন না?

ওর এই গায়েপড়া ভাবে রাগে হাড় জ্বলে গেল। তবু সহজভাবেই বললেন,— পৌঁছনোর খবর দেওয়া হয়ে গেছে। স্টেশনে নেমেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

—টেলিগ্রাম? ওঃ! খুব করিতকর্মা লোক দেখছি।

কথা বলতে বলতেই টেবিলের ধারে চলে যান প্রলয়। টেবিলে সাজানো থালা দেখে চোখ কপালে তোলেন,—কী সর্বনাশ! এই এত খেতে হবে? তুলুন তুলুন । সিকিভাগ রাখুন। আমায় কি বকরাক্ষস পেয়েছেন ভাই?... না তুললে বসাই যাবে না।

নান্টু অবশ্য এতে বিশেষ দুঃখিত হয় না। তার স্টকে একটি বকরাক্ষসতুল্য তো রয়েইছে।... তবু বিনয় করে বলে,—এ আর কী এমন বেশি? রামসেবকের রান্না ভালো।

—তাই বলে চারজনের খাদ্য একজনে খাওয়া যায় না। তা ছাড়া এ যে দেখছি বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন! এই দুপুরবেলা বিরিয়ানি, মুরগি, তার ওপর আবার মাছের এতসব, ভাজাভুজি চপ চাটনি। আবার দই মিষ্টি!... আমাকে তো দিন সাতেক পুষতে হবে হে!

নান্টুর ডাকে রামসেবক আলাদা বাসন এনে সব ভাগ করে সরাতে থাকে, এবং দুঃখের গলায় বলে,—বাবুর একদম চড়াই পাখির আহার।

—তাই নাকি? হা-হা। কিন্তু তাতে চেহারাখানি তো বাপু চড়াই পাখির মত

নয়।... না না, আজ যা হলো হলো। রোজ রোজ এতো সব?—মাথা খারাপ।

নান্টু সবিনয়ে বলে, —কী করব বলুন? কর্তাদের গেস্ট এলে, তা সে যেই আসুক, জামাই আদর করতে হবে। তার জন্যে আলাদা ফান্ড আছে। তা কেই বা এত আসে? এ তো তার পুরী কাশী কি কোনো চেঞ্জের জায়গা নয়? ফান্ডের টাকা তো পড়ে পড়ে পচে!

বলে আর হোমিও ভোজের মুখের দিকে তাকায়। লোভে চকচক করে উঠল কি? কিন্তু যার খাওয়ারই লোভ নেই, তার—

প্রলয় হা হা করে হেসে ওঠেন,—টাকা পড়ে পড়ে পচে? বাঃ। ভারী চমৎকার একটি নতুন কথা শোনালেন তো? তা আপনারাই নিজেদের 'গেস্ট' মনে করে তাকে পচে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারেন। নিজেদেরকেই জামাই আদর করে—হা..হা...হা।

নান্টু আর একবার ভাবে, ওঃ কী ধুরন্ধর! ভেতরে কী প্যাঁচ কষছে কে জানে, অথচ দিব্যি গলা খুলে হাসছে।

তবু লোকটার খাওয়ার পরিমাণ দেখে মন মেজাজ একটু ভালো হয়।

—স্যার। পান খান? এখানের জগমোহনের দোকানের পান খুব ভালো।

পান! আরে! ভদ্রলোকে এখনও ওসব খায় নাকি? না না।... তো হ্যাঁ, কই? আমার সেই ডুপ্লিকেটটি কই? যিনি নাকি আমার 'জেরক্স কপি'! তিনি খাবেন না?

— বলেছিলেন তো একটার মধ্যে ফিরবেন। কই দেখছি না তো। আপনার কেন মিছিমিছি দেরি হবে?

—তাতে কিছু এসে যেত না। আর একটু ওয়েট করলে পারতেন। তো সে থাক! এলে পরিচয় করিয়ে দেবেন।

নান্টু গম্ভীর গলায় বলে,—আলাদা আর পরিচয় কী? তিনিও পি. চাকলাদার। শুধু এইটুকুই জানি। যেমন আপনার? তো আপনার পুরো নামটা কী?

প্রলয় চাকলাদার হেসে বলেন,—না না পুরোটা শুনতে হবে না। হয়তো একটা প্রলয় ঘটে যাবে।

স্যারের কথাবার্তার মাথামুণ্ডু বোঝা দায়। নাম শুনলে প্রলয় ঘটে যাবে? যাক গে,— ওরে বুনো, এই সময় বাবু ঘরের বাইরে। ঘরটা সাফ করে নে।... খেয়ে উঠে রেস্ট নেবেন তো? নাকি বেরোবেন?

—বেরোব? এই দুপুর রোদে? মাথা খারাপ নাকি? তবে দুপুরে ঘুমের নেশা নেই। তো ঘরে তো কিছু বই-টইও দেখছি।

ইতিমধ্যে বুনো ঝাড়ু হাতে ঘরে ঢুকে যায়।

ছয়

ঘুমের নেশা না থাকলেও, প্রলয় খাওয়ার পরে আবার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলেন। প্লট একটা যেন মাথার মধ্যে এসে গেছে। সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ ঘরের মধ্যে চামচিকে ঢুকে পড়লে যেমন ঘরের মধ্যে পাক খেতে থাকে, প্লটটাও তেমনি পাক খাচ্ছে। কাজেই খেয়ে উঠেই কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়লেন।

কিন্তু কবিরাজি ভোজ? তিনি টহল মেরে ফিরলেন কখন?... সে আর বলে কাজ নেই! বেচারি নান্টু আর রামসেবকের পেটের মধ্যে যখন ইঞ্জিনগাড়ি চলতে শুরু করেছে তখন। বেলা তিনটের কাছে। বুনোটাকে তবু খাইয়ে নিয়েছে তার কাকা!

ভালো ভালো রান্না সবঠান্ডা হয়ে গেল।

তারওপর আবার তিনি এসেই বললেন,— দাঁড়ান চট্ করে চানটা সেরে আসি।

তার মানে আরো এক ঘণ্টা!

কিন্তু 'কবিরাজি' 'হোমিও'র খবর জানে না। তাঁকে তো বলা হয়নি, ঠিক তোমার জেরক্স কপি আর একজন এসেছে!... এখন কী করে হোমিওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে?

রামসেবক বললো,—এখন থাক। ওবেলা বাহাদুর দাদাবাবু আসুক! তখন ধরা যাবে কোনজন আসল, কোনজন নকল।

তবে এনার খাওয়ার বহর দেখে নান্টু আর রামসেবকের বাসনা হচ্ছে এই লোকই নকল হোক। তাহলে কোনো ছুতো কবে ভাগানো যাবে।

কিন্তু নান্টুদের কপাল মন্দ! ইত্যবসরে বুনো একটি মোক্ষম প্রমাণপত্র আবিষ্কার করে ফেলেছে। দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে নান্টুর।

যেমন গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল 'পায়জামা পাঞ্জাবি'র খাওয়ার বহর দেখে রামসেবকের।

করছে কী লোকটা? তিন চারজনের খাবার একা সাবড়ে দিচ্ছে? একটু খানিও বিরিয়ানি রইল না গো। রামসেবক আর নান্টুদাদাবাবুকে স্রেফ ভাতই খেতে হবে।

নান্টুও দেখচে নির্নিমেষে। এই একটু আগে ঠিক এই লোকটাই যেন খেতে বসেছিল না? ধুতির কোঁচাটা টেবিলের আড়ালে পড়ে যায়, আড়ালে পড়ে

পায়জামাও। ওপর দিকটা একদম এক। চিকনের কাজ করা সাদা আন্দির পাঞ্জাবি।... সাফসুৎরো দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ। কিন্তু মুখের গহ্বরটি?

শপাশপ চালান দিচ্ছে, আর দিব্যি কোথায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তিনি সাজানে থালা দেখে শিউরে উঠেছিলেন, আর ইনি আহ্লাদে উৎফুল্ল!

—বাঃ। গ্র্যান্ড মেনু! রান্না-ও দি গ্র্যান্ড। আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?

নান্টু বলে,— সে কী? অতিথিকে রেখে?

— ইস। তাই তো বড়ো দেরি হয়ে গেল। তো এক কাজ করুন, আপনারাও বসে পড়ুন না।

—না না। আপনার হোক।

'কবিরাজি ভোজ' অম্লানবদনে বলে ওঠে,—তবেই তো মুশকিল। আমার আবার খিদের সময় ভালো খাবার পেলে হিসেব থাকে না। আপনাদের ভাগটা বরং সরিয়ে রেখে বাকি যা থাকবে আমার টেবিলে দিয়ে যান। খিদে তো পেয়েছে দারুণ। আর রান্নাও দারুণ! ওঃ, চপটা ভালো রেস্টুরেন্টকেও হার মানায়। ওহে— এই কী যেন নাম তোমার? আর খান চারেক চপ ছাড়ো তো!

সবই বার বার রিপিট করে চলেছে রামসেবক।

আর তারপর? নান্টুকে যাহোক একটু গুছিয়ে দিয়ে—নিজে স্রেফ হাঁড়িকড়ার তলানি সামান্য কিছু নিয়ে, আর ভাত নিয়ে বসে চোখে আগুন জ্বেলে চাপা গলায় বলে,—দাদাবাবু এ-লোকই ডাকু হচ্ছে। এক নম্বরের ডাকু। ডাকু ছাড়া কেউ এমোন ভাবে—কিচেনের সব মাল সাফ করে ফেলে? একেই ভাগাও!

কিন্তু তা বললে তো চলবে না। হোমিও ভোজ যে আরও সর্বনেশে আসামি! অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে।

অত খেয়েও কবিরাজি বলল,— আচ্ছা, আমি একটু বেরোচ্ছি! ফিরতে রাত হলে ভাববেন না। আপনারা খেয়ে নেবেন। হ্যাঁ, রাতে আমি রুটিই খাই, তবে ভালো ডালপুরি কি কচুরি কিম্বা মোগলাই পরোটা হলেও আপত্তি নেই। আপনাদের যখন শুনলাম গেস্ট-এর জন্যে আলাদা ফান্ড আছে।... ভারী ফাইন ব্যবস্থা! আমার এক বন্ধু বলেছিল বটে, এখানে কাদের যেন একটা বাড়ি আছে, তারা থাকতে দেয়, খাবার জন্যে কিছু চার্জ করে না। সে যে এত মার্ভেলাস।... তাহলে রামসেবক ভাই, ওই কথাই রইল?

রামসেবক দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল,—খাওয়াচ্ছি তোমায় মোগলাই পরোটা। সিরেফ পোড়ারুটি আর ডাল—ব্যস।

কিন্তু সেটা কাকে?

সাত

বাহাদুর কোনো সুসংবাদ আনতে পারেনি। বলল,—মামা রেগে বলেছে, একজন পরিচিত বিশিষ্ট ভদ্রলোককে পাঠিয়েছি, তার বাড়িতে সে কী খায়, কত খায়, তা জানা আছে আমার? কেন সেবারে তো আমরা নিজেরা গিয়ে থেকে দেখেছি—ওখানে রোজ নেমন্তন্ন। আর খাওয়াবার জন্যেই ঝুলোঝুলি। তোর ওই কেয়ারটেকার বন্ধুটা বুঝি খুব কিপ্‌টে?... আর বলেছে তার নাম-ধাম পেশায় এত তোদের দরকারটা কী? ক-টা দিন থাকবে, খাবে ঘুমোবে নিজের কাজ করবে, এই তো! আমার পাঠানো লোক তা মনে রাখতে বলিস তোর বন্ধুকে!

নান্টু হতাশভাবে বলে,— তার মানে ওই কবিরাজি ভোজ-ই তোর মামার লোক। যাকে আমি নিজে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছি। এদিকে আর একটা ভয়ংকর লোক—বাহাদুর চল, তোর কাকার কাছে গিয়ে পরামর্শ করা যাক, কী করা যায়। বাড়ির মধ্যে খোলা খাঁচায় একটা বাঘ ভরে রেখে উঃ।

সত্যহরি নান্টুর আনীত অকাট্য প্রমাণ সমূহ দেখে শিউরে উঠে বললেন, —আমার তো মনে হচ্ছে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। অন্তত থানায় নিয়ে রাখা। তবে ওকে চট করে কিছু জানিয়ে, বা বুঝতে দিয়ে কাজ নেই। শুধু ওয়াচ্‌ করে যাও, কী কী করছে। নতুন মুভমেন্ট কী? এই সাংঘাতিক লোকটিকে নিশ্চয় তোর মামা 'রেসপেক্‌টেব্‌ল' ভদ্রলোক বলে পাঠাননি। ইনিই নকল। তবে মেকআপ-এর বাহাদুরি আছে। মানে তোরা যা বলছিস... উঃ। আমার যে একবারও স্টেশন ছেড়ে যাবার উপায় নেই। নাহলে গিয়ে ঠিক ধরে ফেলতে পারতাম, কে আসল কে জানল। দুজনকে একবার পাশাপাশি দাঁড় করালেই ধরা পড়ে যাবে। তবে এখন ঘাঁটাসনি। খবরদার।

কিন্তু কে কাকে পাশাপাশি দাঁড় করাবে? চোরে কামারে দেখা আছে?

এই তো রাত্রে খেতে বসেও হোমিও বলে উঠলেন,—কইহে নান্টুবাবু, আপনার সেই আর এক গেস্টকে এখন তো দেখছি না? আমার ডুপ্লিকেটটি?... আসলে সত্যিই কেউ তেমন আছেন নাকি? না আপনার কল্পিত কল্পনা?

নান্টু মনে মনে বলে, উঃ কী বুকের পাটা! হবেই তো। যারা মানুষ জাল করতে সাহস করে তাদের বুকের পাটা থাকবে না?

সত্যহরি একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। বলেছেন, এখন ওকে না ঘাঁটাতে। কাজেই নান্টু নিজেকে খুব সামলায়। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়,—কে কার জেরক্স কপি ভগবান জানেন।

বিড়বিড় করেই বলে, তবু কানে যায়। প্রলয় ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেন,—বটে

নাকি? আমাকেই কপি বলে সন্দেহ হচ্ছে? দারণ তো!... তবে আপনাদের অতিথি আপ্যায়ন ব্রাদার আরও দারুণ। ওঃ। দুপুরে ওই বিরাট খাওয়ার পর আবার রাত্রে মোগলাই পরোটা! কিমার তরকারি। সর্বনাশ।... আরে বাবা আপনার ওই বুনো-টুনোর জন্যে হাত রুটি হয়নি? তাই থেকে দু-খানা দিন মশাই! এই রেটে খেতে হলে, আমায় আর কাজ শেষ করে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে না।

'কাজ শেষ করে।'—নান্টুর বুকটা হিম হয়ে যায়। কী 'কাজ' শেষ করে!

ভয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকাতে পারে না।

এরাই হচ্ছে সেই জাতের অপরাধী, যারা হাসতে হাসতে লোকের বুকে ছুরি বসাতে পারে।

কিন্তু রামসেবকের মতে?

হাসতে হাসতে বুকে ছুরি মারতে পারে 'পায়জামা পাঞ্জাবি'-ও।... রাত সাড়ে দশটায় ফিরে, 'দারুণ খিদে পেয়ে গেছে' বলে খাবার টেবিলে এসে বসে খাবারের ঘ্রাণেই আহ্লাদে মুর্ছাহত। তারপর সব ক-খানা মোগলাই শেষ করে পরিতৃপ্তির স্বরে বলে কিনা,— দেখো রামসেবক, কাল আমায় খুব ভোরে বেরোতে হবে। একদম আর্লি মর্নিং। তো এখানে তো সে-সময় প্রায় অন্ধকারই থাকে। তখন আর তুমি কষ্ট করে ব্রেকফাস্ট বানাতে বোসো না। যদি তোমার এই পরোটা দু-একখানা থাকে তো কাগজে মুড়ে সঙ্গে দিও। শুধু চা-টা বানিয়ে দিও।

রামসেবক বুকে সেই ছুরির ঘা খেয়েও সামলে নিয়ে বলে,— এত মর্নিঙে কোন কাজ?

— আছে বাবা, আছে।... আচ্ছা ওই কথাই রইল।

আট

রাতে দুই অতিথিই যখন ঘুমন্ত, অথবা নিদ্রাসিক্ত ঘরে জাগন্তই, রান্নাঘরের দিকে রামসেবক হিংস্র আক্রোশে চুপিচুপি বলে,—দাদাবাবু। আমার বিশওয়াস দু-আদমিই এক দলের।... আমাদের চোখে ধুলা দিতে এক রকম মাফিক সাজ বানিয়েছে। এই লোক কখুনো ভালো হবে না। মর্নিং থেকে নাইট পর্যন্ত কী কাজ ওর?... শুধু মাঝে মাঝে এসে ডাকুর মতো খাবে আর বাহার যাবে।

কথাটা যেন নান্টুরও মনে লাগে। একজন হয়তো সারাদিন 'গ্যাং'-এর সঙ্গে

ঘুরছে ভয়ানক কিছুর তালে আর খবর জোগাচ্ছে। অপরজন ঘরে বসে ছুরি শানাচ্ছে! আর সেইজন্যেই কৌশল করে চোরে কামারে দেখা নেই!

কিন্তু তাহলে? বাহাদুরের মামা? যাঁর নাম নাকি বিদ্যুৎ বাগল। তাঁর ভূমিকাটি কী? তিনিও কি একটা ষড়যন্ত্রী?

পরদিনই সত্যহরির কাছে গিয়ে বাহাদুরকে চেপে ধরে জানতে হবে, তার মামা লোক কেমন? কীরকম লোকের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব?

নয়

কিন্তু পরদিন কি আর বাহাদুরের কাছে যেতে হল? বাড়ি বসেই তো জানা হয়ে গেল তার মামা লোক কেমন।

'হোমিও' যখন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরের মধ্যে ঢুকে যথারীতি দরজা বন্ধ করেছেন, এবং 'কবিরাজি' নিজস্ব ভঙ্গিতে আচ্ছা করে সেঁটেই বেরিয়ে পড়েছেন, তখন হঠাৎ টেলিগ্রাম পিওন...।

পরিচিত ক্রিং-ক্রিং শব্দ!

পরিচিত কণ্ঠস্বর 'টেলিগিরাপ!'

নান্টুর মনটা আহ্লাদে দুলে ওঠে। নিশ্চয় বাবুদের কারও টেলিগ্রাম! ওনাদের কেউ যদি কখনও হঠাৎ দরকারে পড়ে আসেন, অথবা কোনো দামি বন্ধু-টন্ধুকে নিয়ে বেড়াতে আসেন। টেলিগ্রাম করে নান্টুকে জানিয়ে দেন।

নান্টু ছুটে আসে সই করে নিতে!

কিন্তু একী? এ কার টেলিগ্রাম?

প্রাপক 'নান্টু সরকার' নয়। 'প্রাপক' হচ্ছে 'পি. চালকলাদার।' আর প্রেরক? প্রেরক হচ্ছে বিদ্যুৎ বাগল!

ঘরে এসে হতাশ হয়ে বসে পড়ে নান্টু! তারপর টেলিগ্রাম খানা খুলে পড়ে। কী লিখেছে? কোন 'পি. চাকলাদারকে?'

একবার, দু-বার, তিন-বার, বারবার পড়ে চলে নান্টু—

'হোপ, ওয়ার্ক ইজ ইন প্রোগ্রেস?

হোয়েন একজ্যাক্টলি কুড ইট বি ফিনিশড?

বিদ্যুৎ বাগল!

—দাদাবাবু! 'তার'-এ কী লিখা আছে? কোন চৌধুরীবাবুর তার?

নান্টু তার উত্তরে বলে,— রামসেবক আমায় একগ্লাস জল দে।

তারপর আস্তে বলে, — তুই ঠিক বলেছিস রামসেবক। দুটোই ডাকু! আর এই 'তার' ডাকুদের সর্দারের।

দশ

বিদ্যুৎ বাগল বাহাদুরের মামা। আর সত্যহরি সরখেল হচ্ছেন বাহাদুরের কাকা। দুজনের মধ্যে প্রিয় বান্ধবের ভাব থাকার কথা নয়। সাধারণত থাকে না। স্পেশাল কেস? আলাদা কথা।

সত্যহরি তাই এখন জলদগম্ভীর স্বরে বলছেন,— বাহাদুর। এখন বুঝতে পারছ তোমার মামাটি কী চিজ? কিনতু এরপর তো আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না? বেচারা নান্টু। তোমারই প্রাণের বন্ধু! 'ফিনিশ' হয়ে গেলে তোমার অবস্থা কী হবে বুঝতে পারছো? যাও, এখনই থানায় চলে যাও। ... উঃ কী করবো? আমার যে না মরা পর্যন্ত স্টেশন ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই! এখনকার 'ওসি' তো আমার বিশেষ বন্ধু, আমি একবার গিয়ে বলতে পারলেই, এক্ষুনি পাঁচটা পুলিশ নিয়ে গিয়ে ওই একজোড়া পি. চাকলাদারকে ক্যাঁক ক্যাঁক করে ধরে আনত। আর সেই নাটের গুরুটিকে ধরবার জন্যে ক্যালকাটা পুলিশকে জানান দিত।... যাক, তোমরাই যাও। আমার এই চিঠিটা নিয়ে যাও, আর সমস্ত ব্যাপারটা বিস্তারিত বলোগে।... খবরদার, ওই বদমাশরা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে তোমরা ওদের সন্দেহ করছ।

ওরা চলে যায় থানায়।

নাঃ। ওরা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে না।

পরদিন যথারীতিই মাটন কারি, চিকেন রোস্ট, চিংড়ির ঝাল, গোবিন্দভোগ চালের ভাত।

ধুতি পাঞ্জাবিকে ধরবার কোনো অসুবিধে নেই। সারাদিনই তো বাড়িতে। বুনো মাঝে মাঝেই গাছে চড়ে ওয়াচ করে দেখেছে, সবসময় ঘাড় গুজে কী যেন লেখে লোকটা।

আর পায়জামা পাঞ্জাবি?

তাকে তো লাঞ্চের সময় পাওয়া যাবেই। বেলা একটা থেকে তিনটের মধ্যে যখনই হোক।

তো আজ দুটোর সময়ই পাওয়া গেল!

সবেমাত্র একপ্রস্থ সেরে ভাতে আর এক প্রস্থ চিংড়ির ঝাল মাখছেন, তখন গোটা চারেক ল্যাংবোট নিয়ে এক পুলিশ অফিসারের আবির্ভাব।

—কই কোথায় সেই স্বনামধন্য পি চাকলাদার? এই যে ইনিই বোধ হয়?

পায়জামা পাঞ্জাবি মুখ তুলে বলেন, —কী? আরেস্ট করতে এসেছেন? আমাকে... হঠাৎ আমি এমন কী ইম্পর্ট্যান্ট লোক হলাম মশাই?... চার্জ আছে?... ঠিক আছে ঠিক আছে, বসুন একটু। তাড়াহুড়োর কী আছে? আমি তো আর পাগল নই যে এই গলদা চিংড়ি দুটো ফেলে চম্পট দেব?... আঃ কী মুশকিল! ছটফট করছেন যে?... আচ্ছা বেরসিক লোক তো মশাই আপনারা? এমন রান্না একটু র‍্যালিশ করে খেতে দিচ্ছেন না!... তা অ্যারেস্ট করব বলে আবদার করলেই তো হবে না? ওয়ারেন্টটা দেখি?

পুলিশ দুটো দু-দিক থেকে দু-পাঁজরে রুলের গুঁতো মেরে বলে, — চোপ!

আর ধুতি পাঞ্জাবি?

তিনিও অসময়ে দরজায় টোকা পড়ায় বেশ বেজার হয়ে, গেঞ্জির ওপরই হাতের কাছ থেকে শালখানা তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে 'কী ব্যাপার?' বলে হকচকিয়ে বলে,—পুলিশ কেন?

নান্টু সরকার এখন বল পেয়ে বীরবিক্রমে বলে ওঠে,— পুলিশ কেন? আহা, আমার ভাজা মাছখানি উলটে খেতে জানেন না? চলুন থানায় গিয়ে জানবেন পুলিশ কেন?

প্রলয় চাকলাদার তিক্ত গলায় বলেন,— বুঝেছি। গোড়া থেকেই আন্দাজ করেছি কোনোরকম একটা মতলব ভাঁজতেই আপনি— ঠিক আছে। করুক পুলিশ আমায় অ্যারেস্ট। দেখি কতটা কী করতে পারে!...ওঃ। অজানা অতিথিকে জামাই আদরের মর্ম বুঝছি এখন। বিরাট একটা জালিয়াতির জাল পাতা আছে। চলুন।

খাবার দালানে এসেই দাঁড়িয়ে পড়েন, প্রলয়। আর একজন ঠিক তাঁর মতোই সরুপাড় সাদা একখানা শাল গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে।

তার মানে 'চোরে কামারে' দেখা হল।

প্রলয় বলে উঠলেন,—বাঃ, বাঃ। মার্ভেলাস! আপনাদের মেকআপ ম্যানের বাহাদুরি আছে। এনাকে দেখে মনে হচ্ছে বড়ো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছি। ঠিকই বলেছিলেন নান্টুবাবু। 'জেরক্স কপি'।

কিন্তু কবিরাজি ভোজের তো জানা ছিল না, আরও একখানি পি. চাকলাদার এখানে বসবাস করছেন! সে হতভম্ব হয়ে বলে, —এ আবার কী? চমৎকার তো? এই বস্তুটি কোন গোকুলে বাড়ছিলেন?... উনিও কি ক্লেম করেছেন তিনিও পি. চাকলাদার?

কনস্টেবল দুটো এঁকেও দু-ধার থেকে রুলের গুঁতো মেরে বলে,—. চোপ!

এগারো

সত্যহরি সরখেলের বন্ধু এই থানার ও.সি ব্রিজমোহন পাঁড়ে পরিষ্কার কলকাত্তাই বাংলায় বলে ওঠেন,— বাহারে, বেড়ে। একদম মানিকজোড়। তো কে আসল কে জানে, বলে ফেলুন তো জাদু।

প্রলয় বলে ওঠেন,— তা সেটা আপনারাই নির্ণয় করুন না? আপনাদের তো জাল জালিয়াতি দেখে দেখে অভিজ্ঞ চোখ!

—আরে সাবাস! এনার যে দেখছি কথায় খই ফুটছে। তা একটা মোটা পরীক্ষা হয়ে যাক!

বলেই একটা কনস্টেবলকে কী যেন ইশারা করেন।

সে একটা কাচের শিশি আর খানিকটা তুলো নিয়ে আসে।

ব্রিজমোহন বলেন,— নে, ওই তুলোটা স্পিরিটে ভিজিয়ে, দুজনারই গালে ঘষে দ্যাখ ওই লাল দাগটা কার পাকা, কার কাঁচা। নাকি দুজনারই কাঁচা। হা...হা...হা।

আঃ কী মুশকিল!

দুজনেই তীব্র আপত্তি জানায়, —হচ্ছেটা কী? ছাল ছাড়িয়ে নেবে নাকি?... ভগবানের তুলির দাগ তোমাদের ওই স্পিরিটের তুলোয় মুছে উঠে আসবে?

থানায় বেশ কয়েকজনের ভিড় এখন। তা ছাড়া নান্টু রামসেবক তো আছেই। আছে বাহাদুরও। তবে সে বেচারির মুখ ম্লান। তার মামাকেই বলা হচ্ছে নাটের গুরু!

হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে সত্যহরির আবির্ভাব।

—স্থির থাকতে পারলাম না! চারটের গাড়িখানা পাস করিয়েই চলে এলাম একবার। তো কার তুলোয় রং উঠে এল?... অ্যাঁ?কারুরই নয়? তাজ্জব তো! সাবান দিয়ে ঘষে দেখা হয়েছে?

'পায়জামা পাঞ্জাবি' প্রায় খেঁকিয়ে উঠে বলে,—আপনি আবার হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন মশাই? সাজ দেখে তো মনে হচ্ছে রেলবাবু! স্টেশনমাস্টার বোধ হয়। তো হঠাৎ ডিউটি ছেড়ে থানায় যে? তামাশা দেখতে?... তা মশাই আপনার বাড়িটাতে সারাজীবনে নিশ্চয় কম সাবান ঘষেননি। তো ভগবানের তুলির 'জেট্ ব্ল্যাকটি' কি ঘষে তুলতে পেরেছেন?

সঙ্গে সঙ্গে পাঁজরে রুলের খোঁচা,—চোপ!

ও. সি. গম্ভীর অথচ ব্যঙ্গের ভাবে বলে,— যাক, তাহলে এটাই বিশ্বাস করতে হচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালে হঠাৎ দুটো মানুষ ঠিক একইরকম দেখতে হয়েছে, এবং

তাদের জন্মদাগ জড়ুল পর্যন্ত একই রকম। শুধু দেখা যাচ্ছে একজনের ডান দিকে, আর অন্যজনের বাঁ দিকে। বলার কিছু নেই। জাল জালিয়াতি পৃথিবীতে চিরদিনই ছিল, এখনও আছে, এখন সায়েন্সের উন্নতিতে ক্রমশ আরও বাড়ছে।... জাল 'সই', জাল 'পারমিট', চাল 'চাকুরির নিয়োগপত্র', ছেলেদের পরীক্ষায় 'জাল মার্কশিট',— মানুষকে মানুষ জাল? তাও নতুন নয়।... তবে জালের কারবার চিরদিন চালানো যায় না প্রভু, একসময় না একসময় এই অভাগা আমাদের জালে পড়তেই হয়। তো যাক, একে একেই জেরা হোক।... এই যে মশাই, আপনার পুরো নামটি দয়াকরে বলবেন? আপনার গুণপনার কিছু প্রমাণপত্র যখন হাতে এসেছে, আপনাকেই আগে ধরি।

প্রলয় চাকলাদার বুঝলেন, এ সময় না বলাটা মুখ্যমি হবে। ওরা জানবেই। তাই শালটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলেন,— পুরো নাম, প্রলয় চাকলাদার।

—প্রলয় চাকলাদার! প্রলয় চাকলাদারঃ নামটা যেন কেমন শোনা শোনা লাগছে। আমাদের খাতায় নাম আছে বোধ হয়! ক্যালকাটায় ছিলাম তো অনেকদিন।

তো, এখানে আসা হয়েছে লীলাখেলা করতে! আসল ঠিকানাটি কী?

প্রলয় একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেন,—আসল ঠিকানা? তার হদিস কি আজ পর্যন্ত কেউ পেয়েছে? তবে আপনার আমার দুনিয়ার সব মানুষের হয়তো আসল ঠিকানা একই। যেখান থেকে আসা হয়েছে এবং যেখানে ফের ফিরে যেতে হবে।

—ওঃ। আবার তত্ত্বকথা আওড়ানো হচ্ছে! সোজা কথায় জবাব দিন, বাড়ি কোথায়? ঠিকানা কী? আদিবাড়ি কোথায় ছিল?

প্রলয় ফর্ম ফিলআপ-এর ভঙ্গিতে বলেন,—বাড়ি কলকাতায়। ঠিকানা, বাইশের বি, ঠাকুর লেন। আদিবাড়ি শুনেছি ঢাকা জেলায় কোথাও ছিল, কখনও যাইনি দেখিনি! আর?

—আর? আরও অনেক আছে মহাশয়। বলি বাড়িতে কে কে আছে?

—এখন মা আছেন, আর একজন বিশ্বস্ত সার্ভেন্ট আছে, এখানে আসার আগে আমিও থাকতাম।

—ব্যস! আর কিছু নাঃ? স্ত্রী পুত্র কন্যা?

—নেই।

— নেই? আহা চুকচুক, সবাই মারা গেছে না কি?

—ছিলই না। মারা গিয়ে জামেলা বাড়াতে পারে তাই ওসবের পাটই করিনি।

—অ। ব্যাচিলার! তবে আবার এত ইয়ে কীসের? তো যাক। পেশা কী?

—পেশা? পেশা এবং নেশা যা বলেন, একটু লেখালিখি।

—লেখালিখি?

পাঁড়ে একটু খাড়া হয়ে বসেন,— কী লেখা হয়?

—যা প্রাণ চায়।

—বাঃ বাঃ। মশাই তো বেশ সত্যবাদী। একদম যুধিষ্ঠির। যা প্রাণ চায়। তো দেখুন তো এই হাতের লেখাটি আপনার কিনা।

প্রলয় তাকিয়ে দেখে অবাক হন। একটু অস্বস্তিও পান। দেখেন এ সেই ছিঁড়ে গুল্লি পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেওয়া কাগজের টুকরো। ঘষে ঘষে কোঁচকানো দাগ একটু কমানো হয়েছে তবে কিছু কিছু জায়গা বিক্ষত।

প্রলয় দৃকপাত করেই বলেন,—হ্যাঁ, আমার লেখা।

বলছেন?

—বলব না কেন? নিজের হাতের লেখা চিনি না?

—তাহলে স্বর্ণকার যাচ্ছেন এ লেখা আপনার?

—হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

—বাঃ বাঃ। সাধে বলছি যুধিষ্ঠির।... তো তাহলে পড়ুন না একবার জোরে জোরে। সমবেতরা শুনুন।

—পড়ে কী হবে? ও তো বাতিল লেখা। ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া।

— আহা তবু নাহয় একটু শোনাতেন সবাইকে? বেশ আমিই শোনাচ্ছি। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন তো? এই যে, শুনুন সকলেই। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। তা হোক—

'গতকাল রাত্রেও...বাড়ির সবাই... শুয়েছে কে জানত তার মধ্যে রাতারাতি...কিন্তু খুনটা কীভাবে করা যাবে?... রক্তগঙ্গা বইয়ে? না গলায় ফাঁস লাগিয়ে?... হ্যাঁ... খুন! খুনই একমাত্র উপায়। শুধু একটা কেন, দুটো চারটেও হতে পারে।... তাহলেই হ্যাঁ কাজটি তাহলেই গাড়ির চাকার মতো গড়গড়িয়ে এগিয়ে যাবে।... কিন্তু কখন? মানে খুনটা কোন মোমেন্টে?... এবং আগে কাকে?... কেয়ারটেকার?... মালি?... নাকি...'

চোখ কুচকে কুঁচকে কোঁচকানো কাগজের টুকরো ক-টা পড়তে পড়তে ব্রিজমোহন বিজয়গর্বে বলে উঠল,—আরও শুনতে চান?... আরও আছে।

আরও থাকলে কী হবে? ততক্ষণে তো জনতার মধ্যে প্রবল উত্তেজনা।

—মার মার। লোকটাকে রাম ধোলাই দে। ওঃ ভদ্দরলোক সেজে একখানা ভালো বাড়িতে সেঁধিয়ে—

কনস্টেবলরা বলে উঠল,— চোপ!

ও. সি. মধুরহাস্যে বললেন,—শুনলেন তো? এনার লেখালিখির নমুনা?... তো মশাই এই টেলিগ্রামখানি দেখুন তো একবার। কোন পি. চাকলাদার এর মালিক? আপনার নামটা তো জানা গেছে, উনি এখনও শুধুই 'পি।' তো দেখুন তো এটা আপনার কিনা?

পায়জামা পাঞ্জাবি অবজ্ঞাভরে বলে,—আমায় আবার টেলিগ্রাম করবে কে? আমি যে এখানে আছি কেউ জানেই না।... প্রেরকটি কে?... কী? বিদ্যুৎ বাগল? জন্মে এমন নাম শুনিনি মশাই। বিদ্যুৎ—বিজলী?—নাঃ। আর বাগল আগল পাগল ছাগল এমন কাউকেই আমি চিনি না! নিজের 'চাকলাদার' নিয়েই হিমশিম। এ আবার বাগল।

প্রলয় চাকলাদার ততক্ষণে চঞ্চল হয়ে বলেন,— এ-টেলিগ্রাম আবার কখন এলো?

—এসেছিল! এসেছিল! ঠিক সময়েই এসেছিল। শুধু প্যাঁচে পড়ে গিয়েই তাহলে বিদ্যুৎ বাগলকে আপনি চেনেন?

—অফকোর্স। তিনিই তো আমায় এই 'মনোরঞ্জন ভবনে' থাকার ব্যবস্থা করেন। তবে খুব বন্ধুর কাজ করেননি। বাড়িটা যে এরকম ভুতুড়ে, আর লোকজন যে এমন কিম্ভূত, কে জানত? জানলে আমি?

—জানলে আসতেন না? হাঃ হাঃ হাঃ। লোকজনগুলো যখন আপনার মতলব ধরে ফেলেছে, তখন কিম্ভূত তো হবেই। তো এই টেলিগ্রামটির সরল বাংলা কী মশাই? বলুন তো একবার সবাই শুনুক।

প্রলয় একবার তাকিয়ে অবজ্ঞাভরে বলেন,—এর আবার সরল অসরল কী?... আশা করি কাজ এগোচ্ছে! ঠিক কবে শেষ হবে?—এই তো।

হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো।—ও. সি. মহোল্লাসে বলেন ঃ তো আপনি লোকটি সাচ্চা আছেন বটে! এবার বলুন তো কাজ'টি কী?

প্রলয় উত্যক্তভাবে বলেন,— এইজন্যেই বলে, পুলিশি জেরা! 'কাজ' একটা লেখা। একটা জরুরি গল্প লিখে দেবার বায়না দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। তারই তাগাদা!

—ও হোঃ হোঃ। আপনি তাহলে একজন লে-খ-ক? হাঃ হাঃ হাঃ! তবে আপনি বাঙালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছেন মিস্টার চাকলাদার! একটা লেখবার জন্যে নাম পরিচয় লুকিয়ে অজ্ঞাতবাসে আসা কেন? কলকাতা কী দোষ করল?

—কলকাতায় অনেক ডিসটার্বেন্স। লেখা এগোয় না।

—কেন? কেন? বাড়িতে তো বললেন শুধু আপনার মা আর একটা সার্ভেন্ট! ডিসটার্বটা কীসের?

প্রলয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিছুতেই উত্তেজিত হবেন না। জানেন, উত্তেজিত হলেই এরা মজা পেয়ে যায়। ফলে ইচ্ছে করে আরও জ্বালাতন করবে। তাই শান্তভাবে বলে,— যেন আপনাকে বোঝানো শক্ত। কোনো কারণে কেউ একবার একটু পপুলার হয়ে গেলে, তার সর্বদাই অসুবিধে! 'ফ্যান'রাই তার কাজের বারোটা বাজিয়ে দেয়।

ব্রিজমোহন, হঠাৎ এখন একটু থমকান। বলেন,—আপনি তা হলে একজন পপুলার ব্যক্তি? তো ওই গপ্‌পো-টপ্‌পো লিখেই না কী?

হঠাৎ সত্যহরি তাঁর পেতলের বোতাম লাগানো কালো কোটের দুটো হাতাই তুলে বলে ওঠেন,— আপনি কি তাহলে স্যার বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রলয় চাকলাদার?

—বিখ্যাত কি অখ্যাত তা জানি না মশাই, তবে ওই লিখে-টিখেই, দুটো করে খাই। তবে আপনাদের পাল্লায় পড়ে তো দেখছি কুখ্যাত 'খুনি' হয়ে পড়েছি।... বিদ্যুৎ বাগল মশাই হচ্ছেন, 'আকাশ পাতাল' নামের একখানা কিশোর ম্যাগাজিনের এডিটর! তার নাকি একটা বিশেষ সংখ্যা বেরোবে, জম্পেশ একখানা গোয়েন্দা উপন্যাস চাই। দিতেই হবে। অথচ এ-অভাগ্য সাত-জন্মেও কখনও গোয়েন্দা গল্প লেখেনি।

তবু উনি নাছোড়।

সাত দিনের মধ্যেই চাই। এটি নাকি ওনার একটি প্রেস্টিজেরও ব্যাপার তা আমি যাতে নিরিবিলিতে লিখতে পারি, কেউ না ডিসটার্ব করে তার অনুকূল ব্যবস্থা করে দেবেন। তা সত্যি বলবো কি, দিয়েও ছিলেন। একেবারে রাজকীয় ব্যবস্থাই। কিন্তু কে জানতো— এমন রাজাই বাড়িটাকে দুটো বদ্ধ পাগলের হাতে— কিন্তু সত্যহরি যে তখনও দু-হাত তুলে বলে চলেছেন,—মাই গড্! সেই 'জীবন নদীর স্রোতে', 'মধ্য রাতের প্রহরী', অন্ধকারের প্রাণীরা' ইত্যাদি উপন্যাসের লেখক? আমাদের রেল কোম্পানির লাইব্রেরিতে দু-খানা করে রেখেও সাপ্লাই দিতে পেরে ওঠে না। কি একখানা বই সিনেমাও হয়েছিল না? দারুণ নাকি হিট হয়েছিল।... ও পাড়ে। এ তুমি কী করে বসলে? এইরকম একখানা মানুষকে—

পাঁড়ে দু-হাত কচলে বলে,—কী করে জানব বল ব্রাদার? ওই কেয়ারটেকার ছোকরা প্রাণভয়ে ছুটে এসে ধরে পড়ল!

প্রলয় একটু হেসে বলেন,—ওঁর আর দোষ কী? উনি তো জানেন না,

চৌধুরী মশাইরা বাড়িতে দুটো পাগল পুষে রেখেছেন! কী মতলবে যে ওঁরা আমার একখানা ডুপ্লিকেট বানিয়ে রেখে, আমায় খুনে-টুনে বানিয়ে হাজতে ঠেলবার তালে ছিলেন, তা ওনারাই জানেন। এই ইয়াংম্যান নান্টুবাবু, আর ওল্ডম্যান রামসেবকবাবু একদিকে এনতার খাইয়ে কাবু করে ফেলবার মতলব, আর একদিকে— তো মেকআপটি দুর্দান্ত হয়েছে বলতেই হবে।... তফাতের মধ্যে ধুতির বদলে পায়জামা। তা বাহান্ন ইঞ্চি ধুতির কোঁচা সামলানো তো সহজ ব্যাপার নয়। অভ্যেস না থাকলেই আছাড় খাবার ভয়। তায় আবার এনার শুনি সারাদিনই রাজকার্য! সত্যি মিত্যে ঈশ্বর জানেন। হয়তো বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখেই—

কী? বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেখে?—দ্বিতীয় চাকলাদার রাগে ফেটে পড়েন ঃ আমি কি একটা কাঠের পুতুল? যে লুকিয়ে রাখবে? আমকে মেকআপ করে ওই ওনার ডুপ্লিকেট বানানো হয়েছে? কেন? উনি কী এমন মহাপুরুষ? আমার সৃষ্টিকর্তা আমায় যেভাবে—

ব্রিজমোহন এখন গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বলেন,— না না মোশাই? এখন দেখছি মহাপুরুষটি হচ্ছেন আপনিই। তো আপনার পুরো নামটি জানতে পারি কি?

—কেন পারবেন না? নাম, প্রবল চাকলাদার।

—বাঃ। নামের মিলনটি তো ভালোই। তো বাড়ি কোথায়? ঠিকানা কী? আদি বাস কোথায়?

প্রবল প্রবলবেগে রেগে গিয়ে বলেন,— এ-পৃথিবীতে আমার নিজের বাড়ি বলে কিছু নেই মশাই। ঠিকানারও ঠিকঠাক নেই। যখনতখন যেখানে সেখানে থেকে যাই। আদিবাস? সেটা আবার কী বস্তু?

—আহা তাও জানেন না? বলি দেশ কোথায়?

—জানি না! আমি ‘কে’ তাই জানি না। ছোটোবেলা থেকে মানুষ হয়েছি একটা মিশনের অরফ্যান হোমে। সেখানেই যৎকিঞ্চিৎ যা লেখাপড়া। লায়েক হয়ে উঠতেই মিশনের ফাদার বললেন, ‘চরে খাওগে।’ আর বললেন,— কোনো একজন হাসপাতালের আয়া মিশন হাসপাতালে মরতে এসে মৃত্যুকালে একটা বছর দুইয়ের ছেলেকে ওঁদের হাতে গছিয়ে দিয়ে বলেছিলেন— ছেলেটাকে সে লোভে পড়ে মনিববাড়ি থেকে চুরি করে এনেছিল। এখন অনুতাপ হচ্ছে। সেই গেরস্থদের আর পাত্তা পায়নি। চুরির সময় ভেবেছিল, তাদের একসঙ্গে দুটো ছেলে হয়েছেষ, আর ওর একটাও নেই? এটা ভগবানের অবিচার! তাই।... তো ছেলেটার সঙ্গে সে একটা কাগজে ছেলেটার নাম আর

তার মা বাপের নাম লিখে দিয়ে গিয়েছিল। সেটা যদি সত্যি হয় তো সেটাই আমার পরিচয়। সেই সূত্রেই আমি প্রবল চাকলাদার। সেই চোর মহিলাটিই নাকি হাসপাতালে গল্প করেছিল, আমার জন্মকালে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, আর আমি নাকি প্রচণ্ড চেঁচিয়ে কেঁদেছিলাম তাই ওই নাম।... সবই শোনা কথা স্যার।... ফাদার চরে খেতে বলেছিলেন, তাই চরে খাচ্ছি। তো তাঁর শুভেচ্ছায় ভালোই খাচ্ছি।... খাওয়াটাই 'হবি' বুঝলেন? অনাথ আশ্রমে মানুষ, বুঝতেই পারছেন, কীভাবে মানুষ। তো ছেলেবেলা থেকেই ওই একটা সাধ ছিল—বড়ো হয়ে যদি অনেক টাকা হয় দেদার খাব। আর ভালোভালো খাব!

ব্রিজমোহন কপালে আঙুল টিপে বলেন,— আরেব্বাস! আপনিই যে মশাই একখানা 'গোয়েন্দা গল্প'। তো এবার প্রশ্ন এত খাওয়াটি জুটছে কোথা থেকে? পেশা কী?

—পেশা অর্ডার সাপ্লাইয়ের। যখন যা পাই। আর নেশা হচ্ছে শখের গোয়েন্দাগিরি। সেই কাজেই এখানে—

—অ্যাঁ! ইনি একজন গোয়েন্দা গল্প লিখিয়ে। আর আপনি খাসা একখানা গোয়েন্দাই। তা দিনরাত তো ঘুরছেন শুনলাম। এক-আধটা খুনে গুন্ডা-টুন্ডার হদিস পেলেন?

প্রবল চাকলাদার এখন একটু হালেন,— না মশাই খুন জখমের দিকে আমি নেই। আমি খুঁজে বেড়াই সেই সব হারানো ছেলেমেয়েকে, 'নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন'-এ যাদের ছবি দেখি, আর বিবরণ দেখি।

প্রলয় চাকলাদার উৎসুক গলায় বলেন,—পান?

—পাই। খুব বেশি না হলেও বেশ কিছুর সন্ধান পেয়ে, তাদের উদ্ধার করে তাদের মা বাপের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি।

সত্যহরি ডিউটির টানে ছটফট করছেন, তবু নড়তে পারছেন না। এখন গম্ভীরভবে বলেন,— আপনার এই নেশার পিছনে আপনার নিজের জীবনের পাস্ট হিস্ট্রিই কাজ করেছে। আপনি সন্তান হারিয়ে ফেলা মা বাপের কষ্ট অনুভব করেছেন!

—কীসে কী করেছে জানি না মাস্টারমশাই, তবে ওটাই কেমন খেয়ালে চেপে গিয়েছিল। তো এখানে এসে তেমন সুবিধে হল না। জানতে পারলাম একদিনের জন্যে নাকি এখানে রেখে ছেলেটাকে কলকাতায় চালান দিয়েছে। তার মানে এখন খড়ের গাদা থেকে ছুঁচ খোঁজা।

ব্রিজমোহন বললেন,—একজন গোয়েন্দা আর একজন গোয়েন্দা গল্প লিখিয়ে, এই মানিকজোড় তো আমায় বোকা বানিয়ে ছাড়লেন দেখছি।... তো

সেই যে কী বলছিলেন সেই চোর মহিলাটি আপনার মা বাপের নামও লিখে দিয়েছিল। তো তাদেরই সন্ধান করে দেখুন না একবার। যদি তাদের হারানো ছেলেকে খুঁজে ফিরিয়ে দিতে পারেন!

প্রবল চাকলাদার হেসে উঠলেন,— সে কি আজকের কথা মশাই? সত্যি হলে, চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছর আগের ব্যপার। তাঁরা কি আর এখনও এ পৃথিবীতে আছেন? তা ছাড়া বানানো নাম কিনা কে জানে! তবে লেখা আছে বাবার নাম প্রভাসকুমার চাকলাদার, আর মায়ের নাম সুধাহাসি চাকলাদার।

—অ্যাঁ!! কী বললেন?

প্রলয় চাকলাদার প্রায় ছিটকে উঠলেন,— কী নাম বললেন? প্রভাসকুমার চাকলাদার আর সুধাহাসি চাকলাদার! তার মানে? তার মানে—আপনি—মানে তুমি—মানে তুই আমার নিজের ভাই! নিজের সহোদর ভাই? আমার যমজ ভাই?... কবে যেন শুনেছিলাম আমার নাকি একটা ভাই হয়েছিল, সে নেই।... অথচ তুই আছিস? ওঃ।

প্রলয় চাকলাদার দু-হাত বাড়িয়ে প্রবলকে জড়িয়ে ধরেন,— আমিও শুনেছিলাম খুব প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টির সময় আমার জন্ম হয়েছিল আর তারপর মায়ের খুব অসুখ হওয়ায় একজন আয়ার কাছে মানুষ হয়েছিলাম। আর কিছু বলেনি মা।... বাবা এ জগতে নেই। কিন্তু মা আছেন। চল এবার তোর নিজের বলতে একটা বাড়িতে...।

প্রলয়ের গা থেকে শাল খুলে পড়ে যায়। শুধু গেঞ্জি বেরিয়ে পড়ে। প্রবল তাকে নিজের শালের মধ্যে ঢেকে আবেগের গলায় বলেন,—তাহলে আপনাকে— মনে, তোমাকে—মানে ইয়ে তোকে আমি কী বলে ডাকব? দাদা? দাদাই বা কী করে হবে? একইসঙ্গে যখন পৃথিবীতে আসা হয়েছে।

— আরে বাবা। ডাক সমস্যা পরে হবে। মায়ের কাছে চল তো। মা-ই বলে দেবেন। তবে তোর মতো একটা খাইয়ে ছেলে পেলে মা যে বর্তে যাবেন! হয়তো আমায় আর পুঁছবেনই না। মায়ের যত দুঃখ তো আমায় খাইয়ে সুখ নেই বলে।... তাহলে দারোগাবাবু, আমাদের এখন কী গতি? ছেড়ে দেবেন? না হাজতে ভরবেন? ভরেন তো— দুই ভাইকে একই ঘরে—

ব্রিজমোহন লম্বা একখানা জিভ কেটে বলেন,— রাম! রাম! এই দুটো নাবালকের নালিশে কান পেতে যা কেলেঙ্কারি হল। আপনার মতো একজন রেসপেকটেব্‌ল লোককে—ওঃ। আপনার লেখা বই সিনেমায় হিট হয়, আর আমি কিনা আপনাকে—ওই যে ওই মাস্টারবাবুটি— আরে চললেন কোথা?

সত্যহরি ব্যস্তভাবে বলেন,— সাড়ে পাঁচটার প্যাসেঞ্জারটা পাস করাতে

হবে।... ভগবান আজ একটা নাটক দেখানও বটে। এই বাহাদুর তুই এখনও এমন মলিনমুখে কেন রে? তোর নাটের গুরু মামা তো বেকসুর খালাস! আচ্ছা মশাই নমস্কার।

হঠাৎ সেই কালো কোটের হাতাটা চোখের সামনে উঠে যায়!

আর প্রবল চাকলাদার বলে ওঠেন,— তাহলে নান্টুবাবু, এই ফাঁসির আসামিটাকে শেষবারের মতো আজ রাতে একখানা 'ফাঁসির খাওয়া' দিচ্ছেন তো? ও রামসেবক, তোমার রাতের কী মেনু?

হঠাৎ বুড়োধাড়ি রামসেবকও ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলে বলে ওঠে, —রামসেবক হারবে নাকি?... চলেন না কত মোগলাই পরোটা খেতে পারেন। দু-কুড়ি আন্ডা আনা আছে। আর পাঁচ কিলো ঘিউ। এখনও স্টিশন বাজার থেকে দুটো মুরগি নিয়ে ঘর ফিরে লাগিয়ে দেব রসুই।... দু-নম্বর বাবু আজ আপনাকেও বহোৎ বেশি খেতে হবে। আজ আপনার একটা ভাই মিলে গেল।

প্রলয় হেসে বলেন,— শুধু ভাই মিলে গেল? খুনের চার্জ থেকে রেহাই মিলে গেল না? আর তার সঙ্গে একখানা 'গল্প লেখার' প্লট-ও। ওহে নান্টুবাবু, আপনিই আমায় একখানা গোয়েন্দা গল্পের প্লট সাপ্লাই করে ফেললেন। আপনার এই 'মনোরঞ্জন ভবন'-এর এক্সপিরিয়ান্স নিয়েই রাতারাতি একখানা জম্পেশ গোয়েন্দা গল্প লিখে ফেলেছি। গোয়েন্দা গল্প আর কাকে বলে? একটু রং চড়ালেই তো—

— আপনার আর প্লটের ভাবনা রইল কোথায় স্যার? একখানি জলজ্যান্ত গোয়েন্দা ভাই হাতের কাছে পেয়ে গেলেন। উনিই অনেক প্লট সাপ্লাই করবেন এরপর। ভবিষ্যতে হয়তো আপনি গোয়েন্দা কাহিনির লেখক বলেই বেশি বিখ্যাত হয়ে উঠবেন... কিন্তু— এই আপনার সামনে সাত হাত নাকে খত দিচ্ছি স্যার কালই চলে যেতে চাইবেন না। কাল আপনাদের এই জোড়া চাকলাদারের অনারে একটু ভালোমতো ভোজ লাগাতে চাই। থানার ও. সি. ইস্টিশান মাস্টারমশাই, বন্ধু বাহাদুর ইত্যাদিদের ডেকে—

প্রবল চাকলাদার প্রবল স্বরে বলে ওঠেন,— গুড নিউজ? ওহে রামসেবক তোমার সেই বিরিয়ানিটা হবে তো?

রামসেবক বলে,— হোবে হোবে সোব হোবে।

অলৌকিকের মতো

আউটডোর শুটিং।

—অ্যাঁ? একেবারে ফার্স্ট চান্সেই?

—রাহুল রে। কী 'লাকি' তুই বাবা!

—সিনেমায় নামবি? ভাবা যায় না! সত্যি, বিশ্বাস হচ্ছে না। কীভাবে কোথা থেকে যে খবরটা চাউর হয়ে বসল কে জানে। রাহুল তো দেখছিল বাড়িতে বাবা কাকা দুজনেই কেবলই বলছিলেন, 'থাক। এক্ষনি কাউকে এসব জানাবার দরকার নেই।' অথচ গরমের ছুটির পর স্কুলে আসা মাত্রই ক্লাসের ছেলেরা একেবারে রাহুলকে ছেঁকে ধরল, 'কী লাকি তুই।'

দিব্যকান্তি, অর্ণব, নীলাঞ্জন আর নির্ভয়, এরা চারজন রাহুলের বিশেষ বন্ধু। তাই এদের হাত থেকে আর যেন ছাড়ানই পাওয়া যাচ্ছে না।

ক্লাস বসে যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে, তবু উচ্ছ্বাসের জের কমছে না। দিব্য বলল, 'লাকি' তো বটেই, না হলে এমন ঘটনা ঘটে? দুম করে সিনেমার অফার। তাও একেবারে বড়োপর্দায়।

যা বলেছিস, অর্ণব বলে ওঠে, আমরা কি তিনজন্ম ধরে তপস্যা করেও কোনোদিন এমন চান্স পাবো?

তিনজন্ম কী রে! বল সাতজন্ম।... নীলাঞ্জন বলে, অবশ্য যদি ওইসব 'পূর্বজন্ম

পরজন্ম' বলে কিছু থাকে! তো এখন যেন একটু একটু বিশ্বাস হচ্ছে। আমার দিদিমা বলে, আগের জন্মে পূণ্যিটুন্যি করলে না কি পরের জন্মে সব ভালো হয়। তা তুই আগের জন্মে বোধহয় খুব পূণ্যি করেছিলিস। নাহলে হঠাৎ কোথাও কিছুনা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ছবির হিরো করে দেয়?

রাহুল এখন একটু আপত্তি করে, হিরো আবার কী? শুধু তো তার ছোটোবেলাটা।

ও একই।

নির্ভয় বলল, আমাদের কেউ কোনোদিন ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা ভিড়ের দৃশ্যর মধ্যেও দাঁড় করাবে? হুঁঃ।

রাহুল বেচারি যেন অপ্রস্তুতের একশেষ।

সত্যি, ওর নিজের কাছেই যেন ব্যাপারটা এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। স্বপ্নের মতো লাগছে। কী করে যে কী হলো।

তবু বন্ধুদের কাছে অস্বস্তি ঢাকতে বলে, আসলে তোদের কাউকে দেখলেও হয়তো নিয়ে নিতো। একটা আমাদের মতো বয়সের ছেলে খুঁজছিল নাকি। খুব তাড়াতাড়ি দরকার। হঠাৎ আমায় দেখে—

আমাদের কাউকে দেখলেও নিয়ে নিতো। তা আর নয়? তোর মতন এমন লাক আর কারুর নয়। তো ছবি হলে আমাদের সবাইকে দেখাবি তো? পাসটাস দিবি তো?

আহা। আমি যেন ওইসবের কর্তা।

যাই বলিস বাবা, তোর ওপর দারুণ হিংসে হচ্ছে।

রাহুল এখন বলে, তোরা এই বলছিস? আর বাবা তো একদম রাজি হচ্ছিল না। আর মা বলছিল, মা-র মোটেই ভালো লাগছে না।

আমার পড়াশুনার বারোটা বেজে যাবে। তো বাবা বলল, 'অত বড়ো একজন ডিরেক্টর অমনভাবে বললেন, 'না' করাটা কি ভালো দেখায়? একবারের জন্যে তো মাত্র।'... তো মা বলল, কে জানে। একবার নামলে কি আর চলে আসতে পারবে? ভালো অভিনয় করলে হয়তো আবার বলবে।' মার মোটেই ভালো লাগছে না। ... বাবাও তো নেহাত কাকার কথাতেই। কাকা তো বাবার প্রাণ!

ওরা হি হি করে হেসে বলল, তাহলে ইচ্ছে করে ছাই খারাপ অভিনয় করিস। তাহলে আর ডাকবে না। মাসিমা বাঁচবেন। জানি না বাবা। এ-কথাটা ছাড় তো এবার। ক্লাস বসে যাচ্ছে।

না রে, এখনও ঘণ্টা পড়েনি। হ্যাঁ রে কত টাকা দেবে রে?

বাঃ। আমি তার কী জানি? 'এইটুকু'দের টাকা দেয় কি না কে জানে। আরে বাবা, কিছু কি আর না দেবে? ছোটোদের নিজেদের হাতে কি আর দেয়? ওদের গার্জেনদের হাতে দেয়।

তুই বুঝি সব জানিস?

সব্বাই জানে।

ছেলেগুলো কিন্তু সত্যিই 'এইটুকুই' বলা যায়। ক্লাস ফাইভের ছাত্র। কিন্তু রীতিমতো পাকা পড়ুয়াই।... সর্বদা টিভি দেখে দেখে, আর সর্বদা নানাবিধ আলোচনা শুনে শুনে, আগেকার ছেলেদের থেকে এখনের ছেলেরা অনেক বেশি চালাক হয়ে গেছে। অনেক জেনে যাচ্ছে, অনেক বুঝে ফেলছে। বরং বলতে হয় রাহুলটাই ওদের মধ্যে একটু অবোধ। তা ছাড়া ভারি অস্বস্তি লাগছে বেচারার। যেন এ-প্রসঙ্গ থামলে বাঁচে।

কিন্তু এরা থামতে দিলে তো?

ছবিটার নাম কী রে?

কী জানি বাবা! শুনছিলাম নাকি দু-তিনটে নাম নিয়ে না কী ভাবছে। বাবাই বলছিল। বাবার সঙ্গে অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টরের বেশ ভাব হয়ে গেছে।

হ্যাঁ রে ওই যে আউটডোরে যেতে হবে, সেটা কোথায়?

তাও জানি না ভালো করে। যেতে হবে তাই শুনছিলাম। কাকা মাকে বলছিল, 'ঝিলমিলপুর' না 'দিকবালপুর' কী যেন একটা নাম।

যা বাবা যা! যুদ্ধ জয় করে আয়।

দুর, আমার মোটেই ভালো লাগছে না। লম্বা ছুটিটা ফুরিয়ে গেল।

এখন কামাই করতে হবে। ধ্যাৎ!

ভালো লাগছে না, ধ্যাৎ, গুল মারতে আসিস না। আহ্লাদে তো ফাটছিস।

ঘণ্টা পড়ে যায়।

দুদ্দাড়িয়ে চলে যায় ওরা।

আসলে এরা চারজনে খুব বন্ধু হলেও, এক জনের অন্যরকম একটা জম্পেস ব্যাপারের খবর শুনে এরা যেন স্থির থাকতে পারছে না। তাদের দলেরই একজন যেন হঠাৎ লাফ মেরে অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে।

টিভিতে 'বিজ্ঞাপনের' ছেলেগুলোকে দু-এক মিনিট দেখলেই কী রকম যেন লাগে! ঠিক তাদেরই মতো প্রায়, অথচ ওই পর্দার মধ্যে লাফাচ্ছে, খেলছে, বিস্কুট খাচ্ছে, শরবতের গেলাস গলায় ঢালছে, ঘষে ঘষে দাঁত মাজছে। কতো হাজার হাজার তো দেখছে।

মজাটা কীরকম।

আবার নাকি ওর জন্যে পয়সাও দেয়।

শুধু দেখতে দিলেই বর্তে যাওয়া যায়, আবার পয়সা। তো এখন কি না রাহুলকে দু-এক মিনিট মাত্র নয়, কতক্ষণের জন্যে কে জানে দেখতে পাওয়া যাবে।... না বাবা। হলেও বন্ধু একটু যেন হিংসে হিংসেই হচ্ছে।

তা ওরা তো তবু মুখে বলছে না। খবরটা শুনে পর্যন্ত তো স্পষ্টাস্পষ্টি অনেকেই বলছে, 'তোর উপর হিংসে হচ্ছে।' পিসতুতো দাদা, মাসতুতো দাদা, এমন কী নিজের দিদিই।

খুব দেখালি বটে যা হোক! ওস্তাদ ছেলে।

শুনতে শুনতে এক এক সময় রাগই ধরে যায় রাহুলের।

আমি আবার কী দেখালাম শুনি? আমি ডেকে ডেকে বলতে গেছলাম, 'আমায় নাও।' দূর, সেদিন যদি ওই দোকানটায় না যেতাম, তাহলেই ভালো হত।

হ্যাঁ, সেদিন গড়িয়াহাটার মোড়ে একটা 'ইনডোর গেমস'-এর দোকানের সামনে ছোটকার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল রাহুল খুব আহ্লাদ আহ্লাদ মন নিয়ে। জন্মদিনের উপহার বাছতে। এটা ছোটকা স্পেশাল।

মা-র তো শুধু ভালো ভালো জামা-জুতোর দিকে মন।

বাবা অবশ্য স্পেশাল কিছু দেন না। তবে মাসি পিসি দিদি মামা সকলেই কিছু না কিছু দেয় জন্মদিনে। ছোটোমাসি বই দেবে অবধারিত। আর দিদিও। কিন্তু তার কোনোটাই তো রাহুলের নিজের পছন্দে বাছাই করা নয়। এটা আলাদা খুশির ব্যাপার। এমনিতেই বইয়ের তো পাহাড় জমে গেছে। বই তো সবসময়ই, নববর্ষে, পুজোয়, বইমেলায়।

ছোটকা বলেছিল, আমার বাজেট কিন্তু মাত্র একশো টাকা। তার মধ্যে যা বাছতে পারিস বাছ। ... মেয়েদের বেলায় কোনো ভাবনা থাকে না। সাজবার কিছু একটা দিলেই খুশি। ছেলেদের জন্যে প্রেজেনটেশন বাছা মুশকিল! দ্যাখ ওর মধ্যে কী পাস।

ছোটকা এমনভাবে বলছিল, যেন একশো টাকাটা কিছুই নয়। রাহুলের তো মনে হয়েছিল, সে তো অনেক টাকা!

তাই দোকানের সব জিনিসগুলোই দেখতে ইচ্ছে করছিল রাহুলের। ...দেখছিলও এটা ওটা। হঠাৎ উঁচু তাকের দিকে নজর পড়ল, ছোটকা ওই, মস্ত বড়ো লাল রঙের তিনকোণা বাক্সটা কীসের?

ওটা? আচ্ছা জিগ্যেস করছি—মনে হচ্ছে বোধ হয়—

'বোধ হয়'টা যে কী তা আর শোনা হল না। ঠিক এই সময় কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল 'থ্যাঙ্কস গড।'... অচেনা গলা। ভারি ভারি অথচ যেন সুরেলা।

কোথা থেকে বলল? পিছন থেকে? না পাশ থেকে?

পাশ থেকেই।

রাস্তার ওপরই দোকান। দোকানের সামনে যে কখন একখানা দামি গাড়ি খ্যাঁচ করে থেমে পড়েছিল, আর তা থেকে এক অভিজাত চেহারার ভদ্রলোক নেমে এসে দোকানে উঠে এসেছেন, তা এরা কেউ লক্ষ করেনি। যদিও এ-দোকানে শাড়িজামার দোকানের মতো ভিড় নেই; দু-একজন মাত্র ওদিকটায় কাউন্টারের সামনে কী যেন বলছে-টলছে।

থ্যাঙ্কস গড্।

কথাটা শুনেই চমকে তাকায় কাকা ভাইপো দুজনেই।

ততক্ষণে ভদ্রলোক ঠিক বেড়ালছানার ঘাড় ধরে ফেলার স্টাইলে পিছন থেকে ক্যাঁক করে রাহুলের জামার কলারটা চেপে ধরে বলে ওঠেন, আরে, আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে শহর চষছি, আর তুমি এখানে, মনের সুখে খেলনা কিনছো?

রাহুল তো 'নেই'।

ছোটকাও প্রায় তাই। হতভম্বের মতো বলে, আপনাকে তো ঠিক— চিনতে পারছেন না! কেমন? তা না পারতেও পারেন। আমি কিন্তু যা চিনবার চিনে ফেলেছি। আপনি এটিকে পেলেন কোথায় বলুন তো? আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছি।

দোকানি একটু চকিত হয়।

ব্যাপারটা কী? ছেলেটাকে খেলনা-টেলনা কিনে দেবার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে আসেনি তো ছোকরা? কড়া নজরে লক্ষ করে।

রাহুলের ছোটকা কপিলও অবশ্য কড়া চোখে তাকায়। কড়া গলায় বলে ওঠে, দেখুন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করে বলুন তো! হঠাৎ এভাবে—আপনার পরিচয়টা জানতে পারলে—

আমার পরিচয়?

ভদ্রলোক বেশ হাসির গলায় বলেন, আমার আপাতত পরিচয় হচ্ছে 'ছেলেধরা'।... প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি আজ একটা ছেলে না ধরে ফিরবো না। মানে ঠিক এইরকম একটি ছেলে। গাড়ি থেকেই দেখে চমকে উঠেছি। একেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি।... বলেই ভদ্রলোক পকেট থেকে একখানা

পুরোনো পুরোনো ছোটো ফটো বার করে রাহুলের আর কপিলের সামনে ধরে বলেন, কী? চিনতে পারছেন মনে হচ্ছে?

রাহুল অবশ্য কিছু বুঝতে পারে না। কপিল একটু অপ্রতিভ গলায় বলে, চেহারাটায় আমার এই ভাইপোর সঙ্গে একটু মিল রয়েছে মনে হচ্ছে—

একটু কী? একদম পুরোপুরি। আমার ভাগ্যে এ রকম আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটবে আশাই করতে পারিনি। একে তো আমার চাই ভাই। চাই।

চাই মানে? কপিল আবার একটু রুখে ওঠে, আপনি কী বলতে চান ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনাদের কোনো হারানো ছেলের চেহারার সঙ্গে এর চেহারার একটু মিল আছে বলে কি আপনি—এ আমার ভাইপো রাহুল রায়।

ভদ্রলোক এবার কৌতুক ত্যাগ করেন। বলেন, নাঃ। আপনাকে আর ধাঁধায় রাখছি না। আসলে একটা 'ছবি'র প্রয়োজনে ঠিক এইরকম বয়েসের এবং চেহারার ছেলে খুঁজতে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছি। মানে নায়ক প্রসূনকুমারের ছেলেবেলার জন্যে—

নায়ক প্রসূনকুমার।

এখন এসময় যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক বললেই হয়।

প্রসূনকুমারের নাম আর কে না জানে? আর তাকে কে না দেখেছে? রাহুলও চমকে উঠে ভদ্রলোকের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এতক্ষণ তো বুঝতেই পারছিল না, ইনি বলছেনটা কী।

আর কপিল তখন সমীহর গলায় বলে, আপনি তাহলে— মানে আপনার নামটা যদি একটু—

আমার নাম? ও হ্যাঁ হ্যাঁ 'ছেলেধরা' ছাড়াও আমার আর একটা নাম আছে বটে। সে-নামটা হচ্ছে চিত্ররথ সেন। একটু ছবিটবি করে থাকি।

চিত্ররথ সেন।

'একটু ছবিটবি করে থাকি।'

তার মানে বিখ্যাত চিত্র পরিচালক চিত্ররথ সেন।

কপিল একেবারে মরমে মরে যায়।

ছি ছি। দেখে চিনতে পারেনি। কত সময় ছবি দেখেছে। টিভিতে সাক্ষাৎকার দেখেছে।

পারে তো দোকানের মধ্যেই পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বসে আর কি। বিচলিত গলায় বলে, ইস! মাপ করবেন। মানে হঠাৎ এভাবে দেখে ঠিক—অবশ্য আচমকা এরকম।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। এমন একখানা বিশ্বখ্যাত লোক আমি নই যে,

বিশ্বসুদ্ধু সবাই চিনে রাখবে। আচ্ছা কী কিনছিলেন কিনুন। তারপর চলে আসুন আমার সঙ্গে, গাড়িতে কথা হবে।

রাহুল অবশ্য 'প্রসূনকুমার' শুনে যেমন হাঁ হয়ে গেছল 'চিত্ররথ সেন' শুনে তেমন হল না। ছেলেমানুষরা বড়োদের মতো ছবির ডিরেক্টর নিয়ে মাথা ঘামায় না। তবে ছোটকার থতমত ভাব দেখে বুঝল খুবই বিশিষ্ট লোক ইনি।

কপিল তাড়াতাড়ি দোকানিকে সেই তিনকোণা লাল বাক্সটা নামাতে বলল। একটা খেলনা ইঞ্জিন তৈরির সরঞ্জাম। পার্টস জুড়ে জুড়ে বানাতে হবে। একশো দশ টাকা নিল। তাড়াতাড়ি সেটা মিটিয়ে দিয়ে কপিল ঘুরে দাঁড়াল। তবে দোকানি পরিস্থিতি দেখে সভয়ে মান্য মান্য গলায় বলল, দাঁড়ান, সুন্দর করে প্যাক করে দিই।... বললেন জন্মদিনের উপহারের জন্যে—

এখন চিত্ররথ বললেন, কিছু যদি দোষ না নেন, ভাই—

কপিল তাড়াতাড়ি বলল, 'আমায় আপনি করে বলবেন না—

আচ্ছা না হয় 'তুমি' করেই বললাম। ভাইপোর থেকে অনেক বেশি বড়ো বলে তো মনে হচ্ছে না। যাক বলছিলাম—শুনতে পেলাম ভাইপোর জন্মদিনের উপহার কিনতে এসেছ। আমি যদি একটি উপহার দিতে চাই?

কপিলের তো মাথায় হাত।

বলে ওঠে, না না সে কী! বাড়িতে তো আরও কেনা টেনা হয়ে গেছে।

আহা সে তো হবেই। এমন চমৎকার সুন্দর একটি ছেলের জন্মদিনে—তো আর একটা না হয় বাড়বে!

কপিল থতমত খায়। এঁর মুখের ওপর কী বলবে! অথচ এরকম একটা প্রস্তাবে চট করে 'আচ্ছা হ্যাঁ' বলাও তো শক্ত।

হঠাৎ রাহুলই সমস্যার সমাধান করে দেয়। ভয় পেয়েই দেয়। খুব ভয়ের গলায় বলে ওঠে, না ছোটকা! না। বাবা ভীষণ রেগে যাবেন।

চিত্ররথ একটু হেসে বললেন, আচ্ছা এখন তাহলে থাক। তবে ভবিষ্যতে তো তোমায় হাতে পাচ্ছিই। তাহলে 'ছোটকা' চলে আসা যাক।

রাহুলকে এবং কপিলকে নিয়ে গাড়িতে এসে বসেন।

তারপর আত্মস্থ গলায় বলেন, যাক। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন। ছবিটা আর একবার দেখো ভাই ছোটকা, পাশে ধরে মেলাও! একে তো আমায় প্লেতেই হবে।

যদিও রাহুলের ছোটকার মনের মধ্যে স্রেফ 'ধন্য ধন্য' ভাব। সে চিত্ররথ

সেনের পাশে, তাঁরই গাড়িতে চেপে বসে, কথা কইতে কইতে যাচ্ছে এবং উনি এমন ঘরোয়া ভাবে কথা বলছেন, আবার মজা করে 'ছোটকা' বলে ডাকছেন। বিগলিত হবে না? ছোটকাই বা সত্যি কী এত বড়ো? এই তো কিছুদিন আগেও 'ছাত্র' ছিল।

ভাগ্যক্রমে হঠাৎই একটা ভালোমতো কাজ পেয়ে যাওয়ায় এমন ভাব দেখাতে পারছে, একশো টাকাটা যেন কিছুই নয়।

তবে রাহুলের মতো ওরও ভয় আছে বইকি। 'দাদা' কী পছন্দ করবেন?

ভয়ে ভয়ে বলে, দেখুন, আমি তো ওর গার্জেন নই। এ-ব্যাপারে আমাকে বলে ঠিক—

সে তো ঠিকই।

এখন চিত্ররথ একটু আত্মস্থ হয়েছেন। প্রথমটা একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন হঠাৎ মনের জগতের ছবিটিকে চোখের সামনে দেখে। এখন নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তা ছাড়া— ছেলেটার ভয় পাওয়া এবং তার কাকারও ভয় ভয় ভাব দেখে বুঝে ফেলেছেন ছেলের বাপকে রাজি করাতে হয়তো একটু সময় লাগবে।... তবে তিনি সংকল্পে দৃঢ়। রাজি করিয়েই ছাড়বেন। ইত্যবসরে লক্ষণ মিলোতে শুরুও করেছেন, কাহিনির চরিত্রর সঙ্গে ছেলেটির ধরন কতটা খাপ খায়।... তাতেও সন্তুষ্ট। ঠিক এইরকমটিই চাই। এখনকার সব ছোটোছেলেদের মতো খুব চৌকস নয় বোধ হয়, একটু অবোধ অবোধ, সরল সরল। এটাই দরকার।

চিত্ররথ ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন।

ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন গাড়ি ছাড়তে। তবে আস্তে চালাতে। এখন বললেন, এখানে দোকানে এসেছ যেভাবে মনে হচ্ছে পাড়ার মধ্যেই বাড়ি। তো চলো এই 'মহাশয়ের' গার্জেনের কাছেই নিয়ে চলো। তাঁর কাছেই আর্জিটা জানাইগে। তবে তোমাকে ভাই মনে রাখতে হবে, তুমি আমার পক্ষের উকিল। কেমন? ঠিক তো?... তো ভাইপোর নাম তো জানা হয়ে গেছে, কাকার নাম? কপিল। কপিল রায়। আমার দাদার, মানে এর বাবার নাম হচ্ছে কৌশিক রায়।

ভালো তাহলে ড্রাইভারকে বলে দাও—

বলে দিলো কপিল।

একটু গিয়েই ফার্ণ রোডে একটা মাঝারি দোতলা বাড়ির সামনে থামলো।

শেষ পর্যন্ত সফলও হলেন চিত্ররথ।

রাঁহুলের মাও দেখাটেখা করলেন, চা মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়লেন না। তবু একটু খুঁৎ খুঁৎ করে বললেন, পড়াশুনোর সময়—

আহা সে তো ঠিকই। তবে এখনকার ছেলেরা তো আর আমাদের কালের মতো ভ্যাবলা নয়। এসব তো হরদমই করছে, আবার পড়াশুনোতেও ভালো হচ্ছে। ও নিয়ে ভাবনা করবেন না। তাহলে এইবার দরকারি কথাগুলো সেরে নেওয়া যাক। মাস্টার রাহুল আপাতত এখন তোমার ছুটি। যে খেলনাটা কিনে আনলে সেটা দেখবার জন্যে নিশ্চয় খুব ইচ্ছে হচ্ছে?

দরকারি কথা মানেই অবশ্য টাকাকড়ির কথা। যেটা রাহুলের সামনে হবে না।

কৌশিক রায় বললেন, বাচ্ছা ছেলে! শখ করে নিচ্ছেন ওকে। ও সব কথা নাইবা হলো? 'অ্যামেচার' হিসেবেই হোক না। চিত্ররথ একটু হাসলেন। বললেন ওটা ঠিক নয়। প্রথম কথা আমাদের তো একটা বাজেট রয়েইছে এই রোলটার জন্যে। তাছাড়া—আমার তো মনে হয় জীবনে প্রথম একটা কাজ করবে, সেটা বিনামূল্যে কেন? কাজের মূল্য ঠিক মতো পাওয়া উচিত।

তাতে কাজ সম্পর্কে গুরুত্ববোধ আসে।

আসলে পরিচালক মশাই তো বেশ অভিজ্ঞ লোক। ভাবছেন ব্যাপারটা একেবারে 'পাকা' করে না ফেললে, কী হয় বলা যায় না। এই কৌশিক রায় বেশ পুরোনোপন্থী বলেই মনে হচ্ছে। আগে লোকের 'সিনেমায় নামা' সম্পর্কে ছিল এমন খুঁতখুতানি। যেন কাজটা তেমন 'ভালো' নয়। আর এখন? হাওয়া তো একদম ঘুরে গেছে। কমবয়সি ছেলেমেয়েরা নিজেরা তো ধরনা দিচ্ছেই, বয়স্করা, ছেলেমেয়ে, ভাইঝি ভাগ্নিকে নিয়েও ধরনা দিতে আসেন। তা এখানে যখন ব্যাপারটা উলটো তখন সেরে ফেলাই ভালো। চিত্ররথ হৃষ্টচিত্তে ফিরলেন।

যাবার সময় চিত্ররথ আর একটি কথা বললেন। বললেন, পরে টেস্টের সময় অবশ্যই তো মাস্টার রাহুলের অনেক ছবি টবিই নেওয়া হবে, তবে এখন তো ক্যামেরাম্যান সঙ্গে নেই। একখানা ছবি পেলে ভালো হয়। প্রসূনকে এখনই দেখিয়ে নিতে চাই।

কপিল তো একপায়ে খাড়া।

তাড়াতাড়ি অ্যালবামগুলো নিয়ে এল। তার নিজেরই তো শখ ফটো তোলা।...

বেশির ভাগই অবশ্য গ্রুপফটোর মধ্যে।

নানান সময়ে নানা উপলক্ষে আত্মীয়জনের সঙ্গে। তবে দুটো 'একক'

ছবি মিলল। আসলে বলতে গেলে ভাগ্যক্রমেই এই ক-দিন আগেই একটা 'ফিল্ম' কিছুতেই ফুরোচ্ছে না বলে, প্রিন্ট করতে দিতে পারছিল না, সেই বাবদই শেষের দু-খানা তুলে নিল টকাটক। একটা দাঁড়ানো, একটা বসা। দাঁড়ানোটার ভঙ্গি অবিকল সেই প্রসূনকুমারের বাল্যকালের ফটোখানার মতো।

শার্ট হাফপ্যান্ট পরা বুকের ওপর হাতদুটো আড়াআড়ি রেখে বেশ বীরের ভঙ্গীতে দাঁড়ানো। বসাটা অবশ্য নিরীহমার্কা।

দাঁড়ানোটাই নিলেন চিত্ররথ। বললেন, আজই প্রসূনকে দেখাতে চাইছি তাই। অ্যালবাম থেকে খুলে নিয়ে যাচ্ছি, নিশ্চয় ফেরত পাবেন।

কপিল অবশ্য হাঁ হাঁ করে উঠল। ও কিছু না। নেগেটিভ তো রয়েছে—

তাহলেও—

কৌশিক বললেন, চেহারায় তো খুশি হচ্ছেন আসল কাজটি কেমন করবে কে জানে।

চিত্ররথ একটু হেসে বললেন, আসলে তো 'করিয়ে' নেওয়ার দায়িত্বটা আমার।

চিত্ররথ চলে যাবার পর প্রথম একপালা তো চলল তাঁর প্রশংসার পালা। কী ভদ্রলোক। কী সৌজন্য। অত বড়ো একজন নামি লোক, কোনো অহংকার নেই ইত্যাদি ইত্যাদি যেমন হয়ে থাকে আর কি!

তারপর কপিল বলল, টাকার ব্যাপারে এত আপত্তি করছিলে কেন দাদা? ওটা না নেওয়া মানে প্রযোজকের কিছু সুবিধে করে দেওয়া।... তাতে তোমার লাভ? ওটা তো আর গরিবকে দান করা হবে না। ইচ্ছে করলে বরং তুমি নিয়ে সেটা করতে পারো।... আমি তো বলি হাজার আষ্টেক টাকা এমন কোনো ব্যাপারই নয়। পরে একদিন রাহুলের বন্ধুদের কষে 'খ্যাঁট' দিয়ে দিও।

এরপর কথা চলল, এখন কাউকে বলে কাজ নেই।... অথচ দেখা গেল জানতে কারও বাকিও রইল না। মাসি পিসি মামা মামিরা অভিনন্দন জানাতে আসলেন একে একে।

শেষ পর্যন্ত দেখা গেল স্কুলের বন্ধুরাও জেনে গেছে। খবর বাতাসে ওড়ে আর কি।

মা বাবাকে ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে একা কখনও কোথাও যায়নি রাহুল তার এই এগারো বছরের জীবনে।

এখন যেতে হবে ওই 'আউটডোর শুটিঙে'। যা নিয়ে বন্ধুদের অত হই চই উল্লাস। কিন্তু রাহুলের যেন মনে সুখ নেই। ভয় ভয় ভাব। অপরাধী অপরাধী ভাব। কাকা গেলেও বা কথা ছিল। তো কাকার যে নতুন চাকরি, নতুন অফিস, কামাই করা ঠিক হবে না। নাহ'লে ঠিক চলে যেতো।

অ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে বেশজমিয়ে নিয়েছে ছোটকা ইতিমধ্যেই।

তা চলছে তো ক'দিন ধরে অনেক পর্ব। বাবা তো ঠিকই বলেছিলেন চেহারায় খাপ খেয়ে গেলেই তো হল না। সত্যি কত যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সেসব তো বলতে গেলে 'মহাভারত'।... তা সবসময় ছোটকাই সঙ্গে আসে।...

কিন্তু এখন এই মোক্ষম সময়টিতেই বেচারাকে বাড়ির লোক ছাড়া একা যেতে হবে।

যাবার আগে মায়ের কাছে কাছে ঘোরে। আমার; কিন্তু মা মোটেই ভালো লাগছে না।

মা বলল, ধ্যাৎ কী যে বলিস। স্কুলটা ক-দিন কামাই হবে এই যা খারাপ। নাহ'লে দেখিস বেরিয়ে পড়লেই ভালো লাগবে। কত সব নামকরা নামকরা লোকের সঙ্গে দল বেঁধে লাক্সারি বাসে চেপে পিকনিক করতে যাবার মতো যাওয়া। হই চই মজা। আর তুই একটা বাচ্চা, তোকে সবাই ভালোবাসবে।

আরও তিন-চারটে বাচ্চাও আছে। তারা নাকি ওই ছোটো প্রসূনকুমারের ছেলেবেলার খেলার সাথি-টাথি। গ্রামে যেমন সব হয় একসঙ্গে গাছে চড়া, মেলা দেখতে যাওয়া।

মা ভয় পায়, গাছে চড়তে হবে নাকি?

ওইরকমই তো শুনছিলাম।

দেখিস বাবা, সাবধান। তা ওঁরা অবশ্যই দেখবেন। ওঁদের তো দায়িত্ব।... তা হাঁ রে কাহিনিটা সবটা মনে রেখেছিস তো? আর ডায়লগ-টায়লগ ঠিক মুখস্থ আছে?

রাহুল বলল, কাহিনিটা সবটা আমায় কেউ বলেনি। শুধু আমাকে কী কী করতে হবে, কী কী বলতে হবে তাই বলেছে।

মা বলল, আমিও ঠিক জানি না। মানে বইটা যে কী, কার লেখা কিছুই জানতে পারিনি।

আসলে, ডিরেক্টরের নিজেরই লেখা কাহিনি, তাই বাজারে সে-বই পাওয়া যাবে কোথায়? 'স্ক্রিপ্ট' না কি সেও তো তিনিই লিখছেন। তবে মা ছেলে

দুজনেই মোটামুটি এইটি জেনেছে, একটি সার্কাসের দলের ছেলের জীবন নিয়ে লেখা।

ছেলেটির ছেলেবেলায়, তাদের গ্রামের কাছের এক মেলায় একটা সার্কাস পার্টি আসে। এমন কিছু আহামরি নয়, তবে গ্রামের লোকের কাছে ওই খুব উল্লাসের।...

ওই ছেলেটা অর্থাৎ ছোটো প্রসূনকুমারের কাছে সার্কাসের দল ভীষণ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সে অনবরত ওদের তাঁবুতে চলে যায় লুকিয়ে লুকিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের জপিয়ে জপিয়ে, নিজের ঘরবাড়ি বাবা, বন্ধু আর অভ্যস্ত জীবন ছেড়ে ওদের সঙ্গে পালিয়ে যায়।... এই পর্যন্তই রাহুলের পার্ট। আসলে এই অংশটা সবই ফ্ল্যাশব্যাকে দেখানো হবে। প্রথম শুরু হবে বড়ো নায়ক নিয়েই। হবে, সার্কাসের জীবনের কষ্ট যন্ত্রণা। ঠিক মতো না পারলেই পিটুনি, লাঞ্ছনা।

পারলে অবশ্য একটু আদর জোটে। তো সেরকম আদর সার্কাসের জন্তু -জানোয়ারদের ভাগ্যেও জোটে।

আসলে ওই সার্কাসের কর্তাটি ভারি নিষ্ঠুর প্যাটার্নের। যেসব ছেলেমেয়ে মানুষজনকে তাঁর দলে রেখেছেন, তাদেরকে তিনি তাঁর ওই সব বাঘ-ভাল্লুক- হাতি-গণ্ডার থেকে আলাদা কিছু ভাবেন না। কাজেই ব্যবহারও তাদেরই মতো। ছপ্‌টি মেরে মেরে শিক্ষা দেওয়া।

কাহিনির নায়ক প্রসূনকুমার সার্কাসে যার নাম বঙ্কা মাস্টার। সে এই সার্কাসে আছে প্রায় পনেরো ষোলো বছর। শিখেছে অনেক কিছু। কিন্তু তার আর এখানে মন টিকছে না। প্রাণ পালাই পালাই করছে।... অথচ পালানো বড়ো সহজ নয়। দারুণ শক্ত ঘাঁটি।... কয়েকবারই পালাতে চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। আর তার জন্যে বেদম অত্যাচার আর গালাগাল সইতে হয়েছে। এ তো আর সিনেমা থিয়েটার নয় যে, 'আর্টিস্ট'দের জন্যে মান্য সমীহ। এ অন্য জগৎ। এখানে মানুষের সঙ্গে জন্তুজানোয়ারদের ব্যবহারেরও তফাত নেই, মূল্যবোধেরও তফাত নেই। কিন্তু ব্যাপার হল এই, যতবারই ধরা পড়েছে বঙ্কা মাস্টার, ততবারই তার প্রতি কড়াকড়ি বেড়ে গেছে, ততোই ভেতরে ভেতরে বিদ্রাহী হয়ে উঠেছে সে। আর ফন্দি আঁটতে শুরু করতে থেকেছে কী করে 'কর্তা'র চোখে ধুলো দিয়ে পিটটান দেবে। যদিও এ-জীবনেরও একটা মোহ আছে। (যা দেখে সেই দশ এগারো বছরের ছেলেটা কাণ্ডজ্ঞান ভুলে, মায়ামমতা ভুলে পাগলের মতো পালিয়েছিল।)... ভয়ঙ্কর সব দুঃসাধ্য কাজ করতে পারার রোমাঞ্চ। যেমন 'বঙ্কা মাস্টার' এখন

বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকে তার গায়ে ঠেস দিয়ে বসে। বাঘের সঙ্গে 'দোস্তি' করে। ভীষণ ভয়ের সঙ্গে ভীষণ উত্তেজনা!

তা ছাড়া—দর্শকদের হাততালি!

সে একটা ভয়ংকর রোমাঞ্চময় ব্যাপার।

তবু এ-জীবনে আর মন টিকছে না।

অবশেষে অসাধ্যসাধন করে একদিন পালাল বঙ্কা মাস্টার। সে এক দারুণ অ্যাডভেঞ্চার।

তো সেই ছোট্ট বঙ্কুও যেদিন ভরদুপুরে, ঘুমিয়ে পড়া মায়ের কাছ থেকে উঠে চুপি চুপি পালিয়েছিল, সেই কী কম অ্যাডভেঞ্চার মনে হয়েছিল?

মা বলেছিল, মেলা বসেছে এক ঝকমারি হয়েছে বাবা! সারাক্ষণ মেলার মাঠে ছোটা। শুয়ে থাক এখানে। এখন যেতে হবে না। তোর বাপ এলে তার সঙ্গে যাস।

তাহলেই হয়েছে আর কি? তাহলেই তো সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। বঙ্কুর বাপ হচ্ছেন এ অঞ্চলের সবেধন নীলমণি 'ডাকঘরটির পোস্টমাস্টার'। তবে সেখানে দুবেলা পোস্ট অফিস খুলে রাখবার পাট নেই। বিকেল চারটে না বাজতেই ডাকঘরে তালাচাবি পড়ে যায়। পোস্টমাস্টারবাবু ছাতাটি মাথায় দিয়ে বাড়িমুখো হন।

কাজেই বিকেল হলে বঙ্কুর আর গৃহত্যাগ সম্ভব নয়। অথচ সার্কাস পার্টিরা কাল ভোরেই রওনা দেবে। অর্থাৎ আর দিন নেই।

বঙ্কু তাই নিঃশব্দে মার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে রান্নাঘরের পিছন দিয়ে ঢেঁকিঘর পেরিয়ে গোয়ালের গা ঘেঁষে পালাতে শুরু করে। যদিও এই ভরদুপুরে কেউই সামনের রাস্তায় নেই, তবু বলা কি যায়? তখন বঙ্কুদের স্কুলে পরীক্ষার পরে ছুটি চলছে। বড়োদিনের পর খুলবে।

স্কুল থাকলেও গ্রামে মেলা বসলে, সার্কাস পাটি এলে, কোন ছেলেটা আবার ইস্কুলে যায়?

তো সেই এক পালানোর অভিজ্ঞতা বঙ্কুর। আর এই ষোলো বছর পরে সেই অভিজ্ঞতা। লুকিয়ে পালানো।

কাহিনিতে এই পালানোর আগেই বঙ্কা মাষ্টারের স্মৃতিতে ভেসে ভেসে উঠছে ওই 'ছেলেবেলাটি'। সেই পটভূমিকায় বঙ্কা একটি গোপাল গোপাল মুখ নাদুস-নুদুস ছেলেকে দেখতে পাচ্ছে। মাথায় কোঁকড়া ধরনের চুল। পরনে একটা ধুতি মালকোঁচা মেরে পরা। গায়ে গেঞ্জি। তার ওপর একখানা র‍্যাপার জড়ানো। কারণ সময়টা শীতকাল।

কিন্তু সব ছবিগুলোই কি শীতকালের?

গরমকালের নেই? অন্যদের আমবাগানে গিয়ে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে কাঁচা আম পাড়া, বর্ষার দিনে কঞ্চির ছিপ বানিয়ে লোকেদের পুকুর থেকে মাছ ধরা। মাছ অবশ্য চুনোপুঁটি। তা হোক 'শিকারের' উত্তেজনাটি তো আছে? দুর্গাপুজোর সময় সারাক্ষণ বারোয়ারি তলায় পড়ে থাকা। শীত পড়তেই খেজুর রস চুরির তাল। এমন কতো ছবি।... সঙ্গে ঘোঁতন, পটলা, সুশীল।...

রাহুলকে ওই পার্টটা প্লে করতে হবে।

ভাবা যায়?

অথচ চিত্ররথ সেন রাহুলকে দিব্যি ওই মালকোঁচা মেরে ধুতিপরা গাঁইয়া ছেলেটার খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন।

কাহিনির নায়ক প্রসূনকুমারই-বা কী?

যিনি একদম শহুরে লোকের পার্টেই নামেন বেশির ভাগ, তিনিও তো ওই সার্কাস পাটির একজনের খোলসে ঢুকে বসছেন। যার নাম বঙ্কা মাস্টার। তো ওই ছবির শেষাংশ হচ্ছে— পালিয়ে এসে বঙ্কা মাস্টার নিজের গ্রামটায় এসে পৌঁছল বটে, তবে পথটা চিনতে অনেক ঘুরতে হচ্ছে তাকে। অবশেষে সেই গ্রামের গ্রামদেবী 'নাটাইচণ্ডীর' মন্দিরের মন্দিরতলাটা দূর থেকে দেখতে পেয়ে মনে পড়ে গেল। চিনতে পেরে গেল। একদম একরকমই আছে। গ্রাম-ট্রামের কাছে পনেরো ষোলো বছর এমন কিছু না। প্রায় একরকমই থাকে। বঙ্কা মাস্টার দেখতে পেল মন্দিরতলায় বেশ কিছু লোকের ভিড়। ড্যাড্যাং ড্যাড্যাং বাদ্যি বাজছে।

বঙ্কা মাষ্টারের জীবন থেকে তার বাল্যজীবনটা প্রায় মুছেই গিয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন থেকে কেবলই স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিতে দিতে হারানোরা যেন ধরা দিতে শুরু করেছে। বঙ্কার মনে পড়ল এ বাজনা কারোর 'মানসিক' পুজো দেওয়ার। কেউ তাই দিতে এসেছে, তারাই ওখানে জটলা করছে। বঙ্কার সাজসজ্জা ঠিক এখানের উপযুক্ত নয়। একটা গাঢ়-নীল প্যান্ট, আর একটা 'চক্রাবক্রা" ছিটের না কোট না শার্ট গোছের জামা। সার্টই হয়তো তবে অনেকগুলো পকেট থাকায় কোট কোট দেখাচ্ছে।

তবু বঙ্কা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। আর কী আশ্চর্য— একটু দেখেই চিনতে পারল, চণ্ডীর পুরুত বলাই ঠাকুরকে। আর চিনে ফেলল, তাঁকে, যিনি পুজো দিতে আসবার কর্তা।... অনঙ্গ জ্যাঠা না? পটলার বাবা!... অনেকটাই বুড়ো হয়ে গেছেন, তবু চিনতে অসুবিধে হল না। কপালের ওপর একটি 'আব' আছে তাঁর। সেটিই চিনিয়ে দেয়।

অনঙ্গ জ্যাঠা এসেছেন। কাছে একটা বছর পাঁচেকের সদ্য ন্যাড়ামাথা ছেলে। ও তার মানে ওই ছেলেটার 'চুল' দিতে এসেছে অনঙ্গ জ্যাঠা চণ্ডীতলায়। এটা ওদের গ্রামের একটা বিশেষ প্রথা। ছেলে পাঁচ বছরের হলে, প্রথম ন্যাড়া করা হয় এই মন্দিরতলায় এসে। আর সাধ্যমতো ঘটা করে পুজোও দেওয়া হয়।

ছেলেটা কার?

ভাবতে ভাবতেই বুঝতে পারল পটলার।

পটলাও সঙ্গে রয়েছে। তার কাছাকাছি পটলার মা। চুলগুলো পেকে ভূত, তবু চেনা গেল। একটা ঘোমটা দেওয়া বউ রয়েছে। নিশ্চয় পটলারই বউ।

হঠাৎ দুঃখে অভিমানে চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল বঙ্কার। পটলা এইখানেই দিব্যি সুখে স্বচ্ছন্দে রয়ে গেছে। পটলার মা বাপ বউ ছেলের মাথা ন্যাড়া করতে পুজো দিতে এসেছে। আর বঙ্কা সারাজিবন ছপটি খেয়েছে, আর হাততালি কুড়িয়েছে। ব্যাস। আর কিছু না।...

দেখা করতে ইচ্ছে হল না।

বঙ্কা পিছন ফিরে নিজের বাড়ির দিকে চলল হনহন করে। এখন রাস্তা মনে পড়ছে।

ওই মন্দিরতলার ডানদিক দিয়ে যেতে যেতে কুমোরপাড়া পেরিয়ে পোস্ট অফিস পার হয়ে বঙ্কুদের বাড়ি।

বঙ্কুর খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। বঙ্কার মাথার ওপর রোদ চড়চড় করছে, তবু হাঁটতে হচ্ছে। হাঁটা ছাড়া এখানে আর আছে কী? এক আধজন চাষিবাসিদের মতো লোক তাকিয়ে দেখল, কিছু বলল না। বঙ্কা ডাকঘরের কাছে এসে দেখল পোস্টা মাস্টারের চেয়ারে অন্য একটা লোক বসে আছে।

এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, শরৎবাবু পোস্টমাস্টারমশাই থাকেন না এখন?

ভদ্রলোক তার দিকে অবাক হয়ে বলল, আপনি বুঝি অনেকদিন পরে এসেছেন?

হ্যাঁ।

তিনি তো অনেকদিন হল মারা গেছেন। চিনতেন নাকি? বঙ্কা উলটোপাক দিয়ে ছুটতে থাকে।

পটলার বাবাকে না বঙ্কা জেঠু বলত? পটলার বাবা দিব্যি বেঁচে থেকে নাতি কোলে নিয়ে আদর করতে পারে আর বঙ্কুর বাপই— বঙ্কা যে কী অবস্থায় তাদের বাড়ি চিনে চলে আসতে পেরেছিল, তা ভগবান জানেন।

চোখে তো কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। জলের ধারায় চোখ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বাড়িতে এসে কী দেখল বঙ্কা?

এখানেও তো উঠোনে একটা জটলা।

কে ওরা? কী করছে?

দেখল উঠোনে তুলসীতলায় একটা বাঁশের খাটিয়ার ওপর বঙ্কার মা শুয়ে। সাদা চাদর ঢাকা।

বঙ্কা পালাতে থাকে। যতটা চলে এসেছিল ততটা পালাতে থাকে।... বঙ্কা আবার সার্কাসের মালিকের কাছে ফিরে যায় ভীষণ একটা শাস্তি জুটবে জেনেও।

তা এরকম একখানা দুঃখের কাহিনির পুরোটা রাহুলকে শোনাবার দরকারটা কী? কেউ শোনায়নি। তার ভূমিকাটাই শুনিয়েছে। গ্রামে হুটোপাটি দুষ্টুমি করে বেড়ানো একটা ছেলে। সার্কাস পাটির আকর্ষণে পড়ে পালাচ্ছে।...

তবে রাহুলের কাজ মিটে গেলেও আরও দু-দিন থাকতে হবে। কারণ বঙ্কা মাস্টারের প্রত্যাবর্তন দেখাতে তো ওই গ্রামের পটভূমিকাটা চাই। চাই ওদের বাড়ির উঠোনটার দৃশ্যও। তা' ছোটো ছেলেটাকে আবার কার সঙ্গে ফেরত দেবে? কথায় বলে যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন। পাঁচপাঁচটা দিন যখন কামাই হয়েইছে। আর দুটো দিনও হোক।

মা-র কথাটি কিন্তু সত্যিই ঠিক। মা বলেছিল, দেখিস বেরোলেই ভালো লাগবে। সত্যি। কী ভালো যে লাগছে রাহুলের।

রেলে চড়ার থেকে অনেক বেশি মজা এরকম সুন্দর বাসে চড়ে শুধু 'নিজেদের' লোকেরা হইচই করতে করতে যাওয়া। চলার পথের দু-ধারে কী সুন্দর দৃশ্য চলেছে। বাসের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, গান গল্প হাসি। যাঁদের সব কেবলমাত্র সিনেমার মধ্যে দেখেছে রাহুল তাঁদের শুধু জলজ্যান্ত চোখে দেখাই নয়, একসঙ্গে পথযাত্রা। চিত্ররথ সেন অবশ্য এর মধ্যে নেই।

তিনি আলাদা নিজের গাড়িতে পরে আসছেন। তাঁর সঙ্গে ক্যামেরাম্যান। আসিসট্যান্ট ক্যামেরাম্যান নাকি এই পেল্লায় দুটো বাসের মধ্যেরই একটায়।

বাবা! অতোবড়ো ছবিটার সামান্য একটুখানির জন্যেই এত লোক। এত ব্যবস্থা।...

'লোকেশান' ঠিক করে রেখে গিয়েছিলেন যিনি, তিনি নাকি আরও আগে এসে শুটিংস্পট-এর নিখুঁত ব্যাবস্থা করতে লেগেছেন।

'বঙ্কা মাস্টারের' ছেলেবেলার গ্রামের বাড়িটি ঠিক করা হয়ে আছে। তার

খেলার সাথিরাও সঙ্গে হাজির। বীরভূম জেলার এই ঝিলমিলপুর গ্রামটিই না কি আদর্শ ঠেকেছিল যিনি লোকেশান ঠিক করেছিলেন তাঁর। এসব কথা রাহুল সকলের কথার মধ্যে থেকে জানতে পারছে। বড়ো সুন্দর জায়গা। তা ছাড়া— কাছাকাছি একটা ওই 'নাটাইচণ্ডী' না কী ওই ধরনের মন্দিরও আছে। যেটা কাহিনির কাজে লাগবে।

বাস দুটো থামতেই রাহুল দেখল একটার মাথা থেকে বৃহৎ বৃহৎ সব হাঁড়ি কড়া ডেকচি বালতি গামলা নামছে। তার সঙ্গে রাঁধুনী ঠাকুররা।

এসব কী হবে? বিয়েবাড়ির মতন সব জিনিস। কারুর বিয়ে টিয়ে আছে নাকি?

একজন হেসে উঠে বলে, এই যে তোমাকে ধরে আনা হয়েছে বিয়ে দেবার জন্যে। আমরা নেমন্তন্ন খাব।

আঃ। যাঃ।

আরে বাবা, এতজনেরা এসে পড়লাম, থাকতে হবে ক-দিন, খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না?

এইখানে রান্না করে?

আরে একেবারে কী আর এই মাঠের মাঝখানে? বাড়ি-টাড়ি ঠিক হয়েছে। দেখবেই চলো।

চিত্ররথ তখনও এসে পৌঁছননি। অ্যাসিসট্যান্ট দিব্যবাবু, যাঁর সঙ্গে রাহুলের ছোটকার দোস্তি হয়ে গেছে, তিনি তো বারে বারেই দেখতে আসছেন। 'মাস্টার'! কিছু খাবে? কাম্পাকোলা? আইসক্রিম? চকোলেট?

আরে এখানে এসব কোথায় পাবেন?

সব পাওয়া যাবে হে। এ হচ্ছে 'সব পেয়েছির দেশ'। যে যা চাইবে তাই পাবে। না পেলে তুমুল কাণ্ড হয়ে যাবে না?...

একটা ইস্কুলবাড়ি দেওয়া হয়েছে। আরও দুটো বাড়িও। সবাই ছড়িয়ে পড়ে সেইসব দিকে চলে গেল।

হঠাৎ কে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

রাহুল দেখতে পায় তার আশেপাশে যে দু-চার জন ঘুরছে, তারা রাহুলের অচেনা। বোঝা যাচ্ছে ওরা অন্য বাসটায় ছিল। এরা কে? কী কাজে লাগবে তা রাহুল বুঝতে পারে না। একটা 'ছবি' করতে যে কত কত জনকে লাগে, তা তো দেখতেই পাওয়া যায়, ছবির আগে বা পরে নামের তালিকায়।...

কিন্তু হঠাৎ রাহুল কেন দলছাড়া হয়ে গেল?

দিব্যবাবুই-বা কোথায় গেলেন?

আসলে সকলেই 'চা চা' করে ব্যস্ত হয়ে কোনদিকে যেন এগিয়ে গেছে। আবার বিশেষজনদের একটু বিশেষ ব্যবস্থায় ভালো জায়গায় রাখতে নিয়ে গেছে।

রাহুলকে একটা বাড়ির যে-ঘরে বসতে দিয়ে গেছে, সেই বাড়িটা নেহাতই পাড়াগাঁয়ের মোটামুটি একটা একতলা পুরোনো কোঠাবাড়ি। ঘরটায় একখানা বড়ো চৌকি পাতা। তার ওপর কারা যেন নিজের নিজের বাক্স সুটকেস রেখে গেছে। রাহুল চৌকিটায় বসে পাশের খোলা জানলাটার দিকে তাকাল। ওখানে একটা কী যেন ঝাঁকড়া মতো গাছ। হাওয়ায় তার পাতারা দোলাদুলি করছে। আর মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে দমকা হাওয়া ছুটে ছুটে আসছে। হাওয়াটা কীরকম যেন চেনা চেনা।

রাহুলের মনে হল, এইরকম হাওয়া যেন আগে কত কতবার তার গায়ে এসে পড়েছে। ওই বাইরেটায় গিয়ে দেখবে রাহুল? কী আছে ওখানে? আগে কী কখনও এখানে এসেছে সে?

বাইরে বেরোতে সাহস হল না। যদি কেউ কিছু বলে। জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।... সেই চেনা চেনা হাওয়া আর বাইরের দৃশ্যটাও যেন কতবার দেখা।

ভারি অন্যমনস্ক হয়ে যায় রাহুল।

কবে এসেছি? নিশ্চয় খুব ছোটোবেলায়। কিন্তু কার সঙ্গে? বাবা তো এখানের নাম শুনে বললেন, 'ঝিলমিলপুর'। জায়গাটা কোথায়? আর মা বললেন, আমাদের বাংলা দেশে কত সুন্দর নামের গ্রাম ছড়িয়ে আছে। যেন কবিদের রাখা নাম।

কই, কেউই তো বললেন না, 'হ্যাঁ আমরা একবার গিয়েছিলাম ওখানে।'

তাহলে? কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে যায় রাহুল।

ভাবতে ভাবতে ক্রমেই অন্যমনা হয়ে যাচ্ছিল রাহুল, হঠাৎ দেখল, সামনের ওই গাছতলার কাছটায় মস্ত একখানা দামি গাড়ি থামল। আর তার থেকে নেমে এলেন চিত্ররথ সেন।

বাবাঃ। এতক্ষণ যেন বাঁচল রাহুল।

এঁকেই তো সব থেকে চেনে রাহুল। এঁকেই তো ভীষণ ভালো লাগে।

চিত্ররথ নামবার পর নামলেন, খুব সাজগোজ করা একটি মহিলা, আর ইস! ভাবা যায় না; নামলেন প্রসূনকুমার।

রাহুলের এখন আর এক রকমের আচ্ছন্নতা! ক্লাসের বন্ধুরা যা বলেছিল

তাই। খুব লাকি রাহুল। না হলে প্রসূনকুমার চিত্ররথ সেন-এর সঙ্গে কথা বলতে পারছে। কাছে বসতে পারছে। রাহুল দেখতে পেল গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গেই এদিক ওদিক থেকে দলের বেশ ক'জন ছুটে এলো। বর্তে যাওয়া বর্তে যাওয়া ভাবে চিত্ররথের সঙ্গে কথা বলল। উনি কী একটা বললেন, আর তক্ষুণি একজন ছুটে এসে রাহুলকে বলল, ওদিকে যেতে হবে। ডাকছেন!

ডাকছেন আর কে? ওই ডিরেক্টরমশাই-ই ডাকছেন।... ইস্। ভাগ্যিস রাহুল জানলায় দাঁড়িয়েছিল। তাই না রাহুলকে দেখতে পেলেন উনি।... না হলে হয়তো উনি অন্যদিকে চলে যেতেন, আর পরে হয়তো রাহুলের খোঁজ করলে, লোকে তাকে খুঁজে খুঁজে নিয়ে যেত। সে কত পরে কে জানে।

রাহুল গিয়ে দাঁড়াতেই চিত্ররথ বেশ দরাজ গলায় বলে উঠলেন, দেখো তো এদের কাণ্ড। তোমাকে এখানে একা বসিয়ে রেখে সবাই চলে গেছে। দিব্যবাবুই-বা কোথায়?

একজন ঘাড় চুলকে বলল, মানে আপনার জন্যে অপেক্ষা করা হচ্ছিল। কোথায় রাখা হবে এনাকে ঠিক করতে না পেরে— উনি রাহুলের চুলে একটু হাত ঠেকিয়ে সেইভাবেই দরাজ গলায় বললেন, কোথায় আবার রাখা হবে? আমাদের সঙ্গেই থাকবে। ছেলেমানুষ, অনেকের সঙ্গে হয়তো সুবিধে বোধ করবে না।... কী বলো প্রসূন? আমাদের সঙ্গে 'লজ'-এই চলুক? তুমি তোমার ছেলেবেলাটা'কে পরিত্যাগ করে চলে গেলেও, 'ছেলেবেলাটি' কিন্তু তোমার সঙ্গে থাকবে।... আর এই যে মিসেস ব্যানার্জি, এই হচ্ছে আপনার 'ছেলে'। বন্ধু!

কাহিনি অবশ্যই তাঁর জানা। তাই হাসলেন একটু।

রাহুলকে ওঁদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে, আগের লোকেরা যেখানে যেখানে রয়েছেন, সেখানে এক একবার দেখা করে এটা ওটা নির্দেশ দিয়ে, আবার গাড়িতে উঠলেন চিত্ররথ সেন।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

রাহুল শুনতে পেলো বোলপুর লজ যাচ্ছে তারা।

জানা জায়গা।

এখানে—লজ-এ!

এ একেবারে অভ্যস্ত ধরন। বাবা, মা-র সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে কত সময় হোটেলে উঠতে হয় রাহুলকে, এই লজ-এ ও একবার এসেছিল।

এখন বেলা পড়ে গেছে। এখানেও হয়তো বাইরে থেকে দমকা হাওয়া

আসছে তবে মাথার উপর জোর পাখা চলছে বলে বাইরের হাওয়া বোঝা যাচ্ছে না।

বিকেলের চা-টা খাওয়ার পর এঁরা দু'জন ছবির ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করতে থাকেন। মিসেস ব্যানার্জি না কে যাঁকে বলা হয়েছিল, 'এই যে এই আপনার ছেলে 'বঙ্কু'। তিনি বেশি কথা বলেন না। তিনি নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করছেন।

প্রসূনকুমার বললেন, কাল পর্যন্ত দু-দিন তো আমার কোনো শুটিং নেই। আমি এই দুটো দিন শান্তিনিকেতনটা ঘুরে আসি।

আসলে এই ঝিলমিলপুরে নায়কের ছেলেবেলার ঘটনাই বেশি। শুধু রাহুলের এলেও চলত হয়তো। কিন্তু সার্কাস দল থেকে পালিয়ে আসা 'বঙ্কু মাস্টারের' ঘরে ফেরার দৃশ্যটাও তো এইখানেই। সবরকম পরিবেশ সৃষ্টি করে সেটা ঠিক করে রাখা হচ্ছে যখন, ঝিলমিলপুরের একটা গ্রাম্য গরিবের বাড়িতে, তখন প্রসূনকুমারের কাজটাও সেরে নিতে হবে। ছবির বাকিটা তো তাঁর ওই সার্কাস দলের সঙ্গে।... সে আবার কোথায় না কোথায় হবে কে জানে। রাহুল এঁদের আলোচনা শুনছে, আর ভাবছে, বাবাঃ! একটা 'ছবি' করতে এত কাণ্ড। আর আমরা মনেব আনন্দে হল-এ বসে, কি ঘরে বসে টি ভি-তে দেখি।

একটা জিনিস লক্ষ করছে রাহুল, চিত্ররথ সেন, কখনও কোনো সময় দারুণ গম্ভীর, কম কথা বলেন, হাসেন না বললেই চলে। আবার কখনও দিব্যি হালকা মেজাজে, হাসিখুশি ভাবে কথা বলেন। এখন সেই হালকা মেজাজ। প্রসূনকুমার দু-দিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে যেতে চান শুনে বলে ওঠেন, ঠিক আছে। ঘুরে এসো। তোমার তো আবার ওখানে আলাদা টান। ছেলেবেলাটার অনেকখানিটা ওখানেই কেটেছে, তাই না?

প্রসূনকুমার কিছু বলবার আগেই রাহুল চমকে উঠে বলে, বাঃ। ছেলেবেলাটা তো ওই 'ঝিলমিলপুরে'। ওখানেই তো জন্মেছেন উনি।

ওখানেই জন্মেছি। ওই হিলবিলপুর না ঝিলমিলপুরে?

একটু চমকে গিয়েই বেশ জোরে হেসে ওঠেন প্রসূনকুমার, আমি জন্মাতে যাব কী দুঃখে? সে তো এই 'অভাগা' ছবির নায়ক 'বঙ্কা মাস্টার'। যেখানে তুমি এখন যাচ্ছ তার ছেলেবেলা হতে। তোমার নাম অবশ্য বঙ্কু।

রাহুল আনমনাভাবে বলে, হঠাৎ আমার যেন কী রকম গুলিয়ে গেল। মনে হল—

চুপ করে গেল।

চিত্ররথ বললেন, তা গুলিয়ে যেতে পারে। প্রথম তো?... তো এত কাছে এসে তুমি, ইয়ে, তুমি কখনও শান্তিনিকেতনে এসেছ?

রাহুল এখন একগাল হেসে বলে, হ্যাঁ—। কতবার। ফি বছরই তো পৌষমেলার সময় আসা হয়।

তাই বুঝি? গুড। তো প্রসূন তুমি তো যাচ্ছ। তোমার 'ফ্যান'দের ভক্তির ধাক্কা সামলে হাত-পা চারটে আস্ত নিয়ে ফিরতে পারবে তো?

প্রসূন একটু বিষন্ন হাসি হাসলেন, ওই তো। ভক্তির দাপটে, আমার 'আমি'- টাকে আর এখন খুঁজে পাই না। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে-টেড়ে কোথাও পালাই।

রাহুল শুনে 'হাঁ' হয়ে যায়। লোকেরা ভক্তি করে বলে পালাতে ইচ্ছে করে? রাহুল আর থাকতে পারে না, বলে ওঠে, 'ফেমাস' হতে আপনার ভালো লাগে না?

প্রসূন হেসে বলেন, 'ভালো লাগে না' বললে, মিছে কথা বলা হয়। তবে 'ফেমাস' হওয়ার ঠ্যালা বড়ো বেশি।

রাহুল গম্ভীরভাবে বলে, আমি তাহলে কক্ষনও ফেমাস হতে চাই না। চিত্ররথ প্রসূন দু-জনেই হেসে ওঠেন। তুমি না চাইলেও, তোমার ভক্তরা তোমায় 'ফেমাস' করে ছাড়তে পারে।

ইস। আমি আর কক্ষনও সিনেমা করবই না। কী করে করবে? ফেমাস?

দুজনেই একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন। যার অর্থ ছেলেটি বয়েসের অপেক্ষা একটু বেশি সরল।

চিত্ররথ এখন গম্ভীর হয়ে বললেন, সে তো সত্যি! এখন তো পড়াশুনো করবে মন দিয়ে।... আচ্ছা ঠিক আছে। প্রসূন তাহলে কাল আর্লি মর্নিং-এ আমরা বেরিয়ে পড়ছি। তুমি শান্তিনিকেতনে যাচ্ছ এই তো? ভাবনা মিসেস ব্যানার্জিকে নিয়ে। উনি আবার বেশি ভোরে উঠতে পারেন না শুনি।

প্রসূন কৌতুকের হাসি হেসে বলেন, বাঃ। এখন না পারলে চলবে কেন? গ্রামের মেয়ে, ভোরে উঠে গো সেবা করতে হবে, ঘুঁটে দিতে হবে, গোরুর খড় কাটতে হবে, তাই না?

রাহুল তো শুনে 'থ'।

ওই দারুণ সাজাগোজা 'ফ্যাশান ফ্যাশান' মহিলাটি খড় কাটবেন? ঘুঁটে দেবেন? ধ্যাৎ।

উত্তেজনায় রাতে ঘুমই আসে না রাহুলের। শুটিং জিনিসটা কী তা দেখা যাবে। পরে বন্ধুদের কাছে বলতে হবে।

বেরোতে হল খুবই ভোরে ভোরে। কথা আছে প্রথমে গিয়ে সেই স্কুলবাড়িটায় উঠে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে, 'মেকআপ' সেরে চলে যেতে হবে শুটিঙে।.. রাহুলকে নাকি মালকোঁচা মেরে ধুতি পরে, খালি গায়ে গ্রামের ছেলে সাজতে হবে।

এখন যেন ভেবে কেমন অস্বস্তি হচ্ছে। কী জানি, ঠিকমতো পারবে কিনা। রিহার্সালের সময় তো চিত্ররথ খুব খুশি হয়েছিলেন। বেরিয়েই কিন্তু ওই ভোরের হাওয়াটা গায়ে লাগতেই রাহুলের আবার মনে হয় এই হাওয়া যেন কতবার তার গায়ে লেগেছে।... শান্তিনিকেতনে গিয়েও তো দেখেছে, কলকাতার থেকে যেন অন্যরকম হাওয়া। সে একরকম।

কিন্তু এ যেন অন্যরকম।

যেন চেনা চেনা।

গাড়িতে ওঠার সময় মুখচোরা রাহুল হঠাৎ মুখ ফুটে আস্তে বলে উঠলো, আমি জানলার ধারে বসবো।

তা এটা আশ্চর্যের কিছু না। ছোটো ছেলেমেয়েরা সকলেই সবসময় গাড়ির জানলার ধারেই বসতে চায়। তবে এই রাহুল ছেলেটি এত ভদ্র মার্জিত, যে এভাবে ওই 'চাওয়াটা' আশ্চর্যই লাগে। আসলে তো ছেলেমানুষই।

মনে মনে হাসলেন একটু চিত্ররথ সেন।

কিন্তু তারপর?

তারপর আর ঠিক 'হাসির পরিস্থিতি আসছে কই?

'বোলপুর লজ' থেকে ওই 'ঝিলমিলপুর' বেশ খানিকটা পথ। তবে সকালের নির্জন পথ, আর স্বভাবতই গ্রামের নির্জনতা, তাই পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না। 'সময়' জিনিসটা এঁদের কাছে এখন সোনারুপোর থেকে দামি। দু-তিন দিনের মধ্যে এখানের কাজ শেষ করে ফেলা চাই।

চলছেন, ভাবতে ভাবতে চলছেন পরিচালক তাঁর চিন্তার জগতের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে। গল্পটা তাঁর নিজের লেখা, চিত্রনাট্যও নিজের... তাই প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে ভাবতে হচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠলেন, একটা অস্বাভাবিক উল্লাসের কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে হাত-তালির শব্দে।

কী হল?

কে বলে উঠল, 'কেল্লা ফতে! আ গিয়া!'

এ-গলা কার? রাহুলের? আশ্চর্য তো।

অথচ দেখতেই পেলেন, রাহুল সিট থেকে, প্রায় উঠে পড়ে, জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলে চলেছে।... আ গিয়া! আ গিয়া! এসে গেছি।

প্রসূনকুমার, মিসেস ব্যানার্জি, চিত্ররথ তিনজনেই ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন।

এত উল্লাসের কী হল? এ যে প্রায় 'খেলা' দেখবার সময়কার মতো আত্মহারা ভঙ্গী!...

খুবই বিস্ময়ের।

আস্তে গম্ভীরভাবে, তবু দৃঢ়স্বরে জিগ্যেস করলেন চিত্ররথ, কী হল মাস্টার রাহুল? হঠাৎ কী দেখে এত স্ফূর্তি?

রাহুল ওর দিকে না তাকিয়েই বলে উঠল, বাড়ির কাছে এসে গেলাম তো!... ওই তো ওই অশ্বত্থতলার পাশ দিয়ে একটু গেলেই—

চিত্ররথ অবাক হয়ে বললেন, বাড়ি? কোন বাড়ি? এখানে তোমার চেনাজানা কারও বাড়ি আছে নাকি?

রাহুল তখনও তাকালো না। অগ্রাহ্যের গলায় বলল, চেনাজানা আবার কী? নিজেদের বাড়িই তো।

চিত্ররথ আরও শান্ত গলায় বললেন, নিজেদের বাড়ি কী করে হবে? তোমাদের নিজেদের বাড়ি তো কলকাতায় ফার্ন রোডে। যেখানে তুমি থাকো। এখানে কি 'দেশের বাড়ি'? কেউ থাকেন?

রাহুল হঠাৎ যেন চুপসে গেল।

বলল, হঠাৎ মনে হলো, এইটাই বোধহয়—এখানেই আমি চিরকাল—আমার যেন সব কীরকম গুলিয়ে যাচ্ছে।

চিত্ররথ ওরই পিঠটা ঠুকে দিয়ে শান্তভাবে বললেন, গুলিয়ে গেলে তো চলবে না রাহুলবাবু। তোমায় এখন বঙ্কু হয়ে ডানপিটেমি করতে হবে। মেলার মাঠে ঘুরতে হবে।

মেলার মাঠে ঘোরাটা অবশ্য একটি কারসাজিতে আগেই হয়ে আছে। কোনো একটা গ্রামের কীসের যেন মেলার ছবি তোলা আছে। মানে নাগরদোলা,. চরকিপাক, পাঁপড় ভাজার দোকান, ভালুক নাচ, এটা ওটা দোকান, এসব তো এই ধরনের মেলার চিরকালের অঙ্গ। সেই ছবির খাঁজে খাঁজে এক আধবার 'বঙ্কু'কে আলগাভাবে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যাবে।

ওটা চিত্ররথ উল্লেখ করলেন রাহুলকে ধাতস্থ করতে। প্রথম থেকে তো ছেলেটিকে একবারও এরকম দেখেননি।

রাহুল আস্তে বলল, ফার্ণ রোড।

হ্যাঁ যেখানে তোমার মা বাবা রয়েছেন।

তারপর একটু হেসে বললেন, এখানে অবশ্য ছবিতে— এই ইনি তোমার 'মা' হচ্ছেন।

মিসেস ব্যানার্জির দিকে তাকাল, আর একটু হাসেন।

হাসেন, তবে ঈষৎ যেন চিন্তিতও থাকেন পরিচালক। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তা একটু বুঝি বোঝা গেল খানিক পরে।

'মেকআপ ম্যান' প্রাণকেষ্ট এসে গলা নামিয়ে বলল, ছেলেটির হেড অফিসে কি একটু গণ্ডগোল আছে স্যার?

চিত্ররথ চমকে বলেন, কেন বল তো?

'মেকআপ' তো নিতেই চায় না। বলে, আমি যাত্রাদলের লোক নাকি? তাই এইসব রং-টং মাখতে হবে? আবার ধুতিখানা পরিয়ে দিতে যাওয়ায় সেটাকে খ্যাঁস করে আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, 'ধুতি আবার পরিয়ে দেবেন কী? আমি কি একটা কচি খোকা?' আজকাল তো স্যার বুড়ো ধাড়িরাও ধুতি পরতে জানে না। বিয়ের বর পাঁচজনের সাহায্যে ধুতি পরে কোমরে বেল্ট আঁটে। আর এ-ছেলে কিনা—

চিত্ররথ চিন্তিতভাবে বললেন, পারলো?

পারলও তো। দিব্যি মালকোঁচা সেঁটে নিলে। আমি বলছি— ব্রেনের কিছু ডিফেক্ট আছে।

দিব্যবাবুও কাতর কাতর মুখে বললেন, এই তো কতদিন দেখছি, কালও বাসে আসার সময় দেখলাম চমৎকার ছেলে। কী 'সোবার'। অথচ এখন—

প্রাণকেষ্ট বলে উঠল, তাহলে আর দেখতে হবে না। যা বোঝবার বুঝে নিয়েছি।

কী বুঝলে?

পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার তো! হঠাৎ কোনো অপদেবতা ভর করেছে। বাজে কথা বোলো না প্রাণকেষ্ট। বেশ মুশকিল লাগছে। দিব্য! আমাদের প্রথম শটটা কী?

ওই তো— সকালের অ্যাটমোসফিয়ার। বাবা গোয়াল থেকে গোরু বার করে একটা রাখাল ছেলের হাতে সঁপে দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। মা উঠোনে বসে খড় কুচোচ্ছে।... ছেলে এল ছুটতে ছুটতে।

মা, মা, মেলার মাঠে কাল রাত্তিরে একটা সার্কাস এসে তাঁবু গেড়েছে।

বাঘসিংঘী হাতি-টাতি কত কী এসেছে। ওরা সব্বাই যাচ্ছে। এখন থেকে টিকিট কিনে রাখতে হবে। একটাকা করে টিকিট, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে। দাও টাকা।

মা বলল, আমি টাকা কোথায় পাবো? তোর বাপকে বললি না কেন?

ছেলে বলল, বাপকে বলতে আমার ভালো লাগে না। যা রাগী। তুমি দেবে কি না বলো?

বলেই মা-র পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে গলা ধরবে। মা বলবে, ছাড়। ছাড়। বঁটি কাটা পড়ব যে—

এইটাই আজকের শুরু। ঠিক হয়ে আছে তো। কিন্তু ছেলেটা কী করবে বুঝতে পারছি না।

চিত্ররথ চিন্তিতভাবে বলেন, স্ট্রেঞ্জ! এতগুলো দিন দেখছি। অতি চমৎকার করছে। আর অতি চমৎকার ছেলে। চট করে বুঝে নিতেও পারে—হঠাৎ এই মোক্ষম সময় এরকম—

প্রাণকেষ্ট বলে ওঠে, ওই তো বললুম স্যার। 'কিছুতে' পেয়েছে।

আঃ প্রাণকেষ্ট তোমার বাজে কথা থামাবে? শিশিরবাবু কোথায়?

কোথায় আর? তাঁর গন্ধমাদন পাহাড়টি নিয়ে লরিতে বসে রয়েছেন। আপনাদের 'আউট ডোর' তো স্যার একখানা রাজসূয় যজ্ঞ। তো সেটি এখন দক্ষযজ্ঞয় না দাঁড়ায়।

চিত্ররথকে সবাই ভয় করে। ওঁর সামনে এলোমেলো কথা বলতে সাহস করে না। বাদ ওই প্রাণকেষ্ট।

ওর পেটে কানাকড়ির বিদ্যে নেই, কিন্তু যে বিদ্যেটি নিয়ে 'করে খাচ্ছে' সেটিতে একেবারে ওস্তাদ। তাই ওর এত আদর, ওকে ছাড়া আর কাউকে পছন্দ করে না আর্টিস্ট্রা।

কিন্তু ওই। বাক্যবাগীশের রাজা। স্বয়ং ডিরেক্টরের সামনেও বাক্যবাগিশতা।

ক্যামেরাম্যান শিশিরবাবু তো অবস্থা দেখে বিভ্রান্ত।

দিব্যবাবুর মাথায় হাত।

ছেলেটা কোথায় ঠিকমতো এসে মুখস্থ করা সব ডায়লগ-টায়লগ বলবে, ফটো নেওয়া হবে, তা নয়, বাড়ি ঢোকার মুখেই বলে ওঠে কি না, 'তেঁতুল গাছটা কী হল? এখানে যে একটা মস্তবড়ো তেঁতুলগাছ ছিল।'

এ আবার কী? এখানে তো তুই জীবনে এই প্রথম এলি।

কে যেন বলল, ছিল না কি?

রাহুল রাগের গলায় বলল, ছিল না তো, মা কি দিয়ে গুড় মেখে মেখে

আচার বানায়? পাতা দিয়ে টক ঝোল রাঁধে? ঝড়ের সময় যখন এত এত পাতা ঝরে, তাই দিয়ে টক ঝোল রাঁধে না মা? এক্ষুনি দেখে গেছি, আর এক্ষুনি নেই? কে কেটে উড়িয়ে দিয়ে গেল?

বলতে বলতে চিরচেনার মতো বেড়ার দরজাটা ঠেলে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে ডাক দেয়! মা! মা! তেঁতুল গাছটা কী হল? আঃ মা। কোথায় তুমি? দরকারের সময় কোথায় যে থাকো?

ছবির দৃশ্যের প্রয়োজনে তখন সেই 'অতি আধুনিকা' মিসেস ব্যানার্জি একখানা বেঁটে মোটা নীল ডোরা ডুরে শাড়ি আঁটোসাঁটো করে পরে উঠোনের একধারে বসে আছেন প্রকাণ্ড একখানা বঁটির সামনে খড় কুচোবার ভঙ্গিতে।... দিব্য কী ভেবে বলে ওঠে, ওই তো তোমার মা। খড় কুচোচ্ছেন।

কী? উনি আমার মা? রোসো দেখাচ্ছি মজা। রাহুল সেই দিকে তাকিয়ে আরও রাগের গলায় বলে ওঠে, 'আমার সঙ্গে ঠাট্টা? কে উনি? আমার মা কি এরকম রংরং শাড়ি পরেন? মোক্ষবুড়ির মতন সাদা শাড়ি পরেন না?... মা। মা।... দুমদুম করে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে দাওয়ায় উঠে একটা ভাঙা ভাঙা ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে বলে ওঠে, 'একী? রান্নাঘরটা কে ভাঙল? মা-র উনুন-টুনুন কোথায় গেল? ওরে বাবারে—আমি একটুখানি গিয়েছি। আর সব কী হয়ে গেল।... মা। তুমি কই?' দাওয়ার ওপরকার ঘরটার মধ্যে ঢুকে পড়ে ভাঙা ভাঙা গলায় আরও চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমাদের বিছানাটা কোথায় গেল?... জিনিসগুলো কী হল?'

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বেরিয়ে আসে।

চারদিকে তাকায়।

আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'পাখিটা কই? খাঁচার পাখিটা? আমাদের সব কোথায় হারিয়ে গেল?'

এঁরা ব্যস্তভাবে ওর কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে বলেন, 'শোনো, শোনো, বলছি সব। এসো আমাদের কাছে।'

রাহুল গ্রাহ্য করে না। বলে, 'তোমরা কে? তোমরা আমাদের বাড়িতে এসেছ কেন? তোমরাই বুঝি সব নষ্ট করে দিয়েছ। চলে যাও বলছি।... মোক্ষবুড়ি! মোক্ষবুড়ি। দেখ তো কারা সব এসে— কি কাণ্ড করছে। এখনো গোয়ালে বসে আছ? মোক্ষবুড়ি, আমার মা কী মরে গেছে?'

বলে দাওয়া থেকে নেমে ছুটে উঠোনের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় এবং 'ওই তো মোক্ষবুড়ি' বলে দৌড়ে চলে যেতে গিয়ে দারুণ একটা আছাড়

খায়। তার সাধের মালকোঁচার আগাটা খুলে গিয়ে পায়ে জড়িয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি।

কিন্তু তারপর? তারপর এমন কী হল যে চিত্রপরিচালক চিত্ররথ তাঁর তল্পিতল্পা গুটিয়ে সেইদিনেই কলকাতায় ফিরে গেলেন? প্রাণকেষ্ট বলেছিল, 'আপনার আউটডোর' তো কর্তা একখানা রাজসূয় যজ্ঞ।'

কথাটা তো নেহাত ভুল নয়। যত খরচ, তত তোড়জোড়। তত হাঙ্গামা।... তার সবই জলে গেল। কোনো কাজ হল না। তাহলে কি হঠাৎ 'ভূতে পাওয়ার' মতো হয়ে যাওয়া রাহুল নামের ছেলেটা পড়ে গিয়ে মারা গেল?

ডিরেক্টর, অ্যাসিসস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান ইত্যাদি করে যত দামি দামি জনেরা তখনই চলে গেছেন গাড়িতে। অন্যেরা ক্রমশ সেই বাসে চেপে যাচ্ছে সেইসব লটবহর নিয়ে। অবস্থার চেহারা যেন মেলা ভেঙে যাওয়ার পর ভাঙা হাটের মতো। সবাই ক্লান্ত, বিষণ্ণ, চুপচাপ!

প্রসূনকুমার অবশ্য এসবের কিছুই জানেন না।

তিনি তার পরদিন শান্তিনিকেতন থেকে 'লজ'-এ ফিরে অবাক। তাঁর জন্যে সেখানে অপেক্ষা করে বসেছিলেন সহকারী কোষাধ্যক্ষ।... 'লজ'-এর বিল-টিল মিটিয়ে প্রসূনকুমারকে উচিত মতো মান্য-টান্য-র সঙ্গে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তাঁর।

প্রসূনকুমার হতভম্ব হয়ে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে সব শুনে তারপর ভয়ে ভয়ে বললেন ছেলেটি কী?—

না না। মারা-টারা যায়নি। পড়ে গিয়ে হাঁটু-ফাটু ছড়ে গিয়ে একটু রক্তপাত হয়েছে। তো সে এমন কিছু না। আসলে ছেলেটি পড়ে যাওয়ার পর থেকে কোনো কথা বলছে না। শুধু বড়োবড়ো চোখ মেলে তাকিয়ে থাকছে, কথা বললে উত্তর দিচ্ছে না। যেন কাউকে চিনতে পারছে না। অথচ শুনতে পাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে।... জল খেতে বলা হলো জল খেলো।... বলা হল কলকাতায় ফিরে যেতে হবে, জামা-টামা পরে নাও, পরে নিল—কোনো প্রশ্ন করল না। গাড়িতে উঠতে বলায় উঠেও পড়ল। মাথায় ধাক্কা খেয়ে বোবা-টোবা হয়ে গেল কি না, এই ভাবনা। ভালোরকম পরীক্ষা করাতে হবে।

প্রসূনকুমার নিজস্ব ভঙ্গিতে হাত দুটো ওলটালেন। যে-ভঙ্গিটিতেই প্রসূনকুমার আরও ফেমাস।

তারপর আর কী?

তাঁকেও ফিরে আসতে হল কলকাতায়।

সবে রাতের খাওয়া সেরে রাহুলের ছোটকা একখানি বই হাতে নিয়ে আরাম করে শুতে যাচ্ছে, হঠাৎ টেলিফোনের ঝনঝনানি। কী ব্যাপার? কে বলছেন? অ্যাঁ আপনি? বলেন কী? ইস!... কীভাবে? কখন? এখন কী অবস্থা? ডাক্তার কী বলেছে?

রাহুলের বাবাও শোবার জন্যে তোড়জোড় করছিলেন। তোড়জোড় আর কী, বারান্দার চেয়ারে অন্ধকারে বসে পরপর দু-টি সিগারেট শেষ করা। এইটি তাঁর ঘুমের তোড়জোড়।

টেলিফোনের শব্দটা শুনেই কান খাড়া করেছিলেন। এত রাতে কে ফোন করছে? রাত দশটা বেজে গেছে। কে হতে পারে? বুজুমের বন্ধু-টন্ধু কেউ বোধ হয়। ছোটভাইকে নিজে ডাক নাম দিয়ে তিনি 'বুজুম' বলেন।

কিন্তু বন্ধু বলে তো মনে হচ্ছে না।

পরপর এতো প্রশ্ন চালিয়ে যাচ্ছে বুজুম?

উঠে এলেন।

এসে শুনলেন রিসিভার নামিয়ে রাখবার আগের কথাটা বলছে বুজুম। 'আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।... আচ্ছা ছাড়ছি।'

কৌশিক উদ্‌বিগ্নভাবে বলেন, ব্যাপার কী রে বুজুম? এত রাতে কে?

বুজুম হতাশভাবে বসে পড়ে বলে, ভাবার বাইরে। ফোন করছেন চিত্ররথ সেনের অ্যাসিসস্ট্যান্ট দিব্য ঘোষ।

কী বলেছে? কোথা থেকে বলছে? অ্যাঁ? ওরা তো সেই কোথায় যেন—

হ্যাঁ আউটডোর শুটিঙে গেছল—

বুজুম চট করে দাদাকে খবরটা দিতেও ভয় পাচ্ছে, তবু না বললেও তো চলবে না। তাড়াতাড়ির ভান দেখিয়ে হালকাভাবে বলে, 'আর বোলো না। অভাবিত ব্যাপার। বলছে, 'বেলভিউ নার্সিংহোম' থেকে। রাহুলটা নাকি শুটিঙের সময় হঠাৎ কীভাবে পড়ে যায়। মাথায় বোধ হয় একটু চোট লেগেছে— তাই ওকে নিয়ে চলে এসেছেন ডিরেক্টর। একেবারে নার্সিংহোমে ভর্তি করে, আমাদের খবর দিচ্ছেন।'

কৌশিক রায় বসে পড়েন।

বলেন, 'জানতাম। আমি জানতাম এরকমই কিছু একটা হবে। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ কিনা ছেলেটাকে রাস্তা থেকে ধরে সিনেমার হিরো

বানাতে নিয়ে গেল! মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে বোধ হয়?... বলি প্রাণে বেঁচে আছে, নাকি শেষ হয়ে গেছে?' বুজুম বলে, আঃ কী যা তা বলছ? বলল, সামান্যই পড়ে গেছে। শুধু—

সামান্যই পড়ে গেছে?

রাহুলের বাবা বসে থাকা থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বলেন, 'সেই কথা বিশ্বাস করতে হবে? ওদের ওই বৃহৎ কাণ্ডের সব ভেস্তে ফেলে, কলকাতায় ফিরে এল, তোর ভাইপো 'সামান্য একটু' পড়ে গেছে বলে? সামান্য হলে এসে একেবারে নার্সিংহোমে তোলে?'

বুজুম বলে, স্থির হয়ে শোনো তো। বলছে, মাথা ফাটাফাটির কোনো ব্যাপারই নেই! জ্ঞান সম্পূর্ণই রয়েছে। শুধু কথাটা ঠিক মতো বলছে না, আচমকা শক খেয়ে হয়তো। নিজেদের কাজের ক্ষতি করেও নিয়ে এসেছে। যতই হোক একটা পরের ছেলেকে নিয়ে গেছে, দায়িত্ব আছে তো?... যাক আমি যাচ্ছি। দেখি কী ব্যাপার। তবে বোধ হয় কিছু টাকা সঙ্গে নিলে ভালো হয়। বাড়িতে আছে কিছু?

বাড়িতে বেশি টাকা আজকাল আর কেউ রাখে না। তবু রাহুলের বাবা বললেন, থাকতে পারে কিছু। বার করে নিচ্ছি। তুই তাহলে একটা ট্যাক্সি দেখ। বেরিয়ে পড়া যাক। ঠিক বলছিস সত্যি সেন্স আছে? মাথা ফাটে নি?

বলল তো তাই দিব্য ঘোষ। কিন্তু তুমিও যাবে নাকি?

আমি যাব না? বলিস কী? অ্যাঁ?

রাহুলের ছোটকা কপিল শান্তভাবে বলে, সে তো ঠিক। তোমার মনের অবস্থা তো— তবে দুজনে যাওয়া মানে তো বাড়িতে চাবি লাগিয়ে যাওয়া? যা দিনকাল! এসে হয়তো দেখা যাবে বাড়ি ফরসা।... তাহলে আমিই থাকি, তুমিই যাও। ঠিক কি অবস্থা দেখে এসো। টাকাটা দিতে চেষ্টা কোরো।

আমি একা?

আঁতকে ওঠেন কৌশিক। আমি তো ভালো করে জানিই না তোদের 'বেলভিউ'টা কোথায়। তা ছাড়া আমায় চেনে কে? তোর সঙ্গেই ওদের ভাব হয়েছে—

তাহলে?

তাহলে আর কী, তুই একাই যা। এই সময় যে তোর বউদি—এইজন্যেই বলে বিপদ একা আসে না।

কপিল বলে, বউদি এসময় না থাকাটা বোধ হয় বিপদ নয় দাদা, ভালোই। বউদি হঠাৎ এরকম শুনলে কী করত কে জানে?

তা যা বলেছিস, কথাটা ঠিক। পাগলের মতো এক্ষুনি ছুটে না গিয়ে ছাড়ত না।

কিন্তু রাহুলের মা নেই কেন? কোথায় গেছেন?

সে এক তুচ্ছ ব্যাপার বললেই হয়।

মামাতো দিদির মেয়ের বিয়েতে দিন তিনেকের জন্যে মালদায় গিয়েছেন। সাতজন্মেও এমন যান না রাহুলের মা। সংসার নিয়েই তন্ময় থাকেন। মামাতো দিদি তো দূরের কথা, নিজের দিদির মেয়ের বিয়েতেই বদ্যিবাটি থেকে সেইদিনই ফিরে এসেছিলেন। দিদির তাতে কী অভিমান।

কিন্তু এবারে রাহুলকে পাঠিয়ে দিয়ে পর্যন্ত তাঁর মন এমন খাঁ খাঁ করছিল, যে, হঠাৎ এই নেমন্তন্নটা পেয়ে যেন বর্তে গেলেন। রাহুল না থাকা বাড়িতে থাকা যে এত কষ্ট, কে জানত?

'ঠিকে' কাজের মেয়েটাকে একটু রান্না-টান্না করে দেবার জন্যে বলে, এবং নিজেও ভালো ভালো কিছু রেঁধে ফ্রিজের মধ্যে ভরে রেখে দিয়ে অন্যসব মাসতুতোদের দলে ভিড়ে চলে গেছেন রাহুলের মা। রাহুলের কাকা বলছে, গেছে ভালোই হয়েছে দাদা।

কৌশিক বললেন, তাহলেও চলে আসার জন্যে বলে দিবি না বুজুম?

বুজুম বলল, কীভাবে বলব ওদের কি টেলিফোন আছে? না তার নম্বর জানা আছে আমাদের?

আহা টেলিগ্রামও তো করে দেওয়া যায়।

বুজুম বলল, তা অবশ্য যায়। তবে টেলিগ্রামটা সেখানে পৌঁছবার আগেই বউদি এখানে চলে আসবে। সোমবারই তো আসার কথা! তবে আর কী হবে। টেলিগ্রাম যে আজকাল সবসময় চটপট পৌঁছয় এমন তো নয়।

বুজুম বলল, ওসবে কোনো দরকার নেই। এখন তুমি ভালো করে দরজা-টরজা বন্ধ করে থাকো। আমি দরজার চাবিটা নিয়ে যাচ্ছি। তোমায় আর খুলতে যেতে হবে না। দেখি গিয়ে কী ব্যাপার!

কিন্তু গিয়ে কী দেখল কপিল? দেখতেই পেল না! তো 'কীরকম'। নাঃ। রোগিকে এখন এত রাতে দেখতে দিতে চাইল না নার্সিংহোম। তবে কপিল গিয়ে জানল, সবই ভালো আছে। ঠিকমতো খেয়েওছে। শুধু কথা বলছে না বলেই ভাবনাটা রয়ে গেছে। এখন মাথায় 'এক্সরে' করে দেখতে হবে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে কি না।

দিব্যর সঙ্গে কপিলের তো ভাব হয়ে গিয়েছিল আগেই।

দু-জনে একটা গাড়িতেই ফিরল।... দিব্যর সুইন হো স্ট্রিট কপিলের ফার্ন রোড।

গাড়িতে কথাটা জিজ্ঞাসা করলো কপিল, আচ্ছা হঠাৎ পড়লো কী করে?

দিব্য একটু হেসে বলল, সে বলতে গেলে, স্রেফ রূপকথার গল্পর মতো শোনাবে। অন্তত এ-যুগে সে-কথা কারোর বিশ্বাসযোগ্য নয়।... তবু হলোও তো।

তারপর সংক্ষেপে রাহুলের ঘটনাবলিটি বলে ফেলে বলল, সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, গোয়ালের সামনে যে হাড়বুড়ি বুড়িটা বসেছিল, রাহুল যার সামনে, 'আমার মা কি মরে গেছে?' বলে আচড়ে গিয়ে পড়ল, তার নামও না কি সত্যিই 'মোক্ষবুড়ি'।

অ্যাঁ।

সেই তো। আসল আশ্চর্য তো সেইখানেই। বুড়িটার তো বয়েসের গাছপাথর নেই মনে হল। তা ছাড়া বদ্ধকালা। তার কাছ থেকে কোনো কথা আদায় করা গেল না। শুধু পাড়ার কিছু বুড়ো-হাবড়া লোক এলোমেলোভাবে যা বলল তাকে গুছিয়ে বললে এই দাঁড়ায়—মানে একটি 'প্যাথেটিক' গল্পের মতোই। ব্যাপারটা হচ্ছে ওই ভাঙা বাড়িটাতে নাকি বছর চোদ্দ পনেরো আগে, একটি ছোটোছেলে আর তার বিধবা মা থাকত। আর থাকত ওই 'মোক্ষবুড়ি' এবং গোয়ালে থাকত কিছু গোরু।... মোক্ষবুড়ি গোরুগুলোকে দেখাশোনা করত। আর এই মা ছেলেরও দেখাশোনা করত।... বাড়িতে তো কোনো রোজগারি পুরুষ ছিল না। ওই গোরুগুলোর দুধ থেকেই এদের সংসার চালানোয় সাহায্য করত মোক্ষ। এইভাবেই চলছিল। ছেলেটার মায়ের আশা, ছেলে বড়ো হলেই তার দুঃখ ঘুচবে।... কিন্তু দুঃখের ভাগ্য, ছেলের আর 'বড়ো হওয়া' হল না।... বছর আট দশ বছরের ছেলে। কিন্তু ডানপিটের একশেষ। মায়ের বারণ না শুনে হই চই করে বেড়ায়।... একদিন দুপুরে মা যখন ছেলের জন্যে ভাত বাড়ছে, তখন খবর এল, ছেলে চান করতে গিয়ে দিঘিতে ডুবে গেছে।...

অ্যাঁ। ইস! বলেন কী?

সেই তো। তো তাজ্জব কথা এই—খবরটা শোনা মাত্রই সেই মা ভাতগুলো ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে হাততালি দিয়ে হি হি করে হেসে বলে উঠল, কী? হল তো? পই পই করে বারণ করেছিলাম না, ভাত বাড়ছি এখন আর দিঘিতে ঝাঁপাই ঝুড়তে যাসনে। জল তুলে রেখেছি চান করে নে। শুনলি? শুনলি না? এখন? কেমন জব্দ?...

তার মানে আচমকা দারুণ শকটা খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল।... তো ওই মোক্ষবুড়িই নাকি তাকে ধরে বেঁধে নাইয়েছে খাইয়েছে। আবার গোরুর

দেখাশোনা করে দুধ বেচে, ঘুঁটে বেচে চালিয়েছে।... শুনলে বিশ্বাস করবেন সেই পাগলি না কি এই সেদিনও বেঁচেছিল। বছর খানেক আগে মারা গেছে। তার মানে বছরখানেক আগে আমরা ওখানে গেলে, আপনার ভাইপোর পূর্বজন্মের মায়ের সঙ্গে দেখা হত।... সে যাক—এর কী ব্যাখ্যা দেবেন বলুন?

কপিল স্তব্ধ হয়ে শুনছিল এই অবিশ্বাস্য কাহিনি। তারপর আস্তে বলল, ব্যাখ্যা নেই।

গাড়ি চলতে থাকে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। গভীর হয়ে আসা রাত্রির বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

দিব্য একটু পরে বলল ঘটনাটা আপনাকে সবটা বললাম। সবাইকে এভাবে বলা হয়নি।... অনেকেই জানে হঠাৎ একটা বিচ্ছিরি মতো বুড়িকে দেখে, ভয় পেয়ে ছুটে পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে। আসলে মানুষ এই ধরনের ব্যাপারকে বড়ো বেশি বাড়ায়, ফাঁপায়। কাজেই— তা ছাড়া রাহুলেরও শুনলে মানসিক ক্ষতি হতে পারে।... কাজেই রূপকথাকে বেশি চাউর করা হয়নি। অবশ্য ডাক্তারকে একটু জানানো হয়েছিল। তিনি আমল দেননি।... বলতে গেলে নস্যাৎ করে দিয়েছেন।...

বলেছেন ছেলেটি বোধ হয় একটু বেশি 'ইমোশ্যানাল'। তেমন ক্ষেত্রে এমন সব কাল্পনিক ধারণা পেয়ে বসে।... দেখবেন এটা ওর স্মৃতি থেকে মুছে যাবে।...

কপিল আস্তে বলে, গেলেই ভালো। তবে—একটা ধাঁধা ধরিয়ে দিয়ে রেখে দিলেন।

নিজেরাও যে সেই ধাঁধায় পাক খাচ্ছি। এই বুড়িটা যেন একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন হয়ে বসে আছে।

আবার গাড়ি চলে নিস্তব্ধ রাস্তায়।

দিব্য আবার বলে, তাহলে ওই কথাই রইল। এই রূপকথার গল্পটা কেবলমাত্র আমাদের মধ্যেই থাকল। পড়ে যাওয়াটা তো আশ্চর্য কোনো ব্যাপার নয়। হোঁচট খেয়েও তো পড়ে মানুষ। হাঁটু তো ছড়েও গেছে।

পরিচালক চিত্ররথ রাহুলের বাবাকে বলেন, রাহুলের ট্রিটমেন্টের খরচা আপনি দিতে চান? তার থেকে বরং আমার নামে পুলিশ কেস করুন। সেটা সহজে সহ্য হতে পারবে।

পুলিশ কেস। আপনার নামে? মানে?

কৌশিক রায়ের হাতের পার্স হাতে। মুখ 'হাঁ'।

চিত্ররথ বললেন, কেন নয়? ইচ্ছে করলেই পারেন। আপনার অমন একখানি জলি 'লাভলি' ছেলেকে নিয়ে গেলাম, আর একদিন পরেই, এই অবস্থায় ফেরত আনলাম, এটা কি কম কথা?

কৌশিক বললেন, ও-কথা ছাড়ুন। অসুখ করে গেছে ওর ভাগ্যে। কিন্তু ট্রিটমেন্টে তো কম খরচ হচ্ছে না? আপনার গিয়ে ব্রেনের এক্সরে-ই কতগুলো নিলো। তা ছাড়া এরকম একটা দামি নার্সিংহোমে রাখা—

ঠিক আছে। ঠিক আছে। এ নিয়ে আপনি আর বেশি চিন্তা করলে কিন্তু সত্যিই দুঃখবোধ করব। আপনার ছেলেটিকে সুস্থ স্বাভাবিক করে আপনাদের কাছে ফেরৎ দিতে পারলেই, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, ডাক্তার তো সবরকম পরীক্ষা করে বলছে, কথা বলতে না পারার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এটা ওর 'খেয়াল' হওয়াও আশ্চর্য নয়। ওর মা কি আজ ফিরছেন?

হ্যাঁ। সন্ধ্যার সময়। ট্রেনের টিকিট না পাওয়ায় কী একটা লাক্সসারি বাস আছে, তাতেই চলে আসছেন।

চিত্ররথ বললেন, দেখা যাক, মাকে দেখে কোনো 'রি অ্যাকশান' হয় কি না।

বলেছিলেন কিন্তু এতটা হবে তা বোধ হয় আশা করেননি।

মাকে দেখামাত্রই রাহুল শোওয়া থেকে উঠে বসে মাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, মা! মা! তুমি বেঁচে আছো? তুমি মরে যাওনি? মা তোমার সব জিনিস ওরা নষ্ট করে দিয়েছে। তোমার গাছ ছিঁড়ে দিয়েছে। তোমার আর কিচ্ছু নেই। আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার খুব ভয় করলো। আমি ভাবলাম তুমি মরে গেছো।

রাহুলের মায়ের অবস্থা অবশ্যই অবর্ণনীয়। শুনে এসেছেন, ছেলে 'বোবা' হয়ে গেছে। সেই ছেলের মুখে এত কথা!

কিন্তু বলছেটা কী? শুনে হাসবেন না কাঁদাবেন? তবু মনের জোর এনে বলেন, মরতে যাব কী দুঃখে? কে বলেছে আমার সব নষ্ট হয়ে গেছে? আমার সব আছে। স-ব। বাড়ি চল্ দেখবি।

বাড়ি ফিরে নিজের চিরকালের চেনা সব কিছু দেখে রাহুলের মাথা থেকে সেই 'ভয়ের পোকাটা' আশ্চর্যভাবে চলে গেল। বলল, আসলে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে আমার না ভীষণ ভয় হয়ে গেছল মা। স্বপ্নের মধ্যে

তোমায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো, তাই মনে হচ্ছিল তুমি—ধ্যাৎ আমি যে কী বোকা!

ছোটকা বলল, এখন তো দিব্যি হেসে হেসে মায়ের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলি না কেন?

রাহুল অম্লান বদনে বলল, বলতে ইচ্ছে করছিল না। আমার মন খারাপ লাগছিল। ভাবছিলাম দায় পড়েছে আমার কথা বলতে।

চমৎকার। ডাক্তারদের স্রেফ বোকা বানিয়ে ছাড়লে মানিক। ইস। অভিনয়ের এমন 'চান্সটি' তুমি গুবলেট করে ফেললে। কিন্তু তুমি বাবা একটি পাকা অভিনেতা। চারদিন পাঁচদিন ধরে একদম 'বোবার পার্ট প্লে করে গেলে। টুঁ শব্দটি করে ফেললে না, বলিহারি!

তো 'বলিহারি' দিচ্ছে রাহুলকে এখন অনেকেই।

যারা রাহুলের সিনেমায় চান্স পাওয়ার খবরে বাড়ি বয়ে এসে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছল, যেমন ছোটোমাসি, বুটকি পিসি, রাঙামামি, লীলাবউদি, হেনাবউদি, আর যত সব তুতো দিদিরা, তারা আবারও বাড়ি বয়ে এসে বলে যাচ্ছে বলিহারি বাবা! এমন একখানা চান্স পেয়ে, যাকে বলে স্বর্গের টিকিট হাতে পেয়ে তুমি একখানা আছাড় খেয়ে সব খতম করলে?... পড়ে গিয়ে হাঁটু ছড়ে যাওয়া আর এমন কী? ক-দিন পরে আবার হতে পারতো। আর নেবে না কেন? অ্যাঁ? আসলে পরিচালক প্রযোজক, এরা সবাই তোকে অপয়া ভেবেছে।... অত ঘটা করে আউটডোর শুটিঙে গেল, আর তুই কি না, ছি ছি।

রাহুল রেগে গিয়ে বলে, অপয়া তো অপয়া। না হলো তো বয়ে গেল। সব্বাই বুঝি সিনেমা করে?

লড়তে হল ক্লাসের বন্ধুদের সঙ্গেও।

তারাও 'বলিহারি' বলছে। 'ছি ছি' করছে।

ইস। তুই কী রে? আছাড় খাবার আর দিন পেলি না? মোক্ষম শুটিঙের দিন? ভেবেছিলাম তুই খুব লাকি। এখন তো দেখছি লবডঙ্কা। একদম আনলাকি।... ধ্যাৎ!

হ্যাঁ সবাই বলছে, ধ্যাৎ! আমরা কোথায় ভাবছিলাম নিশ্চয় তুই খুব ভালো অভিনয় করবি। তোকে আর ওরা ছাড়বে না। পরপর ছবি করবি। 'ফেমাস' হয়ে যাবি। তা নয়—

ধ্যাৎ! মনে করছিলাম, তুই আমাদের বন্ধু বলে অন্যের কাছে গর্ব করব। সব বাজে মার্কা হয়ে গেল। প্রথমবারেই এমন করলি। আর কি ডাকবে?

রাহুল জোর গলায় বলে—'ফেমাস' হয়ে কী হবে শুনি? 'ফেমাস' হওয়া তো খুব কষ্টের।

কী বললি? হি হি। ফেমাস হওয়া কষ্টের?

কষ্টেরই তো। প্রসূনকুমার নিজে মুখে বলেছেন, 'ফ্যান'দের ভক্তির জ্বালায় মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই। আমার 'আমি'টা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে।

আহা রে। তবু তো লোকে 'ফেমাস' হবার জন্যেই মরছে। দেখ সবদিক তাকিয়ে। কেমন 'ফেমাস' হবার তাল।

রাহুল কিন্তু এতজনের আক্রমণেও বিচলিত হয় না। জোর গলায় বলে, বাবা বলেছেন, ভালো লেখাপড়া করেও ফেমাস হওয়া যায়। অথচ তাতে 'ফ্যান'দের জ্বালাতন থাকে না। আমার 'আমি'টা হারিয়ে যায় না।

এইটাই আশ্চর্য!

সবাই হায় হায় করছে, 'চান্স' পেয়ে হারানোর জন্যে। শুধু রাহুলেরই মন খারাপ নেই।

ঝিলমিলপুরের স্মৃতিটা তার কাছে এখন 'স্বপ্ন' বলে মনে হলেও দুঃস্বপ্নই তো। তাই ওদিকের নামই করতে ইচ্ছা করে না।

যেন ভারী এক চাঙড় পাথরের মতো ভয়ের একটা ভারী চাঙড় কোনোখানে বুকচাপা মতো হয়ে বসে আছে।

আর ওই ঝিলমিলপুরের ঘটনার সাক্ষী ছিল যারা? তাদের কাছেও ওটা একটা ব্যাখ্যাহীন রহস্যের চাঙড়।...

সবটাই উড়িয়ে দেওয়া যেত যদি ওই 'মোক্ষবুড়ি' নামের একটা জলজ্যান্ত উপস্থিতি না থাকত। যদি তার জীবনের ঘটনাটি না জানা হতো!

তা জগতে ব্যাখ্যাহীন রহস্য তো থাকেই কিছু কিছু! তাকেই নাম দেওয়া হয় 'অলৌকিক'।

চিত্ররথও এক এক সময় ভবেন, রাজ্যে এত গ্রাম থাকতে, দিব্য আর শিশিরবাবু 'লোকেশান' খুঁজতে বেরিয়ে হঠাৎ ওই ঝিলমিলপুরটাই-বা পছন্দ করে বসল কেন?... আবার ওই গ্রামে এতো ভাঙা পুরোনো বাড়ি থাকতে ওই 'মোক্ষবুড়ি'র আস্তানাটাই বা আবিষ্কার করতে গেল কেন?... একে কাকতালীয় বলা হবে, না, 'অলৌকিক'?

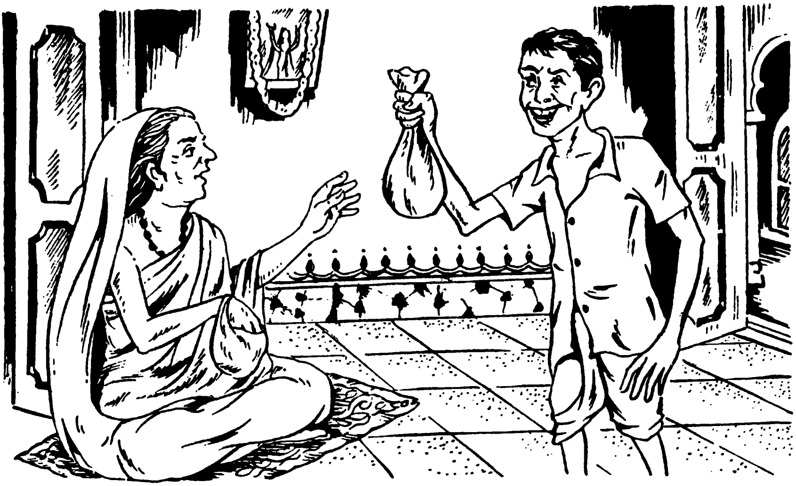

ভাগ্যলক্ষ্মী লটারি

যদিও সারা বছর ধরে সারাদেশ রাজ্য জুড়ে নানাধি 'পুরস্কার' লটারির টিকিট বিক্রির কারবার চলে, 'রাজ্য লটারি' 'কাঞ্চনজঙ্ঘা লটারি' 'পূর্বদিগন্ত লটারি' 'সীমাচলম লটারি', কত কত তার ঠিক নেই, লিস্ট করতে বসলে দিন কেটে যাবে, আর দোহাত্তা কিনেও চলেছে সবাই, কিন্তু সেই সব 'পুরস্কার' পাচ্ছে কেউ?

কই কেউ কখনও এসে বলেছে, 'এই যে ভাই অমুক লটারিতে লাখ দশেক টাকা পেয়ে গেলাম!... নিদেন পাঁচ লাখ? আড়াই লাখ'? না বাবা, চেনাজানা কাউকে বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ছে না।

অথচ লটারির টিকিট বিক্রির কী রমরমা। ওটা তো ক্রমশ একটা 'বিজনেস' হয়ে উঠেছে। পথেঘাটে, রেলওয়ে স্টেশনে, হাটেবাজারে, কোথায় চলছে না সেই বিজনেস? আর ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ মুখ্যু বিদ্বান গরিব বড়োলোক কে না কিনছে? বলতে গেলে কিনেই চলেছে। একবার ওই নেশাটি ধরে গেলে আর ছাড়ান-ছোড়ান নেই।

এমনকি বিল্টুর খেতু ঠাকুমা, যিনি রাতদিন হরিনামের মালা জপ করেন, আর শুচিবাই করেন, তিনিও বছর ভোর খবরের কাগজে যতরকম 'লটারির'

বিজ্ঞাপন দেখেন সবগুলো ভাইপোদের দিয়ে কিনিয়ে ছাড়েন। ভাইপো ছাড়া আর কে? ভাইপোরাই তো তাঁর 'সব'। ছেলেমেয়ে তো আর নেই। না জন্মালে আর থাকবে কোথা থেকে?

মালা জপ ছাড়া আর একটি কাজ খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকেন খেতু ঠাকুমা, সেটি হচ্ছে খবরের কাগজ পড়া। বাড়িতে বাংলা ইংরিজি দু'খানা কাগজ আসে। তা ইংরিজিখানাকে উনি দু-চোখের বিষ দেখেন। হাতে পড়লেই হাত থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। কিন্তু বাংলাখানি? তিনি পড়বার আগে আর কেউ হাত দিক দিকি? রসাতল করে ছাড়বেন।... যে হাত দিয়েছে, সে চা খাওয়া এঁটো, সকড়ি হাতে হাত দিয়েছে কিনা তার ঠিক আছে?

কাগজের সবটাই তিনি খুঁটিয়ে পড়েন, বাদে 'খেলার খবর'। তবে ওই লটারির খবর-টবর ভারি মন দিয়ে পড়েন। পড়েন, দেখেন, মনে রাখেন। না, মানে শুধুই মনে রাখেন বললে ভুল হবে, কিনে'ই রাখেন!

বলতে গেলে জ্ঞান অবধি আজীবন এই চালিয়ে আসছেন। কিন্তু পেয়েছেন কখনো কোনো পুরস্কার? এমনকী একটা 'সান্ত্বনা পুরস্কার'ও?- ফোক্কা। কক্ষনও কিছু না।

তা খেতু ঠাকুমা না পেলেন, কেউই কি পায়?

বিল্টুর ধারণা কেউই পায় না।

ওটা একটা যাকে বলে, কী যেন বলে? ও হ্যাঁ, 'আকাশকুসুম'।

মাঝে মাঝে কাগজে 'অমুক পুরস্কার বিজয়ী' বলে যাদের নাম বেরোয়, বিল্টুর তো অন্তত ধারণা, তারাও স্রেফ ওই 'বিজ্ঞাপন'। মাঝে মাঝে 'বিজয়ী বলে কাউকে খাড়া না করলে লোকের যে টিকিট কেনার উৎসাহ চলে যাবে।

ব্যাপারটা সত্যিই যদি ঘটে তো জন্মজীবনে একবারও তো চেনাজানা কাউকে পেতে দেখবে? কই? দেখেছে তেমন কাউকে : কদাপি না।

'ফার্স্ট প্রাইজ' তো দূরের কথা, সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ ফিফথ্ 'লাস্ট'? কোনো কিছুই? নাঃ, কাউকে পেতে দেখেনি বিল্টু। তো বিল্টু তো ছেলেমানুষ, তার বাবা জেঠু, এমনকি খেতু ঠাকুমা পর্যন্ত, বয়েসের যাঁর গাছপাথর নেই, দেখেছেন কোনো আপনজন, চেনাজনকে ওই 'প্রাইজ' পেতে?

'পুরস্কার বিজয়ী' বলে যাদের নাম ঘোষণা করা হয় তাদের আবার নাম ঠিকানারা এমন উদ্ভুট্টে আর উৎকট, যে কারও সাধ্য নেই সেইসব জায়গায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসে 'ঘটনাটা সত্যি' কিনা।

বিল্টুর এই ধারণা শুনে বিল্টুর জ্যেঠু অবশ্য হেসে হেসে বলেন, কী যে বলিস? সবই যদি 'ফোক্কা' হত এতকাল ধরে দেশ রাজ্য বলতে গেলে পৃথিবী জুড়েই চালু থাকত ব্যাপারটা? তো 'চালু' বললে তো কিছুই বলা হয় না, দিন দিন বেড়েই চলেছে। শুধু 'কিস্যুনা'র ওপর এতকাল চলে?

বিল্টু বলে, কেন চলবে না? 'ভূত' বলে তো কিস্যু নেই, সবই তো ফোক্কা, তবু চলে আসছে না চিরকাল ধরে?

জেঠু হো হো করে হেসে ওঠেন। কীসের সঙ্গে কীসের তুলনা। বলেন, আসলে তো বাবা ব্যাপারটা হচ্ছে 'লটারি'। তার মানে 'ভাগ্য' পরীক্ষা। ভাগ্যে থাকলে তো মিলবে? কোটি কোটি লোকের মধ্যে দৈবাৎ একজনের ভাগ্যে জুটে যায়। তো তোর ভাগ্যে থাকলে তুইও কোনো একদিন পেয়ে যেতে পারিস একখানা 'ফার্স্ট প্রাইজ'।

বিল্টু বলে, কচু পারি। হাতি পারি। জীবনেও পাব না দেখো। আসলে তো 'প্রাইজ' বলে সত্যি কিছু নেই।

খেতু ঠাকুমার সঙ্গেও তর্ক করে বিল্টু, শুধু শুধু তুমি 'লটারি' কিনে এত টাকা নষ্ট করো কেন বলো তো ঠাকুমা? ওই টাকায় বরং ফুচকা কী ঝালমুড়ি খেলে ঢের ভালো হতো।

খেতু ঠাকুমা অবশ্য তখন রেগে আগুন হন, কী? আমি তোদের ওই ফুচকা, ঝালমুড়ি খেতে যাব? ওই নোংরা বিচ্ছিরি।

আহা, তা না হয় বাতাসাও তো খেতে পারো। পয়সা নষ্ট করার থেকে তা-ও ভালো।

মনে মনে অবশ্য বলে, 'বাতাসা না খাও আমায় দিয়ে দিলেই পারো ফুচকা খেতে।' তো সে তো মনে মনে। তবে মুড ভালো থাকলে খেতু ঠাকুমা হেসে হেসে বলেন, আসলে হচ্ছে নেশা, বুঝলি? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলেই মনটা নিশপিশ করে ওঠে, ইস! মাত্র একটা টাকার বদলে পাঁচ-দশ লাখ টাকা কিনেই দেখি।

যদি পেয়েই যাও— বিল্টু তর্ক করে। অত টাকা নিয়ে তুমি করবেটা কী? খাও তো শুধু একবার এইটুকুন ভাত। পরো তো বিচ্ছিরি একখানা সাদা ন্যাকড়া! আর পায়ে বাতের জন্যে কোথাও বেড়াতেও যেতে পারো না। সাবান মাখো না, পাউডার মাখো না, গয়না পারো না, টাকা নিয়ে কি ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে?

শুনে ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে হেসেই অস্থির। তারপর বলেন, ওরে, বড়ো সাধ ঠাকুরদার আমলের এই পুরোন অট্টালিকাখানা জম্পেশ করে সারিয়ে ছাতে আমার গোপাল ঠাকুরের জন্যে একটা মন্দির বানাই।

কিন্তু বিল্টুর বাবা জেঠুর? তাঁদের কী সাধ?

সে-কথা তাঁরা বলেন না। হেসে হেসে বলেন, পেলে কী করব তা ভেবে দেখিনি। 'পাব' তা-ও ভাবি না। তবে তেমন ঘটনা ঘটলে দেখা যাবে।

কিন্তু কেনাটি চালিয়েই যান। কেনেন আর হেসে হেসে বলেন, নেশা! নেশা!

তা বাবা জেঠু আর খেতু ঠাকুমা তিনজনেরই এই এক নেশা। শুধু বিল্টুই বলে, 'কোনো মানে হয় না।'

সংসারে এই চারজনই সদস্য। বাবা, জেঠু, বিল্টু আর খেতু ঠাকুমা। অর্থাৎ যিনি বাবা জেঠুর পিসিমা। তা তাঁর কোনো এককালে বিয়ে হয়েছিল বটে, তাঁর মনেও নেই। ছেলেমেয়ের প্রশ্নই নেই। তবে হ্যাঁ, ওই না দেখা শ্বশুরবাড়ি থেকে কী যেন জমি-টমির ভাগের সূত্রে মাঝে মাঝে কিছু টাকা আসে 'ক্ষেত্রবালা দেবীর' নামে। সেই টাকা থেকে তিনি তাঁর গোপাল ঠাকুরের সেবা চালান, বিল্টুকে হাতে রাখবার জন্যে মাঝে মধ্যে কিছু ঘুষ-টুষ দেন, আর ওই লটারির টিকিট কেনেন।

ঘুষ? তা একটু দিতেই হয় বইকি, বেপাকে পড়লে। যেমন কদাচ কখনও জ্বরজারি হলে ভাইপোরা ডাক্তার ডেকে যেসব ওষুধ-টষুধের ব্যবস্থা করেন, সেগুলো লুকিয়ে হাপিস করে দিতে বিল্টু ছাড়া আর কে আছে?... কাশি টাশি হলে যদি ভাইপোরা দুম খরে একটা কাশির সিরাপের শিশি এনে বসিয়ে দিয়ে বলেন, 'বেশি কাশলে দু'চামচ খেয়ে নিও— পিসি' সেই সিরাপের শিশিটা খালি করবার ভার কে নেবে, বিল্টু ছাড়া?

বিল্টুকে পৃথিবীতে এনেই বিল্টুর মা হুশ করে উড়ে স্বর্গে চলে যাওয়ার ফলে বিল্টুকে মানুষ হতে হয়েছে ওই বাবার পিসির কাছেই।...

এমনিতে— আপাত দৃষ্টিতে এখন দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। বিল্টু সারাক্ষণ ঠাকুমকে 'এ করলে কী হয়? ও করলে কী দোষ হয়?' বলে উৎপাত করে, আর ঠাকুমাও তাকে তুলো ধোনে। তবে এমার্জেন্সির সময় আলাদা কথা। তখন ঠাকুমার নাতির সঙ্গে একটু আঁতাত করতেই হয়। উপায় কী? বাড়িতে ওই বিল্টুর বয়সিই আর একজন আছে বটে, তবে সে কী আবার একটা জান? একটা প্রাণী মাত্রই বলা যায়।

অন্তত নিজেকে সে তাই বলে, 'কেনো' একটা তুচ্ছু পেরাণী বই তো নয়।... তার পুরো নামটা ধরে কেউ ডাকলে ছিটকে উঠে বলে, ও বাবা! আবার কা-নাই। অত বাহার কীসের? 'কেন' বললেই যখন মিটে যায়।

তা তার সঙ্গে খেতু ঠাকুমার তেমন আঁতাত চলে না, ঠাকুমার মতে সেটি হচ্ছে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। খেতু ঠাকুমার জ্বর কাশি সর্দির সময় সে যদি কামরাঙা কি কয়েতবেল কিংবা কাঁচা তেঁতুল নিয়ে এসে সাপ্লাই দেয় তাঁকে, কিছুতেই সে খবরটি গোপন থাকে না। বেপরোয়া বলে, 'এনে দিতে বলেছ এনে দিলুম। গুরুজন হও, হুকুমটা তো অমান্যি করতে পারিনে। তবে চললুম এই জেঠুকে বলে দিতে।'

তবে? তাকে দিয়ে আর ঠাকুমার কী উপকার? আর তাকে আর কে সংসারের একজন' ভাবতে যাচ্ছে?' কেনো না কেনো।

কাজেই বাড়িতে এই চারজন।

বিল্টুর বাবার অকালে বউ স্বর্গে যাওয়ায় মাত্তর ওই একটাই পুত্তুর। বিল্টুর জ্যেঠু জন্মে কোনোদিন বিয়েই করেননি। কাজেই স্ত্রী-পুত্তুর কিছুই নেই। তা না থাকে, এই ক-জনায় দিব্যিই আছেন।

বিল্টুর বাবা অফিস যান, তাস খেলতে যান, বাড়ি ফিরে দাদা পিসি আর ছেলেকে নিয়ে মজলিশ করেন। বিল্টুর জেঠু রিটায়ার করেছেন বলে অফিস যান না, কাজেই সারাদিন বাড়িতে দাপিয়ে বেড়ান, পিসির সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামেন, বাজার করেন, এবং মহোৎসাহে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে হাতাখুন্তি চালিয়ে মাছ রাঁধেন মাংস রাঁধেন ডিমের ডালনা রাঁধেন মুরগির কারি বাঁধেন, এবং ডেকচি ভর্তি ভর্তি ভাত ডালও রাঁধেন। রান্নাটা তাঁর 'হবি'। পুরোন রাঁধুনি দেশে চলে যাবার পর বাড়িতে আর রাঁধুনী ঢুকতে দেননি। পিসিকে বলেন, তুমি তোমার মনের মতো যা ইচ্ছে রাঁধো, মোচার ঘন্ট কী সুক্তো, এঁচড়ের ডালনা কী ধোঁকার ঝাল, পোস্ত চচ্চড়ি কী বড়া ভাজা, তা থেকে আমাদের একটু আধটু চাখতে দিলেই হবে। এদিকটা আমি ঠিক ম্যানেজ করে নিচ্ছি।

তবে তাঁর ওই 'ম্যানেজ' করার ব্যাপারর সাহায্যকারী হচ্ছে কোনো ভূতের মতো খাটতে পারে ছেলেটা এবং সবসময় মুলোসম একসারি দাঁত নিয়ে হাস্যবদন।

জেঠু যখন বলেন, বাটনা যে আরও লাগবে রে কানাই; কানাই বলে, লাগবে তো কী? দাও না? কেনোর হাত দু-খানা আছে কী করতে?

আবার যখন জেঠু বলেন, ভাত ডাল যে বে-আন্দাজি বড্ড বেশি রান্না হয়ে গেছে রে কানাই, কী করি বলত ? পিসি দেখতে পেলে তো আমায় তুলো ধুনবে। তখন কেনো অবলীলায় বলে, কানাই কানাই কোরোনি তো জেঠু, কেন বলতে কী হয়? তো ওর জন্যে তুমি চিন্তা কোরো না। কেনো ঠিক পেটে চালান করে ফেলবে।

চিমড়ে চামচিকের মতো চেহারা, তবু কেমন করে যে সেই ডেকচিভর্তি ভাত ডাল চালান করে সেটাই আশ্চর্য! বিল্টু কোনোদিন দেখতে পেলে চোখ গোল করে বলে, কোথায় চালান করলি বল তো?

কেনো হিহি করে হাসে আর বলে, ফুস মন্তরের জোরে।

এত খায়, তবে গায়ে গত্তি লাগার বালাই নেই।

কেনোর এ-বাড়িতে আসার ইতিহাস এই-এ বাড়ির একদার পুরোনো বাসনমাজুনি মানদা একদিন কালো কুচ্ছিৎ হাড়গিলে চেহারার বছর সাত আটের একটা ছেলেকে নিয়ে এসে ধরে পড়ল, মা-বাপ নাই ছেলেটার বড়ো দুঃখী গো বাবু। নিষ্ঠুর পিশেচ খুড়োখুঁড়ি এইটুকুন ছেলেটাকে দিয়ে মজুরখাটুনি খাটায়। গোরুর সেবা করায়, খড় কাটায়, বস্তা বস্তা ধান চাল বহায়, অথচ ভালো করে পেটভরে খেতে দেয় না। তদুপরি আবার একটু কসুর হলেই পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙে। ছেলেটারে আপনারা আশ্রয় দ্যাও বাবু। ও আপনার সব কাজ করে দেবে। শুধু দু-বেলা দুটো খেতে দেবেন, আর থাকতে দেবেন ব্যস। ছেলেটার নির্যাতন দেখে দেখে আর সইতে পারলুমনি, তাই আপনাদের চরণে এনি ধরে দিলুম। আপনারা দয়ালু।

জেঠু, তো শুনে হেসেই খুন।

কে আবার তোমায় বলতে গেল আমরা দয়ালু। তো থাকে থাকুক। কাজ আবার কী করবে? ওইটুকুন ছেলে? আর ওই তো হাড়সার চেহারা।

মানদা বলল, ওই হাড়েই ভেলকি খেলবে গো বাবু দেখবেন তো নিহাৎ বিনি মাইনায় না রাখেন, মাসে মাসে দুটো করে টাকা ওর নামে রেখে দেবেন। যদি কখনও কিছু কিনতে-কাটতে ইচ্ছে জাগে। কানাই তবে তুই থাক এখেনে।

তা তুমি এর কে হও?

মাসি হইগো বাবু।

ফট করে সেই হাড়সার চামচিকের গলা থেকে একটি জোরালো শব্দ বেরোয়, 'মাসি আবার হতে গেলে কবে? গেরামে থাকো, তাই মাসি ডাকি বই তো না।'

জ্যেঠু চমকে ওঠেন, ও বাবা! এ তো কানাই নয়, এ যে দেখছি সানাই। তো ও তো তোর ভালোই করেছে। মাসি বলতে দোষ কী?

কানাই সানাই স্বরেই বলে, দোষ কিছু নাই! তবে ভুলভাল কতা কেনোর সহ্যি হয় না। বললেই পারত 'মাসি' বলে ডাকে। তা না মাসি হই।

নিজেকে সে ''আমি' বলে না, বলে 'কেনো'। নিজের জিনিসকে বলে কেনোর জিনিস।

তো সেই যে রেখে গেলো মানদা, বললো, 'গঙ্গাসাগরে চান করতে যাচ্ছি। এ-সে খোঁজ নেব। তো সেই গেল আর এল না। ভগবান জানেন গঙ্গাপ্রাপ্তিই ঘটল কিনা তার। তা তাতে কানাইয়ের কোনো উদ্‌বেগ নেই। কানাই এখানে মনের আনন্দেই রয়ে গেছে।

কানাই ঠাকুমার কাছে গিয়ে হাপসে পড়ে, ঠাকুমা! বাসনমাজুনি ঘরমুছুনির জন্যি আলাদা নোক রাকার কী দরকার বলো তো তোমাদের? কেন এটুকু পারে না? ছেড়ে গেছ, আপদ গেছ আর নোক খুঁজতে হবে না।

খেতু ঠাকুমা মাথায় হাত দেন, তুই করবি ওই সব কাজ? মাথা খারাপ?

মাতাটা তোমাদেরই খারাপ। শুদুমুদু একটা পেরাণীকে দু-বেলা দু-গামলা ভাত খাইয়ে পুষবে, আর তাকে বসিয়ে রাখবে। হুঃ! পাগল আর কারে কয়? না না। আর নোক রাখতে হবে না।

তুই পারবি দু-দিককার এত এত হাঁড়িকড়া থালা বাসন মাজতে: এত বড়ো বাড়িখানা সাফ করতে? বালতি বালতি সাবান কাচতে?

পারি কিনা দ্যাকো। বাসন তোমার সোনা হেন ঝলসাবে। সাবান কাচা ধোপাকে হার মানাবে, আর বাড়িঘর তকতক করবে দেখো।

তা সত্যিই তাই দেখেন ঠাকুমা।

আর দেখে গালে হাত দেন। ওই তো নলতে-সলতে দ-খানা হাত, করিস কী করে রে?

কানাই মুলার সারি দাঁত বার করে বলে, খুড়োখুড়ির শিক্ষে। একটুক কসুর হলেই যে পিটনচণ্ডী চলত!

বাড়ির আরজনেরা ভেবেছিল, কাজের লোক কামাই করছে বলে কানাই দু-দিন চালিয়ে দিচ্ছে। তাই দেখেই জেঠু আর তাঁর ভাই মোহিত আবার অস্বস্তিতেও অস্থির। কিন্তু যখন শুনলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এটি, তাঁরা সতেজে আপত্তি করলেন, না না, এ হতে পারে না! ওই বাচ্চাটাকে দিয়ে এত কাজ করানো?

কানাইও সঙ্গে সঙ্গে সতেজে বলে, তবে কেনোকে বিদেয় দ্যান। চার বেলা চব্যচোষ্য খাবে, আর চারখানা হাত-পা কোলে নিয়ে বসে থাকবে কেন? তার মধ্যে একটা বিবেক নাই? এ কাজ তো কেনোর কাচে নস্যি।

দেখতে হাড়গিলেলতুল্য হলে কী হবে গলাটি তো সানাই মার্কা আর কথার চাষটি তাদের গ্রাম দেশের ধান-চালের মতোই। ওইটুকু ছেলের এতও কথার স্টক! খেতু ঠাকুমা গালে হাত দেন মুহুর্মুহু!...

বিল্টুও প্রথমটা খুব রাগারাগি করেছিল, আচ্ছা ঠাকুমা, ওই কেনোটাকে দিয়ে তুমি এত এত কাজ করাচ্ছ? প্রাণে মায়ামমতা বলে কিছু নেই? ওই মস্ত বালতিটায় জল ভরে ও তোমার তিনতলার ছাতের বাগানে জল দিতে যায়! একদিন হাতটা ছিঁড়ে পড়ে গেলে?

ঠাকুমাও অবশ্য আরও জোরালো গলায় বলেন, তো তোর প্রাণে এত মায়া থাকে তো বন্ধ করা? মুখপোড়া যে সোজা বলে দিয়েছে, শুদুমুদু বসে খেতে পারবে না সে! 'করিসনি' বললে কাঁদতে বসে।

তাজ্জব।

তবে আর কী করা?

সাত-আট বছর থেকে কানাই ক্রমে তেরো চোদ্দটি বছরের হয়ে উঠেছে, তবে খানিকটা লম্বা হওয়া ছাড়া চেহারার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

বিল্টুর তো গাদা গাদা জামা পোশাক। ছেঁড়বার অবকাশ পায় না। বস্তা বস্তা জমে! খেতু ঠাকুমা বলেন, কেনোর জন্যে আবার আলাদা জামাপাজামা কেনবার দরকার কী? ওই জমে থাকাগুলোই পরুক।

শুনে বিল্টু আর তার বাবা জেঠু তো হেসেই অস্থির। ওইগুলো ওর গায়ে? কাকতাড়ুয়ার মতো দেখাবে যে।

বিল্টু তো দিব্যি নাদুসনুদুস! কাজেই এ কথা বলবেনই।

কিন্তু কেনো নির্বিকার।

খারাপ দেখাবে? আহা! কেনো কী একখানা রাজপুত্তুর! তাই ভালো দেকাতে হবে। পয়সার জিনিস ফেলা যাবে, আর পয়সা দিয়ে নতুন জামা পোশাক কিনে আনতে হবে? বাড়িসুদ্ধ দেকচি মাতা খারাপ।

অতএব কানাই অম্লানবদনে সেই ঢলঢলে জামা-পেন্টুল পরে হাস্যবদ্যনে ঘুরে বেড়ায়। আর নিজে নিজেই বলে ওঠে, ওরে কেনো, জন্মে কখনও এমন সিল্কের সাটিনের জামা গায়ে চড়িয়েছিস? কখনও এমন কায়দার পোশাক পরেছিস? যাই ভাগ্যিস এ-বাড়িতে এইছিলি, তাই না?

কানাই এ বাড়ির একটি হাসির খোরাক।

শুধু বানির কেন পাড়ারও।

কানাই যখন তার কাঠির মতো দেহে চমৎকার চমৎকার কাপড়ের আলখাল্লা সদৃশ শার্ট পাঞ্জাবি পরে থলি নিয়ে জেঠুর পিছু পিছু বাজারে যায়, যে দেখে সে-ই হেসে মরে। বাজারে আলুওলা বলে, জামাটি তো তোমার গায়ে বেশ ফিট করেছে হে!

কানাই গম্ভীরভাবে বলে, আলু ওজন করছেন আলু ওজন করুন। কার জামা ফিট করল কিনা তাতে আপনার কী কাজ?

তবে বিল্টুর বন্ধুরা যখন দেখে দেখে আর হ্যা হ্যা করে হেসে বলে, ‘ওরে বিল্টু তোর এইসব জামা-টামা তো এর গায়ে বেশ মানিয়েছে। মনে হচ্ছে দর্জিকে দিয়ে মাপ নিয়ে করানো।’

তখন কানাই করুণ বচনে বলে, কী করবো দাদাবাবু! দৈনিক কেনোর পেটে তো গন্ধমাদন পর্বত ঢুকতেচে, তবু কেনোর হাল ফেরে না। তো বেমানান হচ্ছে বলে তো আর পয়সার জিনিস ফেলে দেওয়া চলে না। এইসব জামার কতো দাম তা ভগবানই জানে। ভালো দেখাচ্চে না? বলি কেনো তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছে না।

সবাই হেসে ওঠে।

মোট কথা, ঘরে বাইরে কানাই যেন একটি হাস্যরসের জোগানদার।... তো তাতে কানাইয়ের দুঃখবোধ নেই। কানাই ভূতের মতো খাটে, বকরাক্ষসের মতো খায়, সদাহাস্য মুখে বেড়ায়। তবে কথায় কারো কাছে হারতে রাজি নয় কানাই।

বিল্টুর বাবা বললেন, দুপুরবেলা তো তুই ঘুমোস না। জেঠুর কাছে একটু লেখাপড়া শিখলেই পারিস।

কানাই সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলে, রক্ষে মধুসূদন। তুমিও আবার ওই মোক্ষম কতাটি তুলতে বসচ?... জেঠু কী কম জ্বালাতন করেচে আমায় ওই ‘পড়া নেকা পড়া নেকা করে? শেলেট পেনসিল এয়েছে’, বন্যো পরিচয়’ না কী সেই বই এয়েছে। তবু অনেক কৌশলে পরিত্রাণ পেয়েচি ওনার হাত থেকে।

কী আশ্চর্য! কেন রে? এই যে দাদাবাবু ইস্কুলে যায়, লেখাপড়া করে, দেখে ভালো লাগে না?

কানাই অম্লানবদনে বলে, তা আবার লাগে না? দেকে তো চোক জুইড়ে যায়। য্যাখন ইস্কুলের বাস থেকে নাবে, দেকে কেনোর বুক দশ হাত হয়ে ওটে। তা বলে কেনো তাই হতে চাইবে? যাকে যা মানায়! সে-হিসেব নাই?

তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কানাইয়ের লজ্জা-কুণ্ঠার বালাই নেই। ‘আর দিও না’ বলতে জানে না, ‘অত দিচ্ছ কেন?’ বলতে জানে না!

বরং বিল্টু যখন দু-চার টুকরো আম খেয়েই বলে আর পারছি না, তখন কানাই মনের আনন্দে আস্ত আস্ত দু-তিনটে আম নিয়ে বসে বলে, এ বাড়ির সবাই দেকি নিখাগি’। আর জন্মে কাউকে দিয়ে আসোনি বোধ হয়। যাক গে, কেনোর জুটেচে কেনো খাবে!

খেয়ে কখনও অসুখ-টসুখ করতে দেখা যায় না কানাইয়ের।

কানাই কোথাও বেরিয়ে হয়তো হঠাৎ বৃষ্টি আসায় বেদম ভিজে এল। জেঠু শশব্যস্তে বললেন, শিগগির গা-মাথা মুছে ফেলে শুকনো জামা গায়ে দে।

কানাই দাঁত বার করে বলে, জেঠু, এমন ভাবখানা করতেচ, যেন কেনো নুনের পুঁতুল না চিনির পুঁতুল। জল বসলে গলে যাবে।

খেতু ঠাকুমা বলেন, অ্যাঁ, এই মুষলধারের বিষ্টিতে ভিজে এলি? শুকনো জামা পরে এদিকে আমার কাছে চলে আয়। আদা মরিচ দিয়ে জল ফুটিয়ে রাখছি, খেয়ে নিলে সর্দির ভয় থাকবে না।

কানাই তার খোঁচা খোঁচা চুলগুলো গামছায় ঘষতে ঘষতে তার শানানো সানাইয়ের গলায় বলে ওঠে, ওসব শৌখিন জিনিস তোমার নিজের তরে রাকো ঠাক্‌মা। যার একটুক ঠান্ডা লাগলেই ঁাচি কাশি, বাতের বেদনা বিদ্ধি। কেনোর লাগবে না।

বিল্টু বলে, এইরকম গোঁয়াতুমি করেই তুই একদিন মরবি কেনো।

কানাই ভিজে জামাপ্যান্ট পরেই শীতে 'হি হি' করতে করতে দাঁতের বাহার খুলে বলে, কেউ গেরান্টি দিতে পারে, গোঁয়াতুমি না করলে চিরজম্মো বেঁচে থাকবে, কখনও মরবে না?

সাধে ঠাকুমা বলেন, চাষিবাসী ঘরের ছেলে ধান-চালের চাষই শেখে, কেনো মুখপোড়া এই বয়সে এত কথার চাষ শিখল কী করে তাই ভাবি।

কানাইকে ঠাকুমা 'কেনো মুখপোড়াই' বলে থাকেন। তাতে কানাইয়ের আহ্লাদের কমতি নেই।

কানাই বলে, হাঁটুর বেথায় এত কষ্ট পাও ঠাকুমা, আকন্দ পাতার সেঁক দিতে পারো না?

ঠাকুমা বলেন, আকন্দ পাতা আবার পাচ্ছি কোথায়?

কেনো মাথায় হাত দেয়, শোনো কথা! আকন্দ পাতা হেন তুচ্ছু জিনিসের অভাব? আকন্দর তো জঙ্গল হয়।

সে তোদের গ্রামে, এখানে কোথায়?

কানাই অগ্রাহভরে বলে, কলকেতায় আবার কোন জিনিসটার অভাব ঠাকমা? কতায় বলে, 'যা আচে ভারতে, তা আচে কলকেতাতে।'

পরদিন কোথা থেকে যেন গাদা করে আকন্দ পাতা এনে হাজির করে।

আর খেতু ঠাকুমা অম্লানবদনে বলেন, কেনো মুখপোড়ার কাণ্ড দেখেছিস তোরা? একঝুড়ি আকন্দপাতা।

তবে হৃষ্টচিত্তে তাকে কাজেও লাগান।

জেঠু মাঝে মাঝে বলেন, অ কানাই, মাসে মাসে দুটো করে হলেও, এই এত বছরে তোর তো অনেকগুলো টাকা জমে গেল রে। কিছু খরচা করতে ইচ্ছে হয় তো বল্ বার করে দিই!

কেনো ঠোঁট উলটে বলে, কেনোর আবার কীসের ইচ্চে? চারবেলা পেট চিরে সাঁটছে। দাদাবাবু আইসকিরিম, চকোলেট, ফুচকা, ঝালমুড়ি, চানাচুর যা খাচ্ছে তার ভাগ দিচ্চে কেনোকে।... তোমরা সার্কাস দেকাতে নে যাচ্ছ, মেলায় নে যাচ্চ, চিড়িয়াখানা দেকাতে নে যাচ্চ, সব নিজেরা টিকিট-মিকিট কিনে, কেনো আবার নতুন কী করবে? কেনোর আবার 'মাইনা'। শুনে হাসব না কাঁদব গো? কেনো যা খায়, তাতে পাঁচটা নোক পোষা যায়।

ধ্যাত। কী যে বলিস!

কী যে বলি? তো দাদাবাবুর খাওয়ার মাপটি আর কেনোর খাওয়ার মাপটি হিসেব করে দেখো? ওই খাওয়ার জন্যিই খুড়ি দু-চক্ষের বিষ দেকত। বলতো—'বকরাক্কোস'! 'কুম্ভোকন্নো।'! তো নেয্য কতাই বলতো! আহারটা কেনোর একটু বেশিই! খাই আর অবাক হয়ে ভাবি, যায় কোথায় এত মাল? পেট তো সেই হাড়ে চামড়ায় এক!

এই কানাই।

অথবা 'কেনো'।

আনন্দে আহ্লাদে থাকে। আহ্লাদ আমোদের জোগান দেয়।... সংসার সুখে চলে!

জেঠুর সঙ্গে বাজারে গিয়ে কেনো জেঠুকে 'থো করে বাজারিদের সঙ্গে দরাদরি করে, জিনিসের দাম কমায় এবং জেঠুকে দাবিয়ে সতেজে বলে, তুমি থামো তো জেঠু। তোমায় বোকাসোকা ভালোমানুষ পেয়ে এরা তোমার গলায় ছুরি বসায়, টের পাও না? আমায় দর করতে দাও দিকি!

মাছটা বরফের কিনা, সবজি-টবজিরা সত্যি তাজা না জলে ভেজা এসব জেঠুর থেকে ভালো বোঝে কেনো এবং অঙ্ক-টঙ্ক না শিখেও হিসেবপত্তর ভালো বোঝে। আর বাড়ি ফিরে হেসে হেসে বলে, বুঝলে ঠাকমা, কেনো সঙ্গে না গেলে দোকানিরা যে জেঠুকে বোকাসোকা ভালোমানুষ পেয়ে কী ঠকানোটাই ঠকায়!

এই কেনো, অথবা কানাইচরণ মন্ডল, হঠাৎ একদিন দুম করে সংসারে একখান বোমা ফাটিয়ে বসল।

তা বোমাই! একখানি রাম বোমা।

তবে কানাই কি আর নিজে করল? করল তার নিয়তি।...

খবর এই...

কানাই 'সাপ্তাহিক ভাগ্যলক্ষ্মী লটারির' এ-সপ্তাহের ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে বসেছে।

তার মানে কেনো বিল্টুর এতদিনের ধারণাটা পালটে দিল! বিল্টু প্রত্যক্ষ করল, হ্যাঁ, লটারিতে প্রাইজ পায় লোকে!

চেনাজানা লোকেও পায়।

এর চাইতে চেনাজানা আর কে হবে?

কিন্তু এইটা কি একটা ন্যায্য ব্যাপার? এ-বাড়ির লোকেরা সারাজীবন যাবতীয় লটারির টিকিট কিনে কিনে 'হদ্দো' হয়ে গেল, কেউ কক্ষনও একটা লাস্ট প্রাইজও পেল না, আর 'কেনো কিনা ফার্স্ট চান্সেই ফার্স্ট প্রাইজ!

এমন ঘটনাও ঘটে জগতে?

তবে জেঠু দরাজ গলায় বলে উঠলেন, দেখলি তো বিল্টু? বলিনি, লক্ষ লক্ষ বেড়ালের মধ্যে দৈবাৎ একটা বেড়ালের ভাগ্যেই শিকে ছেঁড়ে।

আর খেতু ঠাকুমা তাঁর গোপালের সঙ্গে বাক্যালাপ করার সময় (এমন তিনি করেই থাকেন সর্বদা) বলে উঠলেন, তুমি বাছা একখানা নির্বুদ্ধির ঢেঁকি! প্রাইজটা ক্ষেত্রবালাদেবীর নামে উঠলে, তোমার একখানা মন্দির তৈরি হতো! তা নয়, কিনা কেনোর নামে ফার্স্ট প্রাইজ!... তো গরিবের ছেলেটা পেয়েছে পাক। তবে তোমার মন্দিরটা তো হচ্ছে না। বুদ্ধু কোথাকার।

ঠাকুমার কথাগুলোই শোনা যায়, গোপালের উত্তরগুলো তো শোনা যায় না। কাজেই তাঁর মনোভাব তাঁর মধ্যেই থাকে।

বিল্টুও বলে, লটারির কর্তাদেরও বলিহারি। ফার্স্ট প্রাইজ দেবার আর লোক পেল না।

তো বাড়িতে তো তবু এইটুকু, পাড়ায় কিন্তু দামামা বেজে ওঠে।

ভাগ্যলক্ষ্মী লটারির ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে গেলো কিনা তোমাদের ওই 'কাজের ছেলেটা'? ওই দন্তমানিক! ওই হাড়গিলে! ওই কাকতাড়ুয়া! ওই চামচিকে! ওই ল্যাবাকান্ত! ওই 'ক' অক্ষর 'গোমাংস' মুখ্যুটা!

হি হি হি।... ছি ছি ছি!

কতো টাকা?

দশ লাখ! অ্যাঁ। ভাবা যায়?

পাড়ার লোকেরা, বিল্টুর বন্ধুবান্ধবেরা সবাই কানাইকে দেখতে আসে।... জলজ্যান্ত একটা ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়া লোক, দ্রষ্টব্য বৈকি! তাও কি লোকের মতো লোক? একটা 'প্রাণী' মাত্র।

তো শুধু পাড়ার লোক কেন, সাতজন্মে যারা অচেনা তেমন আত্মীয়জনেরাও খবরটা শুনে বাড়ি বয়ে কানাইচরণ মণ্ডলকে দেখতে আসে। যেমন বিল্টুর মামারা মাসিরা।... কোনোকালে উদ্দিশ নেই।

আসে, দেখে আর আড়ালে হি হি করে।

ওই কাদাখোঁচা দেখতে ছেলেটা?

ওই দাঁতনা, হাফন্যাড়া কেলেকুচ্ছিতটা?

জেঠু বলেন, যখনতখন তোকে দেখবার জন্যে লোক আসে, তুই একটু ভব্যিযুক্ত হয়ে থাক কানাই।

কানাই অগ্রাহ্যভরে বলে, কী? ভব্যিযুক্ত হয়ে থাকতে হবে? বলি চিড়িয়াখানার বাঁদরগুলানকে তো লোকে দেখতে যায়, তারা ভব্যিযুক্ত হয়ে বসে থাকতে যায়?... সব্বাই তো কেনোকে একটা চিড়িয়াখানার বাঁদরই পেয়েছে। এরপর কোনদিন না ছোলাভাজার ঠোঙা নে আসে।

আবার হঠাৎ একদিন কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে চড়া গলায় বলে, আচ্ছা জেঠু! কেনো কবে টিকিট কিনতে গেল, যে কেনো পেরাইজ পেয়ে বসল? উই তো বাজারের মোড়ে লাল শালুর ন্যাকড়া ঝুইলে—'ভাগ্য। ভাগ্য। টিকিট! টিকিট! এক টাকা! মাত্তর এক টাকা।' বলে চিল্লিয়ে মরে, কেনো তো তাইকেও দেকে না। হটাৎ করে আকাশ ফুড়ে পেরাইজ এলো মানে?

জ্যেঠুর হাসি থামতে চায় না।

তুই যেভাবে দাঁড়িয়েছিস বাবা কানাই, যেন যুদ্ধে নামছিস। কিনেছি আমিই। তোর নাম করে। সেই নম্বরে উঠেছে।

অ। তুমি কিনেছ। তা'লে ও পেরাইজ তোমারই। কেনো পেয়েচে, কেনো পেয়েচে বলে রব তুলতে বসলে ক্যানো?

জেঠু আরও হাসেন, নাঃ। এই বোকাটাকে আর বোঝানো যায় না। বলি 'ঠাকমার' টিকিগুলো কে কেনে? আমিই তো! তো ঠাকমার নামে উঠলে ঠাক্‌মা পেতো না?

কানাই তথাপি হার মানে না। বলে, ঠাকমা তো টিকিট কিনতে টাকা দেয়। বলে, নিজের টাকা নইলে 'ভাগ্যি' ফলে না।

তো এও তোর নিজের টাকা। তাতেই ভাগ্যি ফলেছে। তোর মাইনের টাকা আমার কাছে জমা আছে না? তো ভাবলাম ওই থেকেই কিনে দেখি, তোর 'লাক'টা কেমন! তা দেখলাম তো সাংঘাতিক লাক! এক টাকার বদলে দশ লাখ টাকা পেয়ে গেলি!

কানাই হঠাৎ হতাশভাবে বসে পড়ে বলে, আচ্ছা দাদাবাবু, ওই যে কী দশ লাক দশ লাক করতেচ তোমরা, ওটা কত টাকা?

বিল্টুর অবশ্য এখন মেজাজ খাপ্পা চলছে। কারণ, বিল্টুর বন্ধুরা তাকে দারুণভাবে খ্যাপাচ্ছে! বলছে, ছি ছি। তুই জন্মে কখনও একটা 'লাস্ট প্রাইজও' পেলি না, আর ওই কাকতাড়ুয়াটা কিনা—হি হি।

বিল্টু তাই প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বলে, থাকো মুখ্যু হয়ে। একটু নামতা পর্যন্ত শিখতে বললে গায়ে জ্বর আসে। বলি— দশ টাকা বুঝিস?

আহা, তা আবার বুঝব না ক্যানো?

দশ দশে একশো হয় তা জানিস?

কানাই ঘাড় হেলায়।

তো সেই দশ বার একশো করলে হয় হাজার। আর দশ বার হাজার করলে—

কানাই হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, থামো গো দাদাবাবু, থামো। শুনতে শুনতে মাতা কেমন করে উঠল। তো সেই টাকাগুলান ঘরের মেজেয় বিছিয়ে দিলে ঘরটা ভরে যাবে?

তা তো যাবেই।

কানাই হঠাৎ কাতরভাবে বলে, দাদাবাবু। তোমার পায়ে ধরি ওই পেরাইজটা' তুমি নে নাও। আমার মাতা গুইলে আসতেচে!

বিল্টু অবশ্য ছিটকে ওঠে। বলে, তোর প্রাইজ আমি নিতে যাব কী করতে? অ্যাঁ?

আমার যে মাতা গুলোচ্ছে দাদাবাবু।

ইচ্ছে হয় মাথায় বরফজলে ঢালগে যা!

বিল্টুর বাবার অফিসের লোকেরাও শোনে।

তো হেসে হেসে বলে, একেই বলে অপাত্রে দান। আপনি মশাই সারাজীবন টিকিট কিনে গেলেন অথচ-তা এদিকে তো বলেন ছেলেটা হাঁদাগাধা, তো লটারির টিকিট কেনার বুদ্ধিটি তো হয়েছে?

বিল্টুর বাবা বলেন, দুর মশাই! ও তো আমার দাদার কাজ! ও তো জানতোই না।

তো এখন ওই বিপুল টাকাটা নিয়ে ছোকরা করবে কী?

সেটাই তো সমস্যা। সবাইকে হাতে-পায়ে ধরছে, 'পেরাইজটা তুমি নিয়ে নাও। আমার মাতা কেমন করচে।'

শুনে সহকর্মীরা হাসেন। তারপর বলেন, আপনার দাদাটিও যেমন। ওকে অত টাকার কথা বলার দরকারই-বা কী ছিল? ও আর কী বুঝতো? কিছু দিয়ে দিলেই হতো। গুনতেই জানে না যখন।

বিল্টুর বাবা অবশ্য বলেন, ছিঃ। তাই কী হয়?

কিন্তু সুখের সংসারে ওই বোমাটিই সব তচনচ করে ছাড়ে।

পাড়ার লোকেরা 'পাড়ার লোকের' ধর্মপালন করে বলতে থাকে, 'ইস! ছেলেটাকে দিয়ে এখনও ওনারা বাসনমাজা ঘরমোছা জুতো ঝাড়া করিয়ে চলেছেন। বেচারী হাবাগোবা বলেই না?'

এমনকী বিল্টুর বন্ধুরা পর্যন্ত বলে, যাই বলিস ভাই, এটা তোদের খুব অন্যায়। এখনো ও তোর ওই পুরোনো জামাটামা গায়ে দিয়ে সং সেজে বেড়াবে, তোদের সবকাজ করবে? এটা ঠিক?

বিল্টু বাড়ি এসে রেগে রেগে বলে, এই কেনো, তুই এখনও আমার ঘর মুছছিস, জামা কাচছিস, জুতো পালিশ করছিস? বাদ দে বলছি। খবরদার আর করবি না ওসব।

কানাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, ক্যানো দাদাবাবু, কেনো কী দোষ করল?

দোষ আবার কী? তুমি এখন দশ লাখ টাকার মালিক। তোমার এখন সিংহাসনে বসে বসে পা দোলানো উচিত। তাই করোগে যাও।

জেঠু বলেন, দ্যাখ কানাই, তুই এত টাকার মালিক হলি, আর এখনও এইসব পচা পচা কাজ করছিস। লোকে আমাদের নিন্দে করছে। তুই ওসব ছাড়। আমি কাজের জন্যে একটা মেয়ে নিয়ে এসেছি, কাল থেকে ও-ই সব করবে।

কী? কাজের জন্যে মেয়ে নিয়ে এয়েচ? আবদার? কেনোকে একবার শূদোনোরও দরকার মনে হল না? বিদেয় করো তো ওরে।

না রে বাপু, না। তোকে আর এসব মানায় না।

কানাই সতেজে বলে, তালে কেনো চব্বিশ ঘণ্টা করবেটা কী?

জেঠু সাবধানে বলেন, আমি বলি কী, তোকে বরং একটা ইস্কুলে-টিস্কুলে ভর্তি করে দিই। লেখাপড়াটা একটু শিখে টাকাটা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবি।

কী? ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে? বলি জেঠু, আমার সঙ্গে শত্তুরতা সাধতে কে তোমায় আমার নামে টিকিট কিনতে বলেছিলো, অ্যাঁ?

কানাই চোখ মুছতে মুছতে খেতু ঠাকুমার কাছে গিয়ে পড়ে, তোমার পায়ে ধরি ঠাক্‌মা, পেরাইজটা তুমি নিয়ে কেনো মুকপোড়াকে রেহাই দ্যাও। তুমি তো বলতে নটারিতে টাকা পেলে তোমার ঠাকুরদার আমলের এই বাড়িখানা আচ্ছা করে মেরামত করবে, আর তোমার গোপাল ঠাকুরের মন্দির বানাবে। তো তাই করো না!

ঠাকুমা বেজার গলায় বলেন, সে আমি পেলে আমি করতাম। তোরটা নিতে যাব কেন?

কানাই আহত গলায় বলে, তো আমি তোমার কেউ না?

হলেও, তোর টাকা নিতে যাব কী দুঃখে?

তো দাদাবাবু যদি পেত, নিতে না?

তাই বা নেব কেন? জ্বালাসনি বাবা, পালা।

ঠাকমা, কেনোর তালে কী গতি হবে?

খেতু ঠাকুমা আরও বেজার গলায় বলেন, ঢং করিস না কেনো। রাজার ঐশ্বর্যি পেয়ে বসে আছিস। আবার গতির ভাবনা। কেন, তোর প্রাণের জেঠুকে বলগে না, তোকে তোর টাকা দিয়ে দেশে জমিজমা বাগান পুকুর কিনে দিক। ঘরবাড়ি করে দিক!

কানাই ছিটকে উঠে বলে, দেশে? কেনো মুকপোড়ার কোন যমের জন্যে? অ্যাঁ? দেশের নাম করলে কেনোর গায়ে জ্বর আসে, তা জানো না বুঝি?

ঠাকুমা বলেন, তবে এই কলকেতা শহরেই তোকে একখানা ফেলাট কিনে দিতে বলগে যা। সেখানে রাজাই চালে থাকগে যা! দশ লক্ষ টাকার মালিক হয়ে এখনও তুই সিঁড়ির তলার ঘরে ফাটা চৌকিতে শুয়ে দিন কাটাবি? লোকে আমাদের বলবে কী?

কানাই কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর ফোঁস করে উঠে বলে, এতদিনে বুজলুম। কেনো তোমাদের চক্ষুশূল হয়ে উঠেচিল, তাই তারে তাইড়ে দেবার জন্যে এত ফন্দিফিকির। লটারি কোম্পানির সঙ্গে ষড়যন্তর। বলি টাকাগুলা তো শুনেচি বেঙ্কে থুয়েচে জেঠু। তো সে গুলান কি ছুটে এসে তোমাদের কামড়াতে চাইচে? তাই কেনোর জন্যে এত শাস্তির ব্যাবোস্তা। কেনো, তোরে স্কুলে ভর্তি করে দিই। কেনো, তোর জন্যে দেশে জমিজমা কিনে দিই।... কেনো, তোর জন্য নয় কলকেতাতেই 'ফেলাট' কিনে

দিই! এসবই তো কেনোকে তাইড়ে দেবার ফন্দি। তো ক্যানো? কেনো তোমাদের কী পাকা ধানে মই দিয়েছে?...বলি কেনো যদি আজ হটাৎ করে মরে যায় তো কে আর পেরাইজের টাকা নিয়ে নপরযপর করতে আসবে?

ঠাকুমাও তো কম নয়। কড়া গলায় বলেন, আমার সামনে মরার কথা বলতে এসেছিস? আস্পর্দা তো তোর কম নয় কেনো? অনেক টাকার মালিক হয়ে খুব অহংকার বেড়েছে, কেমন?

কানাই আর একটিও কথা বলে না। আস্তে আস্তে নীচের তলায় নেমে আসে।... এসে দেখে একটা ডুরে শাড়ি পরা মেয়ে উঠোনে বসে ঘষঘষ, করে বাসন মাজছে।

কানাই কী করবে?

কানাইয়ের জীবন যে মহানিশা হয়ে গেল গো!

তা মহানিশা ছাড়া আর কী বলা যায়? কানাইকে যেন সবাই ধরে-করে উদ্‌বাস্তু করে দিয়েছে। কানাই বাসন মাজতে গিয়ে দেখে ডুরে শাড়ি। কানাই ঘর মুজতে গিয়ে দেখে ডুরে শাড়ি। কানাই জেঠুর সঙ্গে বাজারে যাবে বলে থলি নিতে গিয়ে দেখে থলি হাতে আর একটা ছেলে চলেছে জ্যেঠুর সঙ্গে।

কানাই জেঠুর রান্নাঘরের বাটনা বাটতে গিয়ে দেখে সেখানে একটা থানপরা বুড়ি দুলে দুলে বাটনা বাটছে।

কানাই খুব কড়া গলায় বলল, তুমি আবার কে? সরো সরো। এ-কাজটা আমার।

বুড়ি সরল না। বলল, আমায় মনিব বলে গেছে, এই বাটনাগুলান বেটে রাখতে।

কানাই নিস্ফল আক্রোশে একধারে গিয়ে চোখটা মুছতে থাকে।

কানাই যেমন এখন আর 'ভূতের' ভূমিকায় নেই তেমনি 'বকরাক্ষসের' ভূমিকাতেও নেই। কানাইয়ের খাওয়া গেছে, ঘুম গেছে, মুখের হাসি গেছে।

আগে তো কানাই বা কেনোই ছিল সবকিছুর হর্তাকর্তা। সে-ই সকলকে 'আরও খাও আরও খাও,' করে খাইয়ে মারত, এবং অতঃপর নিজের ভুরিভোজটি নিয়ে বসত। এখন কানাইয়ের পোজিশান কুটুমের মতো। খাবার-দাবার দেবার জন্যে অন্য লোক নিযুক্ত।

কানাইকে ডাকা হয়, 'কানাই জলখাবার দেওয়া হয়েছে।'

কানাই এসে দাঁড়িয়ে বলে, 'বেশি অর্ধেক কমিয়ে দ্যান। অত পারা যাবে না।'... নয়তো বলবে, 'অত ভাত মানুষে খেতে পারে?'

জেঠু করুণ করুণ মুখে বলেন, কানাই, তোর কি শরীর খারাপ?

কানাই বলে, কেন? শরীর খারাপ হতে যাবে কেন? এত টাকার মালিক হইচি, রাজার হালে রইচি, দুঃখুটা কী?

বলে আর অন্যদিকে মুখ ফেরায়।

এরই মধ্যে একদিন বিল্টুর বাবা বললেন, কানাই, তুমি আজ একটু ভালোমতো, মানে গায়ে ঠিকঠাক হয় এমন জামা পরে থেকো। আজ একজন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

কানাই চমকে বলে, কেন? মতলবটা কী? আমারে ধরে-করে বে' দিয়ে দিতে চাও নাকি?

এতে অবশ্য খুব হেসে ওঠেন বিল্টুর বাবা। বলেন, না বাবা, না। আসবে একটা খবরের কাগজের লোক।

কেন? আমার সাতে তার কী দরকার?

এই তুমি যে প্রাইজটা পেলে, তাতে তোমার মনের অবস্থা কেমন হল, এরপর তুমি কীভাবে থাকতে চাও, টাকাটা দিয়ে তোমার কী করার ইচ্ছে, এই সব জিগ্যেস করে কাগজে লিখবে। এই আর কী।

যারা পেরাইজ পায় তাদের সক্কলকে এই শাস্তি দেয়?

হা হা হা। শাস্তি কীসের? এ তো ভালো কথা।

হ্যাঁ, খুব ভালো কথা। তো মুকপোড়া কেনোকে তা'লে এখন থেকে 'তুমি তুমি' করা হবে? 'তুই' বলা চলবে না? নাকি ক্রেমশ আপনি আঁজ্ঞে হবে?

বিল্টুর বাবা আবারও হাসেন, এই দ্যাখো। তোকে তুমি বলেছি নাকি? যা গে, যা বললাম শুনলি তো?

গায়ে বড়ো হওয়া জামা পরলে, তারা কতা কইবে না?

আহা হা, তা কেন? ভালো দেখায় না তো? হয়তো ফটোও তুলতে পারে। তো চল না হয় তোকে দোকানে নিয়ে গিয়ে একসেট জামা-জুতো কিনে দিইগে।

কানাই গম্ভীরভাবে বলে, তোমাদের অনেক নির্যাতন সহ্য করছি ছোটো জেঠু, আর না। ক্ষ্যামা দ্যাও। কেনো যা তাই থাকবে। ফটক লিতে চায়, সেই ফটকই নেবে।

তুই বাবা বড্ড গোঁয়ার আর জেদি।

তো এতদিনে চিনেচ কেনোকে?

খবরের কাগজের লোক এসে প্রশ্ন করে, প্রাইজ পেয়ে কেমন লাগছে হে?

কানাই অম্লানমুখে বলে, মনে হতেছে একটা ন্যাজ গজিয়েচে।

অ্যাঁ? সে কী?

যা হয়েচে তাই কইচি।

তো আচ্ছা, টাকাটা নিয়ে কী করবে ঠিক করেছো। অনে-ক টাকা, তা জানো তো?

জানিয়ে ছাড়চে তো সবাই। তো নিয়ে যাই করি, আপনাকে তো দিচ্চি না। তবে জেনে লাভ?

ভদ্রলোক তবু নাছোড়বান্দা, তা এরপর কী করবে ঠিক করেছ?

কানাই গম্ভীরভাবে বলে, গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিই কী রেললাইনে গলা দিই কী লরি গাড়ির তলায় আছড়ে পড়ি সেটা এখনও ঠিক করি নাই।

রিপোর্টার আড়ালে এসে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে ইশারায় বলেন হেড্অফিসে গণ্ডগোল মনে হচ্ছে।

জেঠু মলিনমুখে বলেন, তা একটু আছে গণ্ডগোল।

দেখছেন তো! এই লোকের লাক খুলে যায়। আর আমরা? হা হা হা ফ্যা ফ্যা করে বেড়াচ্ছি।

ফটো আর নেন না, চলে যান তিনি।

কানাই ঘরে গিয়ে গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

কানাইয়ের মনে পড়ে বোধ হয় ঠাকুমার আকন্দপাতা ফুরিয়েছে। কিন্তু আনতে গেলেই তো রাস্তায় বেরোতে হবে? আর বেরোলেই পাড়ার লোক তেড়ে এসে কানাইকে ছেঁকে ধরবে, 'আরে তুমি এখনও এ-বাড়িতে চাকরের কাজ করছ নাকি? এরা তো আচ্ছা লোক।... তো দেশে ঘরে তোমার কোনো আপনজন নেই?... তাদের কাছে চলে যাচ্ছ না?

এইসব কূটকচালে কথা।

এমনিতে এখন আর কেউ ফাইফরমাশ করতে তো কানাইকে বাজারে দোকানে পাঠাচ্ছে না। সেই যে ঠাকুমা হরঘড়ি ডাক পাড়ত, 'কেনো, একবার দোকানে যা, পাঁচফোড়ন আনতে হবে।... কেনো, চট করে একমালা নারকেল আন দিকি!... কেনো, কাঁচালঙ্কা যে ফুরিয়ে বসে আছে।... যা যা চটপট। যাবি আর আসবি—' সেসব বাক্যি আর শোনা যাচ্ছে না। কেনোর বদলে তিন জায়গায় তিনটে লোক রাখা হয়েছে।

তা হয়েছে, তবু বাড়িতে কাকচিল পড়ছে!

রাতদিন চিল চেঁচাচ্ছেন খেতু ঠাকরুন।

এই কি কড়া মাজার ছিরি?... বলি বাসনে যে এঁটো সকড়ি লেগে।...একে

কাপড়কাচা বলে? অ্যাঁ। দু-ঘণ্টা ধরে জল ঝরছে? হাতে কি বাত ধরেছে?... বিল্টু হাঁক পাড়ছে, আমার ঘরে এত ধুলো কেন? পরিষ্কার হয়নি?...

জেঠু রান্না করতে করতে আক্ষেপ করেন, 'এ কী মশলা পেষা হয়েছে, সবই তো আস্ত রয়েছে? একটু ঘষে ঘষে পিষবে তো?... এ কী মাছ কোটা হয়েছে? মাছের গায়ে আঁশ লেগে।... কী? তুমি সাবান কাচতে পারবে না? ঠিক আছে, এগুলো তাহলে লন্ড্রিতে দিয়ে এসো। অত টাইম নেই? এ তো অলো মুশকিল হলো।... রেশন আনতে যেতে পারবে না, কেরোসিনে লাইন দিতে পারবে না তো চলবে কী করে তা তো বুঝছি না।

ওদিকে রাঁধুনির সঙ্গে বাসনমাজুনির তুমুল ঝগড়া। ঘরমুছুনি কামাই করছে, তার কাজটা কেউ করে দিতে রাজি নয়।... বিল্টু স্কুলে যাবার সময় এবং বিল্টুর বাবা অফিসে যাবার সময় সাবানে ধোওয়া হাতেই জুতোটা তাড়াতাড়ি একটু ঝেড়ে নিয়ে পরে ফেলে। কারণ কানাইয়ের এসব কাজ বারণ হয়ে গেছে। একজন দশ লক্ষ টাকার মালিকের তো আর এসব কাজ মানায় না। করতে দেওয়াও যায় না।

কানাইগোঁজ হয়ে তার সিঁড়ির তলার ঘরে বসে সব শোনে। আর আগেকার দিনগুলোর আহ্লাদের ছবি মনে করে।

হঠাৎ সেদিন শুনতে পেল পিসি-ভাইপোতে তুমুল বচসা। ভাইপোর গলা, তো অত বকাবকি করলে কখন কাজের লোক টেঁকে, সবসময় বকবক।

পিসির গলা, তা বলে, এঁটো সকড়ি বাসন নিতে হবে নাকি? ঠিক আছে, কাল থেকে আর রাঁধছি না। চিঁড়ে ভিজিয়ে খেয়ে থাকব।

হঠাৎ ঝেড়েপুড়ে উঠে আসে কানাই।

জোর গলায় বলে, ওই আপদগুলোকে বিদেয় করে দিয়ে কেনোর কাজ কেনোকে করতে দেওয়া হবে কিনা? সাফ জবাব চাই।

পিসি চড়া গলায় বলেন, হবে বললেই তো হয় না। পাড়ার লোক আত্মস্বজন বাড়ি বয়ে এসে আমাদের গায়ে মুঠো মুঠো ধুলো দেবে না?

জেঠু মিনমিনে গলায় বলেন, এমনিতেই তো দিচ্ছে। দেখা হলেই বলছে, এখনো আপনারা ওই কানাইচরণকে বাড়িতে রেখে চাকরগিরি করাচ্ছেন? বলিহারি!

বটে! কেনোর জন্যে তোমাদের এত হ্যানেস্থা? ওঃ মহাশত্তুরেও যেন কখনও নটারিতে পেরাইজ না পায় গো।... পেরাইজ পেয়ে এতো নির্যাতন। খুড়োখুড়িও যে এর থেকে ছিলো ভালো। ঠুটো জগন্নাথ করে বইসে রেকে, মুখের সামনে ভাতের থালা ধরে দিত না।

বলে এক ঝটকা মেরে চলে যায়।

চলে যায়।

কিন্তু কে জানত চিরতরে চলে যাবে?

পরদিন সকালে সেটা টের পাওয়া গেলো।

কানাই নেই।

একটা কাজেই কানাইকে নিবৃত্ত করা হয়নি, সকালে সদর দরজার তালাচাবিটা খুলে দরজাটা হাট করে রাখা, আর জলের পাম্পটা চালানো। কারণ এতে মনে হয়েছিল বোধ হয় প্রেস্টিজ পাংচারের ভয় নেই।

কিন্তু আজ সকালে পাম্পের শব্দ শোনা গেল না।

আর খবরের কাগজওলা কাগজ দিতে এসে প্রচণ্ডবেগে কড়া নাড়ল। দরজা ভেজানো।

এ কী! কড়া নাড়ার শব্দ কেন? দরজা খোলা হয়নি?

কানাই ওঠেনি? শরীর খারাপ নয় তো? ক-দিন ধরে তো খাচ্ছে না দাচ্ছে না।

ঢুকে এল সবাই কানাইয়ের ঘরে।

না। কানাই নেই। কানাইয়ের যা কিছু জিনিসপত্র সব পড়ে। নেই শুধু গামছাখানা। আর যে জামা-প্যান্ট পরনে ছিল সেইটাই যা সঙ্গে গেছে।

কানাই নেই।

কানাই চলে গেছে।

সারাবাড়ি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। এমনকী খেতু ঠাকুমা পর্যন্ত নীরব।

তার মানে কানাই এ-সংসারে আবার একখানি বোমা ফেলল।

কিন্তু এ কী?

বাড়ির চার চারটে লোকই এমন দলকে গেল কেন? কেউ একটাও কথা বলছে না কেন?

বলবে কী? সকলেই যে চোখের জল লুকোবার তালে সরে পড়েছে।

কানাই যে সকলের এত ভালোবাসার জন ছিল তা কে জানত?... কানাইয়ের খাঁ খাঁ করা শূন্য ঘরটা দেখে যে সকলের মনই এমন খাঁ খাঁ করে উঠবে, তাই-বা কে জানত?

কানাই চলে যাবে, তা কেউ ভাবেনি।

কানাই তো আর লেখাপড়া জানে না, যে সুইসাইড রিপোর্ট লিখে রেখে যাবে?...

অনেকক্ষণ পরে খেতু ঠাকুমা নিশ্বাস ফেলে বললেন, নিশ্চয় গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিয়েছে।

জেঠু মাতায় হাত দিয়ে বসে নিশ্বাস ফেলে বলেন, আমার মনে হচ্ছে রেললাইনেই গলাটা দিতে গেছে।

বিল্টুর বাবা বললেন, লরির তলাতেও হতে পারে।

আর বিল্টুর হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে বলল, আমার সব থেকে 'বন্ধুটা' শিকে ছিঁড়ে মরে গেলো।

শিকে ছিঁড়ে।

তা, তাই তো। ওই তো জেঠু বলত না বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়া।

আবার এ ওকে সান্ত্বনা দেয়, আহা, মারাই গেছে তা ভাবা হচ্ছে কেন? এমনি তো মনের দুঃখে চলে যেতে পারে।

তা দুঃখু হয়েছিল বই কী। ওই প্রাইজটা পাওয়ার পর থেকে সকলেই তো কানাইয়ের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।... কানাই ফুলগাছে জল দিতে গেলে খেতু ঠাকুমা বলেছেন, 'থাক থাক, তোমায় আর জল ঠেলে ঠেলে ছাতের বাগানে জল দিতে হবে না। তুমি এখন রাজারাজড়া মানুষ।'...

... বাজারে যেতে গেলে জ্যেঠু বলেছেন, 'থাক থাক, ও আমিই নিয়ে আসব। এখন তোমায় দিয়ে বাজার বওয়াচ্ছি দেখলে পাড়ার লোক আমায় ছি ছি করবে।'

বিল্টুর বাবা বলেছেন, জুতো পালিশ করছে দেখে তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলেছেন, 'থাক থাক! রাস্তা থেকে বুটপালিশ ছোকরাদের দিয়ে করিয়ে নেব।'

তদবধি কানাইকে রেশন আনতে যেতে দেওয়া হয়নি।

কানাইকে কেরোসিনে লাইন দিতে যেতে দেওয়া হয়নি। কানাইকে বাড়ির কোনো কাজ করতে দেওয়া হয়নি। কানাইয়ের সামনে অন্য লোক নিয়ে এসে কাজ করানো হয়েছে।...

কানাইকে 'তুমি' করে কথা বলা হয়েছে।

কানাইকে কেনো বলা হয়নি।

'কানাইয়ের রাতের ঘুম চলে গেছল। রাতদুপুর পর্যন্ত উঠোনে পায়চারি করত!

'শুতে যাচ্ছ না কেন?' জিগ্যেস করলে বলত, মন্দিরের জগন্নাথ তো নয় কেনো যে ঠুঁটো হয়ে বসে থেকেও বাহান্ন ভোগ চালিয়ে চলবে।

আহা। কানাইকে খুব কষ্ট দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু খোঁজাখুঁজির চেষ্টার পথ কী?

থানাপুলিশ করতে গেলে তো বিপদ ডেকে আনা। এসেই বলবে জলজ্যান্ত ছেলেটা রাতারাতি বাড়ি থেকে হাপিস হয়ে যায় কী করে? বলি তার টাকাগুলো তো আপনাদের হেফাজতে রয়ে গেছে। সেই লোভে 'কিছু করে বসেননি তো?'

বলতে পারে। পুলিশের মতো এত মন্দ সন্দেহ আর করতে পারে? ওদের অসাধ্য কী আছে?

আর রেডিয়ো? টি. ভি.? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন? লাভ কী? কানাই কী পড়তে পারে, যে পড়বে, 'কানাই, আমরা অনুতপ্ত। ঠাক্‌মা মৃত্যুশয্যায়। যেখানেই থাকো চলিয়া আইস!'

হায়! হায়! কানাইয়ের একটা ফটোও তো নেই যে, সেটা ছাপা হলে দেখে বুঝতে পারবে।

বিল্টু ডুকরে উঠে বলে, আমরা কী নিষ্ঠুর। কেনোর একটা ফটোও তোলাইনি কখনও। কোনোদিন ভাবাও হয়নি দৈবাৎ যদি হঠাৎ কোনোদিন কেনো মরে যায়, তো তার শ্রাদ্ধর দিন কার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে পুজো করা হবে।

এখন সবাই শুধু নিজেদের দোষ দেখছে, আর হাহাকার করছে।

কানাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় আজ বাড়িতে রান্না হল না, বিল্টুর স্কুলে যাওয়া হল না, বিল্টুর বাবার অফিসে যাওয়া হল না।

এখন মস্ত ভাবনা, পাড়ার লোক যদি এসে বলে, আপনাদের সেই কানাইচরণ নাকি হারিয়ে গেছে?

তা খোঁজাখুঁজি করছেন তো? ওর দেশের বাড়িতে খোঁজ নিয়েছেন?

হায়। কানাইয়ের 'দেশের বাড়িটা' যে কোনমুখো তাই কি কেউ জানে?

সে কী! এত বছর কাজ করছিল, তার দেশের বাড়িটা কোথায় তা জানেন না? আপনারা মশাই আশ্চর্য!

বলবেই।

সেই ভয়েই কাঁটা হয়ে আছেন জেঠু।

কারণ তাঁকেই তো সারাক্ষণ বাড়িতে থাকতে হয়।

তবু আস্তে আস্তে সবই হতে থাকে।

রান্না বাজার অফিস ইস্কুল যাওয়া গোপালের পুজো সবই।

শুধু হাসি-আহ্লাদ বলে জিনিসটা যেন বাড়ি থেকে লোপ পেয়েছে। আর লটারির টিকিট কেনাটা একদম বন্ধ হয়ে গেছে। খেতু ঠাকুমা আর কাগজও পড়ে না।

এখন মস্ত একটা চিন্তা। 'ভাগ্যলক্ষ্মী লটারির' ওই টাকাটার কী গতি হবে?

খেতু ঠাকুমা বলেন, কোনো ভালো কাজে মঠে মিশনে দান করে দে। আর কী করবি?

জেঠুরা দুই ভাই বলেন, তাই কি হয়? যদি কখনও ফিরে আসে? তখন কী বলবো?

ওঃ। ভাগ্যলক্ষ্মী যে এ-সংসারে এমন অভাগ্যলক্ষ্মী হয়ে দেখা দেবে, তা কে জানতো?

ঠাকুমা বলেন, ও আর ফিরেছে। মাগঙ্গা ওকে নিয়েছেন। মনের খেদে গঙ্গা গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছে হতভাগা, এ তো আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

খেতু ঠাকুমার ঠাকুরদার আমলের বাড়িটা ক্রমশ আরও জীর্ণ হতে থাকে বাড়ির লোকেরাও ক্রমেই আরও বুড়ো হতে থাকে।...

বিল্টু ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢোকে।

আর?

ব্যাঙ্কে জমা-দিয়ে-রাখা কানাইরে সেই টাকাটা সুদের সুদ হতে হতে বাড়তে থাকে।

ওই পাহাড়টা নিয়ে কী করবে এরা?

কানাই অবশ্যই খরচের খাতায়।

তবু এখনও জেঠু, জেঠুর ভাই আর বিল্টু রাস্তায় কোথাও কোনো খানে একটা রোগা কালো দাঁত উঁচু কাকতাড়ুয়া মার্কা চেহারা দেখতে পেলেই থমকে দাড়ান। নজর করেন।

নাঃ। কানাই নয়।

কিন্তু কানাই?

সে কি সত্যি মনের দুঃখে প্রাণটা বিসর্জন দিয়েছে?

তা বলে তা নয়।

সে মনের দুঃখে শুধু-যন্ত্রণাময় জায়গাটা থেকে চলে গেছে। পরে গেছে সবথেকে পুরোনো রং জ্বলা একটা জামাপ্যান্ট। আর সঙ্গে নিয়েছে গামছাটা। সেটা অবশ্য নতুন। আর লাল টুকটুকে।

কিন্তু গামছাখানাও ফেলে রেখে গেলে চলবে কী করে?

চান করে উঠে কী পরে জামা-প্যান্টটা শুকিয়ে নেবে?

তাই তো করত বাড়িতে।

মানে সেই তার দেশের বাড়িতে খুড়োখুড়ির সংসারে।

খুড়ো ওকে দেখেই খিঁচিয়ে উঠে বলল, কী? আবার যে বড়ো ফিরে আসা হল? আদরের মাসি আর ভাত দিতে পারল না বুঝি?

বছর দশেক পরে এই সম্ভাষণ।

কানাই গম্ভীর হয়ে বলল, মাসি ভাত দিতে যাবে কী জন্যে? কেনোর কি গতর নাই? খেটে খেতে জানে না?

তো এখন ফিরে আসার হেতু? গতরটা গেছে বুঝি?

শত্তুরের যাক। বাপ-পিতেমোর ভিটে! দেখতে আসতে সাধ হল।

ও। তা দেকা তো হল। এবার মানে মানে কেটে পড়।

কেটে পড়ব? তোমার বুঝি আর বিনি মাইনার চাকর মজুর রাখাল-বাগালে দরকার নাই?

কী? আমি তোরে বিনি মাইনায় চাকর মজুর খাইটেচি?

কী করেচ তা তুমিই জানো। মোট কতা, এখন কেনো বাপ-পিতেমোর ভিটেতেই বাস করতে এয়েচে।

ও। তালে তো মাতা কিনেচে। তবে বসিয়ে খাওয়াতে পারবোনি তা বলে দিচ্ছি।

কেনো অবহেলার গলায় বলে, কে চাইচে বসে খেতে? বলে ওরই জ্বালায় পগারপার হয়ে আসা!

কেনোর খুড়ি দশবছর পরে দেখা মাত্তরই বলে ওঠে, তোর গামছাখানা আমারে দে দিকি কেনো? রংটার ভারি বাহার। তোর খুড়োর পোরানো ধোরোনা একখান গামচা আচে, সেটাতেই কাজ চালা।

তারপর বলে, তো এতকাল ছিলিস কোতা? তোর মাসি সেজে যে তোরে আমাদের কাচ থেকে নিয়ে গেল তার খপর কী? আর তো গেরামে এলো না।

কেনো বলল, ভগমান জানে। বলেছিল তো গঙ্গাসাগরে ছ্যানে যাচ্ছে। ডুবে মরেচে বোধায়।

খুড়ি বিন্দুমাত্র 'আহা' না করে বলল, তা পাপের শাস্তি তো পেতেই হবে। আমাদের সঙ্গে ধান চাল নিয়ে আকচাআকচি।... আমাদের ঘরে একটা 'কামলায়েক ছেলে' দেকে বুক ফেটে গেল। তাই মাসি সেজে দরদ দেকিয়ে

নিয়ে গেল। বলেই গেল, বিনি মাইনায় চাকর খাটাচ্ছ যখন তখন শহরে গিয়েই খাটুক। শহুরে খাটুনি গেরামের মতন এমন দস্যি খাটুনি নয়। তো পেয়েছিলি আরামের চাকরি?

সে খোঁজে তোমার দরকার?

ও বাবা। যেমন ত্যাঁদোড় ছিল তেমনি ত্যাঁদোড় আছে দেকচি। তো এখনও তেমনি হাতির খোরাক আচে? না শহুরে গিয়ে একটু সব্য হয়েচিস? জালা জালা ভাত রাঁধতে পারবোনি আমি!

না পারো আমি নিজেই রেঁধে নেব। খুড়োকে বলো আমার ভাগের জমিটা আলাদা করে দিতে। এতকাল তো একা খেলে।

খুড়ো তখন স্নেহগলিত গলায় বলে, কী যে বলিস বাপ। মেয়েছেলের কতায় কান দিতে আচে? এতকাল পরে ঘরের ছেলে ঘরে এলি। সব দেখেশুনে বুঝে নে। খুড়ো তো বুড়ো হচ্ছে না কি?

ব্যস। তারপরের ইতিহাস একই।

একাধারে খুড়োর সংসারে চাকরনফর মজুর রাখাল-বাগাল সব।

ভোর থেকে রাত পর্যন্ত অবিশ্রাম গাধাখাটুনি।

তো তাতে দুঃখ নেই কেনোর।

কেনোর শুধু অকারণ গালমন্দা হজম হয় না। অথচ খুড়োখুড়ির সেটাই পেশা। সেটাই নেশা।

তো কতদিন এইভাবে দিন কাটাচ্ছিল কানাই? কানাই কি আর দিন তারিখের অত হিসেব রাখোতবে দু'বারের ধান উঠল এইটা হিসেব আছে।

কলকাতার বাড়িতে যেমন হিসেব ছিল দাদাবাবু ইস্কুলে ক' কেলাস উঁচুতে উঠল?

তো দু-বছরে ধান ওঠার পর একদিন খড়ের বোঝা বয়ে হাটে গেছে, হঠাৎ কে কোথা থেকে চেঁচিয়ে উঠল, কানাই না।

এ কি চেঁচানি?

না কেষ্টঠাকুরের বংশীধ্বনি।

এ যে দাদাবাবুর গলা।

প্রাণের মধ্যে যা বসে আছে।

এদিক-ওদিক তাকায়।

ওই যে ঝকঝকে চকচকে গোটা তিন-চার ছেলের সঙ্গে তার সেই ঝকঝকে চকচকে দাদাবাবু!

কেনো। তুই এখানে?

কেনো কৃততার্থ গলায় বলে, কেনো হতভাগা তো এখেনেরই লোক! তো তুমি এখানে?

আরে আমরা ক-জন বন্ধু ছুটির দিন পাড়াগাঁ দেখতে বেরিয়েছি।... কেনো তুই বেঁচে আছিস?

না বেঁচে উপায়? কেনোর কি মরণ আছে গো দাদাবাবু? যমেও ছোঁয় না।

কানাইয়ের ইতিহাস বিল্টুর বন্ধুদেরও জানা।

কারণ 'ভাগ্যলক্ষ্মী লটারির' টাকা যে বিল্টুর জেঠুর ব্যাঙ্কে পচছে, তা সকলেরই শোনা হয়ে গেছে।

তা জেঠুর ব্যাঙ্কেই তো পচবে জেঠুর নামের সঙ্গেই তো কানাইচরণ মণ্ডলের নাম যুক্ত করা হয়েছিল।

টাকা যারা দেয়, তারা তো আর ফট করে ওই পাঁচ-দশ লাখ টাকা প্রাপকের হাতে ধরে দেয় না। অনেক সাক্ষীসাবুদ দেখাতে হয়। নিরক্ষর হলেই তার গার্জেনের সই রাখতে হয়। এবং টাকাটা তারাই ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে শুধু পাশবইটা হাতে ধরিয়ে দেয়। তারপর তুমি তোলো আর রাখো, ওড়াও আর পোড়াও, তোমার ব্যাপার।

কিন্তু কানাইচরণের ব্যাপার তো এই।

বিল্টু বলে, এই এত খড়ের বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছিস? মাথামুখ সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পড়ে যাবি যে।

হ্যাঁ, পড়ে যাবে! অত সস্তা।

তো না বলে ওভাবে চলে এলি যে?

এমনি।

জানিস ঠাকমা তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ঢোল করেছে। জেঠু বাজার করা আর রান্না করা ছেড়েছে। বাবা হাসতে ভুলে গেছে।

অ্যাঁ? এই হতোভাগা কেনোর জন্যে এত?

কানাই খড়ের বোঝা হাটের চালার নীচে নামিয়ে, মাথায় হাত দিয়ে বলে, বলতেচ কী দাদাবাবু?

তা তুই যেমন ভাবেচলে এলি। সবাই তো ভাবলাম তুই মরেই গেছিস। তো চল আমার সঙ্গে!

বন্ধুরা বলে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ। দি গ্রেট কানাইচরণ মন্ডল, চলে চলুন। গাড়িতে জায়গা হবে। আমরা একটা বড়োসড়ো গাড়িতে চেপে এসেছি।

কানাই তার দন্তসমূহ বার করে বলে, তাই কি হয় গো দাদাবু। খুড়োর খড়ের বোঝা নে এসেচি। বেচে পয়সাটা নে যেতে হবে তো?

আরে বাবা। কত পয়সা? নিয়ে নাও। খড় ফেলে চলে চলো। না হয় খুড়োকে বলে যাবে চলো।

বিল্টু বলে, তোর সেই খুড়োখুড়ি?

কেনো হেসে বলে, হ্যাঁ। আমার সেই খুড়োখুড়ি!

তো এটা কী পরেছিস? চেঁড়া একটা লুঙ্গি।

যেখানে যা মানায় দাদাবাবু। হি হি হি, তোমাদের মতো জামা-পেন্টুল পরে গোরুর পেছনে হেট হেট করলে শোভা পায়?

বন্ধুরা নীচু গলায় বলে, আরে সাবাস!

বিল্টুও গলা নামিয়ে বলে, ওই তো। ওই কথার অভাবেই আমাদের বাড়িটা মরুভূমি হয়ে পড়ে আছে।

এক্ষুনি তোমাদিগের সাথে? তাই কখন হয়?

কেনো বলে, কেনোর শরীলে বিবেক বলে একটা পদার্থ নাই। খুড়োর সংসারে রইচি। শেষ ধান ক'টা গোলায় তুলে না দিয়ে গেলে ধর্ম হয়?

আহা, বলছি তো তোর খুড়োর কাছে গিয়ে পারমিশান নিয়ে নিচ্ছি।

তাহলেও ধর্ম বলে একটা কতা। তা ছাড়া আমার 'কড়ার'টাও মনে রাখতে হবে।

আচ্ছা বাবা। হবে, হবে। এখন দেখিয়ে দিবি চল কোথায় তোর সেই মহান মহাত্মা খুড়োমশাই।

খুড়োর পরনে একখানি গামছা। হাতে বিড়ি।

এইসব ভদ্রসন্তানদের দেখে তাড়াতাড়ি বিড়িটাকে ফেলে দিয়ে গামছাটাকে টেনেটুনে ভব্যি হয়ে বসে এদের কথা শুনে হাঁ হয়ে যায়।

বলিস কী কেনো? ওই রাজপুত্তুর হেন ছেলেটার বাড়িতে কাটিয়েচিস এতদিন?... তুই না বলেকয়ে চলে এইচিস বলে খুঁজে খুঁজে নিতে এয়েচে? মটরগাড়ি করে এই পোলানপুর থেকে কলকেতায় নে যাবে? তাও আবার তুই যেতে চাইচিস না? আমার হুকুম নিতে এয়েচে?

কেনো বলে, যেতে চাইচি না, তা তো বলি নাই— বলেচি— আর দু-তিনটে দিন সময় দিতে হবে।

কেন? কেন রে হতভাগা? কী তুই এত রাজকার্যর ব্যক্তি?

কেনো অতীত ভাবে। বলে, ধান ক-টা গোলায় তুলে না দিয়ে গেলে একা তোমার ঘাড়ে পড়বে। আর খুড়িকে কতা দিয়েচি, ওর পুঁইমাচাটা শক্ত করে বেঁধে দিতে হবে। আর গেরামের মা কালীকে একটা পেন্নাম ঠুকে আসতে হবে। আর তোমার ধুতি-ফতুয়াটা ক্ষারে কেচে দিয়ে যেতে হবে।

এসব তুই না হলে হবে না? এইসব রাজা মনিষ্যিদের তুই ওই তুচ্ছুর জন্যে ফেরত দিবি?

কেনো দাঁত বার করে বলে, কেনোও তো তুচ্ছু গো।

গাড়ির কাছে এসে কেনো জনে জনে সক্কলকে পেন্নাম ঠুকে। বিল্টুকে বলে, তালে ওই কতাই রইলো। সোমবার দিনকে কেনো আবার তোমাদের ওখানে গিয়ে হাজির হচ্ছে।

ঠিক তো? শেষে ভুলে যাবি না তো? সবাই আশা করে থাকবে।

কী যে বলো দাদাবাবু? কতা দিয়ে কতার খেলাপ করবে কেনো? তবে হ্যাঁ। ওই যা বললুম, যা যা কড়ার হল তোমার সাতে, তার ইদিক-উদিক হলেই কিন্তুক কেনো আবার সটকান।

গাড়ি ছেড়ে দেয়।

বিল্টুর বন্ধুরা নিশ্বাস ফেলে বলে, হায় রে। এই লোকের ব্যাঙ্কে দশ লাখ টাকা পচছে।

তা পচছে।

তবে আর পচবে না। সেটা আর ভাঙল না বিল্টু।

সেটাই 'কড়ার' অর্থাৎ শর্তর একটা পয়েন্ট। পাঁচজনকে বলে বেড়াতে হবে না এক্ষুনি।

আসলে তখন সেই হাটের মধ্যেই কেনো বিল্টুকে একধারে নিয়ে গিয়ে বলেছিল, আচ্ছা দাদাবাবু, মবলগ কিছু টাকা পেয়ে গেলে ভালো কাজে ব্যয় করে না লোকে? ঠাকুর দেবতাকে উচ্ছুগ্যু করলো কী মন্দির পিতিষ্ঠে করলো।

বিল্টু বলে, তা শুনেছি বটে করে।

তো কেনো যদি ওই পেরাইজের টাকাগুলান ঠাক্‌মার গোপালের নামে উচ্ছুগ্যু করে?

ধ্যাৎ। সে কী?

ধ্যাৎ নয়। ওইটিই কেনোর বাসনা। গোপাল ঠাকুরও কি তোমাদের মতন নাক উঁচু? যে বলবে—হতভাগা কেনোর টাকা নিতে যাবো কেন? তো পেরাইজটা গোপালের হয়ে গেলেই তা থেকে তেনার ঘরবাড়ি মেরামত মন্দির বানানো এসব হতে বাধা থাকবেক নাই।... তৎপরে—

আঙুল গুনে গুনে বলে কানাই, কেনোকে আবার সকল কর্মের ভারটি দিতে হবে। কেনোকে 'তুমি' বলা চলবে না এবং 'কানাই' বলা চলবে না। 'কেনো, তুই' বলতে হবে। আর কেনোকে দাদাবাবুর পুরাতন জামা-পোশাক পরা করিয়েই মানুষ করতে হবে। রাজি?

আচ্ছা বাবা রাজি। রাজি। রাজি।

তো ঘরে গিয়ে আর সকলকে রাজি করাও গে। কেনো এই সোমবারেই আবার দাঁত বার করে গিয়ে হাজির হবে। তো যে কথা সেই কাজ।

ঠিক গিয়ে হাজির হয় কেনো দাঁত বার করে। বেশির মধ্যে গামছার পুঁটুলিতে এক বোঝা আকন্দপাতা।

নে এলুম ঠাকমার জন্যে। জঙ্গলে জঙ্গলে দেকি আর ঠাক্‌মার জন্যে মন কেমন করে।

বাড়িতে আবার দাঁতের বাহার।

ও কেনো! তুই এই এতো আকন্দপাতা বয়ে এনেছিস? ঠাকমা কি আকন্দপাতা পেতে শোবে?

ও কেনো! তুই কোন প্রাণে অমন না বলেকয়ে চলে গেছলি?

ও কেনো! তুই গিয়ে পর্যন্ত আমাদের হাঁড়ির হাল।

ও কেনো! চল আজ তোকে নিয়ে বাজারে বেরোই।

কেনো। কেনো কেনো।

ভুলেও আর কানাই নয়। তাহলেই মা যশোদার কানাইয়ের মতো সটকান দেবে।

খেতু ঠাকুমা আকন্দপাতার সেঁক দিতে দিতে গোপালের সঙ্গে গল্প চালান, অ গোপাল, ওই 'ভাগ্যলক্ষ্মী'র প্রাইজটা তাহলে 'তুমিই গ্যাঁটালে? তা বেশ করলে। যা জম্পেশ একখানা মন্দির বানাবো না তোমার! দেখে তাক লেগে যাবে!

কিন্তু কেনো! তুই নিজে হাতে কিছু খরচা করবি না। এই দু-বছর ধরে টাকাগুলোর তো অনেক সুদ হয়েছে। তাই থেকেই কর। না হয় কালীঘাটে পুজোই দিয়ে আয়।

কানাই লজ্জিতভাবে বলে, তো নিহাৎই যদি নিতে হয় তো, বলি কি খুড়োকে দুশো, পাঁচশো, সাতশো, বারোশো যা হোক একটু দিয়ে আসি।

অ্যাঁ। তোর সেই খুড়োকে? সেই পিঠে চ্যালাকাঠ পেটানো?

আহা, যতই হোক বাপের ভাই তো। বংশের গুরুজন তো। কেনোর 'ভাগ্যলক্ষ্মীর' ভাগটা একটু পাক।

সময়ই পাওয়া গেল না

রেলগাড়িতে চড়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের মধ্যে জায়গা দখল নিয়ে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা থেকে তুমুল ঝগড়ায় পৌঁছোনো— এ তো চিরকালীন ব্যাপার।

তায় আবার যদি কামরাটা সেকেন্ড ক্লাস (এ-যুগের 'সেকেন্ড ক্লাশ' অবশ্য) হয়, আর স্বভাবতই গুড়ের নাগরি ঠাসা অবস্থা হয়।

হতেই হয়!

এ-গাড়ি যে এখন তীর্থযাত্রীতে বোঝাই। আর তীর্থযাত্রীরা যে হক সামলাতে মরিয়া হয়ে ওঠেন, এ আর কার অজানা! এ-গাড়িখানা 'রথযাত্রা স্পেশাল'। সবাই ছুটছেন রথের রশিতে একটু হাত ছোঁয়াবার সংকল্পে।

সকলের মুখে মাঝে মাঝে ধ্বনি, 'জয় জগন্নাথ! জয় জগন্নাথ!'

তার সঙ্গে ঠ্যালাঠেলি, গুঁতোগুঁতি, অন্যের পোঁটলাপুঁটলিকে অছেদ্দায় দূরে নিক্ষেপ!

এর মধ্যে অনেকেই তো পয়সাকড়ি খরচা করে আরামে বসবার, আর রাতে শোবার জন্যে সিট রিজার্ভ করে রেখেছে, তারাও এখন কোণঠাসা। গুড়ের নাগরি ঠাসা। কে কার কড়ি ধারে?

বাকিরা তো সবাই সদ্য টিকিট কিনে গাড়িতে চড়ে বসা রা- মাল।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর সাধারণত মোটামুটি ঝগড়া একটু থিতোয়। কেমন করে যেন সকলেই একখানা পা রাখবার মতো অন্তত জায়গা পেয়ে যায়। আর তখন হিসেব করতে বসে মালপত্তর সব যথাযথ এসে গাড়িতে উঠেছে কি না।

কিন্তু আজ এই 'রথযাত্রা স্পেশালটির এই কামরাখানাতে বৃদ্ধের ঝগড়া আর থামছে না! ক্রমেই যেন তুঙ্গে উঠছে! কেউ কাউকেই ছেড়ে কথা কইছে না। ভাবটা দুর্যোধনের প্রতিজ্ঞার মতো 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'!

দুই বৃদ্ধের এমন তাল ঠোকা বেশ হাস্যকরই। অন্য যাত্রীরা ভিড়ে চিঁড়েচ্যাপটা হয়েও দিব্যি মজা দেখছে।

মাঝে মাঝে কেউ কেউ আবার একটু একটু টক ঝাল নোনতা মন্তব্য করে আগুনে বারুদের মশলা ফেলছে!

কিন্তু হঠাৎ কী থেকে যে কী হল! আগুনে জল পড়ল।

ফাইট যখন একেবারে তুঙ্গ সীমার মগডালে উঠে পড়েছে, তখনই এক বৃদ্ধের হুংকার ধ্বনিতে এই অলৌকিক কাণ্ডটি ঘটে গেল।

সেই বৃদ্ধের ফুলহাতা ডোরাকাটা ছিটের শার্টের গোটানো আস্তিনের পাকটি এলিয়ে গেল, আর অপর বৃদ্ধের থ্রি-কোয়ার্টার হাতা সাদা লংক্লথের পাঞ্জাবির আস্তিনটা আধ-গোটানো হয়েই থেমে গেলো।

কিন্তু কী সেই হুংকার ধ্বনি? যাতে এমন অভাবিত ঘটনাটি ঘটে যেতে পারে?

এমন কিছুই নয়।

'তোকে খুন করে ফাঁসি যাব' বা 'তোকে ডালকুত্তাকে দিয়ে খাওয়াবো'— এ ধরনের কোনো সংকল্প ঘোষণা নয়।

হুংকারটি ছেড়েছিনেল ফুলহাতা শার্টই।

বলে উঠেছিলেন, 'কী? বরিশালের জঙ্গলবাগান পাড়ার হরবোলা চক্কোত্তিকে তুই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিবি? অ্যাঁ। দেখি তো কত হিম্মত?'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে থ্রি-কোয়ার্টার হাতার দু'খানা হাত প্রায় ঊর্ধ্ববাহু হয়ে গিয়ে, হাতের মালিক বলে উঠলেন, 'অ্যাঁ? কী কইলা? বরিশালের জঙ্গলবাগান পাড়ার হরবোলা চক্কোত্তি ডাক্তার পাড়ার পাশের জঙ্গলবাগান পাড়া?... মানে চক্কোত্তি বাড়ির? অ্যাঁ? মানে—'

বারকয়েক ওই 'অ্যাঁ' আর 'মানে'র পর হঠাৎ দুই বৃদ্ধ হো হো করে হেসে উঠে পরস্পরকে জাপটে ধরে বলে ওঠেন, 'আর—আমরা দুই মূর্খয় এতক্ষণ কেজিয়া করে মরছি?'

তারপর?

আবেগ আতিশয্যে আর আক্ষেপের বন্যায় প্রায় ভেসেই যেতে বসেন দু-জনে।

'বলি কত বৎসর দেশ ছাড়া?'

'তা হইল চল্লিশ বৎসর সাত মাস। তুই?'

'আমি? আমার এই দুই বৎসর চাপান দেওয়া চাল্লিশ। জাঠা মরে গেল, বাবা আর কার ভরসায় রইবে?'

মজা দেখনেওয়ালা লোকেরা এই 'সম্মুখ সমরের' উত্তাল মুহূর্তে এমন স্যাঁতসেঁতে পরিণতি দেখে আর ওদিকে মন না দিয়ে যে যার নিজের ব্যবস্থায় মন দিল। তবে ছোটো ছেলেমেয়েগুলো দুই বুড়োর হঠাৎ হঠাৎ হুংকার মেরে উঠে জাপটাজাপটি দেখে হেসেই অস্থির!

'অ্যা! তুইও ঘোড়াপুকুরে ছিপ ফেলতে যেতিস? তার আমরা কিনা এতক্ষণ—'

'অ্যাঁ! তুইও লোচন ফকিরের আখড়ায় গেছলি একদিন? হায়! হায়! আমরা এই দু'ঘণ্টা কাল সময় কী বরবাদ দেলাম গো।'

অতএব একক্ষেপ করে আবার জাপটাজাপটি।

'গড়াই! তুই বোধকরি আমার থেকে বছর দু-তিনের ছোটো!'

'তা হত পারে। বয়েস নিয়ে কে আর রোজ রোজ হিসেব করতে বসতেছে?'

'বলি তুই কি ওই জঙ্গলবাগান পাড়ার হাইস্কুলে পড়তিস?'

'হাই ইস্কুলে? শোনো কথা! গড়াইবাড়ির ছাওয়ালরা আবার ইস্কুল পাঠশালায় গেছে কবে? জ্ঞান অবদিই তো বাপজ্যাঠার তামুক সেজেছি, আর তেনাদের ভুসিমালের দোকানে গিয়ে বসেছি দোকান আগলাতে। তো আপনি বুঝি—'

'এই মরেছে! আপনি আবার কী রে? হঠাৎ আবার শহুরে কেতায় আপনি আজ্ঞে ক্যানো? বেশ তো চলছিল! কতকাল তুইতোকারি করে কথা কইতি পাইনি রে!'

'তো বরিশাল কি আর গেরাম ছিল চক্কোত্তি? ষোলো আনা শহরই তো।'

'তা হোক! এমন রস-নিংড়ানো শহর ছিল না!'

গাড়ি ছুটে চলে পূর্ণবেগে রাতের অন্ধকার ভেদ করে।

অতঃপর এই দুই বৃদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন চলে আরও অধিক বেগে।

এই চল্লিশ বেয়াল্লিশ বছরকাল কে কোথায় থেকেছে, আর জীবনযাত্রায় কে কোন পথে গিয়েছে, মাঝে মাঝে সে-সব কথা হলেও বেশির ভাগ কথাই সেই বরিশালভিত্তিক।

হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, এঁদের একজন সেই 'জঙ্গলবাগান পাড়া' ছেড়ে এসেছেন বছর পনেরো বয়সে আর অপরজন বছর তেরোয়।

পাকসিটে আর থলথলে, এই দু-ধরনের চেহারাতে দু-জনকেই বয়সের অপেক্ষা বৃদ্ধ দেখিয়েছে।

এখন অবশ্য আর তা দেখাচ্ছে না।

দু-জনেরই মুখেচোখে যেন সেই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগেকার লাবণ্য ঝলসে উঠছে মাঝেমধ্যেই।

সহপাঠী নয়, সমবয়সিও নয়, পরিচয়ে এক শ্রেণিরও নয়। তবু এই কামরাভর্তি লোকের মধ্যে দু-জনে যে কেমন করে দিব্যি আমে-দুধে মিশে গিয়ে বিভোর হয়ে বসে আছেন দেখবার মতো। শোবার চেষ্টা নেই, ঘুমের চিন্তা নেই। গল্প আর গল্প! কারণ?

কারণ আর কিছুই নয়, দ-জনেই বরিশালের এবং প্রায় একই পাড়ার।

এ-কথা মানতেই হবে পদ্মার ওপারের লোকেরা যেমন 'দেশোয়ালি' ভক্ত, পদ্মার এ-পারেররা তার ধারেকাছেও যায় না।

দেশ-টেশ এর ধারও ধারে না এরা তেমন।

দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার জন্যে যারা দীর্ঘদিন আর তাদের ছেলেবেলার গ্রামে ফিরে যেতে পায়নি তাদের কত হা-হুতাশ, কত কবিতা, গল্প, স্মৃতিচারণ, হাহাকারের সাহিত্য।... অথচ যাদের ওসব ভাগ-টাগ হয়নি, তারা কলকাতায় বসে থেকেই কলকাতা থেকে হয়তো ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরের ছেলেবেলার গ্রামে ত্রিশ-চল্লিশ বছরে একবারও যায়নি, যায় না— তার জন্যে মনকেমনের বালাইও দেখা যায় না।

এনাদের ব্যাপারই আলাদা। পদ্মার ওপারের জনেদের! এঁরা মন-মেনেই সারা।

কাজেই বরিশালের শ্যাম গড়াই আর হরবোলা চক্কোবত্তি দু-জনে দু-জনকে একবার যখন হাতে পেয়েছে তখন আর ছাড়ে?

হরবোলার আসল নাম অবশ্য 'হরবোলা' নয় হরনাথ। ছেলেবেলায় নানান পশুপাখির ডাক ডাকতে পারত, মুখেই চলন্ত রেলগাড়ির আওয়াজ তুলতে পারতো। পালকি বেহারার, গরুরগাড়ির গাড়োয়ানের বোলচাল ছাড়ত, তাই সবাই ওই নামটা দিয়েছিল। তদবধি ওঁর নিজেরই বলে বলে অভ্যাস হয়ে গেছে।

গড়াই বললেন, 'তাহলে যাচ্ছো কোথায় চক্কোত্তি?' চক্কোত্তি বললেন, 'শোনো কথা। চেপেছি 'রথযাত্রা স্পেশালে', আর যাচ্ছি কোথায়?'

আরে না না। বলছি ওখানে গিয়ে উঠবে কোথায়?'

'এখানো ঠিক করিনি! দেখি যদি কোনো ভালো ধর্মশালা-টালা পাই, নচেত হোটেলে।'

শ্যাম গড়াই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন, 'ধর্মশালা? কোন যুগের কথা বলছ হে চক্কোত্তি? এ-যুগে আর ভব্যিযুক্ত কোনো ধর্মশালা তুমি পাবে? তাও এই রথের সময় শ্রীক্ষেত্রয়! হুঁ! হোটেলও তো আগে থেকে বুক করে না রাখলে ঠাঁই পাবে না। তো বলছি কি এই গরিবের চক্রতীর্থের কাছে একখানা কুঁড়ে আছে, এখন রথযাত্রা বলে সেখানে আমার ফ্যামিলি এসে রয়েছে, দু-বেলা হাঁড়ি চড়ছে। যদি সেখানেই এসে ওঠো দয়া করে।'

'আরে ছি ছি! দয়া আবার কী! এতে তো আমারই সুবিধে। তবে কিনা তোমার বাড়ির লোকেরা যখন সেখানে এসে রয়েছেন এখন, হঠাৎ উঠকো একটা লোক গিয়ে ঢুকলে অসুবিধা বোধ করবেন তো তাঁরা?

আঃ রাম! রাম! বলি যখন শুনবে বরিশালের লোক,, তখন উটকো ভাববে? আমার পরিবারও তো বরিশালের মেয়ে গো! তোমায় দেখলে আহ্লাদে আটখানা হবে। আর থাকবে শুনলে মাথায় করে নাচবে। না না, পেয়েছি যখন, তখন আর ছাড়ি!'

না, তিনি আর ছাড়লেন না। ওই থলথলে গড়ন, টাকমাথা শ্যাম গড়াই পাকসিটে চেহারার হরবোলা চক্কোত্তিকে সাট্টেপাট্টে ধরে নিয়ে গেলেন নিজের সঙ্গে।

তা শ্যাম গড়াই ভুল বলেননি। গড়াইগিন্নি সত্যিই উটকো লোকটা বরিশালের জঙ্গলবাগান পাড়ার ছেলে শুনে আহ্লাদে প্রায় কেঁদেই ফেললেন। ওই 'জঙ্গলবাগান পাড়া' যে তাঁর মামার বাড়ি।

তারপর আর কী?

দুই পরিবার এক পরিবার। অর্থাৎ চক্কোত্তিই গড়াই পরিবারের একজন হয়ে গেলেন। একসঙ্গে মন্দির দর্শন, জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্রস্নান, খাওয়া মাখা।

গড়াইগিন্নি এক একবার বলেন, 'দুই বন্ধুতে একথালায় জলখাবার খাওয়া? আপনি হচ্ছেন দাদা ব্রাহ্মণ মানুষ, আর আমরা—'

হরবোলা হা হা করে হাসেন, 'আরে বাবা, রাখো তো দিদি তোমার ব্রাহ্মণ মানুষ। হরবোলার অত বামনাই নেই। বামুনের যুগ্যি কাজ করছি? একখানা ছাতা-জুতোর দোকান দিয়ে তো বসে আছি।'

আহ্লাদ! আহ্লাদ! আহ্লাদের সাগরে ভাসাভাসি। কিন্তু—এঁদেরই এত আমোদ আহ্লাদ। শ্যাম গড়াইয়ের বাড়ির লোকেরা তেমন মানে তাঁর ছেলে, ছেলের বউ আর নাতিনাতনি দুটো—এরা মোটেই তেমন সন্তুষ্ট নয়।

একে তো নাতিনাতনিরা দাদুকে আদৌ পাচ্ছে না। দিদিও প্রায় বেহাত। মামার বাড়ির পাড়ার ছাওয়ালের আদর-যত্ন আপ্যায়ন অভ্যর্থনা নিয়ে। আবার এদের মাকেও ওই বুড়োর জন্যে বেশ খাটতে হচ্ছে। দাদুর যখনতখন অর্ডার, 'বউমা, তোমার নতুন জেঠুকে সেই খাবারটা খাওয়াও তো মা আজ। সেই, যেটা তুমি খুব ভালো বানাও।'

কী সেটা?

হবে হয়তো একটা কিছু। দাদু তার নামটি ভুলে বসে আছেন। তাতে কী! মা তো হরেকরকম ভালো রান্নাই জানেন। করুন যেটা ভালো মনে করেন। তাতেই ওই দুটো বুড়ো মোহিত!

তাহলে?

এর জন্যে ঘণ্টু আর মন্টি দু-ভাইবোনের মায়ের খাটুনি না? বেড়াতে যাবার সময় নেই, দোকানে যাবার সময় হয় না।

পুরীতে অবশ্য ওদের এই প্রথম আসা নয়। বারবারই এসেছে। নিজেদের এমন সুন্দর একখানা বাড়ি রয়েছে যখন সমুদ্রের ধারে! তাহলেও কোথাও এলে দোকানে যাওয়া হবে না এ তো আর হয় না? কেনাকাটাই যদি না হল তো বেড়াতে আসা কেন?

রথ মিটে গেলে আরও বেশ কিছু দিন থাকার কথা। অর্থাৎ ঘণ্টু-মন্টির যতদিন ছুটি থাকবে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? ওই বুড়োও তাই থাকবে নাকি?

ঘণ্টু চুপিচুপি বলেই ফেলে, 'দিদি! ওই হরবোলা বুড়োও থাকবে নাকি ততদিন?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। দাদুর ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হচ্ছে হয়তো

কলকাতার বাড়িতেও নিয়ে যাবে! বাপিও তো অফিসের ছুটি ফুরিয়ে গেল বলে ফিরে গেলো। আমাদের কী হবে?'

'আচ্ছা দিদি! দাদু ওই বুড়োটার মধ্যে কী এত আনন্দ পায় রে!'

'ভগবান জানেন। কথার মধ্যে তো সেই "আমাদের বরিশাল" আর "পদ্মা মেঘনা"। দুই বুড়ো সেদিন কী বলাবলি করছিল, শুনেছিলি?'

'কী?'

'বলছিল কিনা, সমুদ্দুর খুবই ভালো। তবে পদ্মার কাছে লাগে না।'

'অ্যাঁ। হি হি হি! যত সব বোকা বোকা কথা।'

'গল্পের মধ্যে তো সেই গোয়ালন্দের ইস্টিমারের গল্প। যা শুনে শুনে কান পচে গেছে। এখন দুই বুড়োয় রোজই নতুন করে সেই গল্প। সেই মাঝিমাল্লাদের রান্না, অপূর্ব ডিমের ঝোল ভাত আর ইলিশ ভাজা। সেই 'পাতক্ষীর' আর 'প্রাণহরা সন্দেশ'! সেই বাখরখানি না কী যেন। শুনলে মনে হবে পৃথিবীতে অমন সুখাদ্য আর হয়নি হবে না! রোজ একই গল্প! কী করে যে ভালো লাগে।'

'তা লাগুক গে। কিন্তু ওই শুটকো বুড়ো যদি শেষ পর্যন্ত থেকে যায়, নির্ঘাত দাদু ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে কলকাতার বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করবে।'

'ওর ঘর-সংসার নেই?'

'কে জানে?'

'নাঃ, এবারের ছুটিটাই মাটি!'

'কী করে বুড়োকে ভাগানো যায় বল তো? সমুদ্দুরের ধার থেকে খুদে খুদে কাঁকড়াদের এনে ওর জুতোর মধ্যে ভরে রেখে দেব? শামুক কুড়িয়ে এনে বিছানার চাদরের তলায় ঢুকিয়ে রাখব? ধুতিগুলো ফালা ফালা করে ছিঁড়ে রাখব?'

'দুর হাঁদারাম। ধরা পড়ে যাবি না? আর ধরা পড়ে গেলে কী দশা হবে ভাব। সমুদ্দুরে ডুবে মরতে হবে।'

মন্টি ভেবেচিন্তে বলে, 'আচ্ছা, দাদু একদিন এখানের পোস্ট অফিস থেকে বাবাকে ফোন করেছিলো না?'

'তা তো করেছিল। তাতে কী? তুই বাবাকে ফোন করে সাবধান করে দিবি দাদু তার 'বরিশাল'কে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে?'

মন্টি ভাইকে নস্যাৎ করে বলে, 'আরে দুর! আমার অন্য মতলব। রঞ্জনদাকে একটা ফোন করে ঘটনাটা জানিয়ে কীভাবে প্রতিকার হতে পারে তার পরামর্শ নেব।'

রঞ্জন এদের মামাতো দাদা। সকল পরামর্শের শুরু। রঞ্জনের বুদ্ধি-কৌশলে ওরা অনেক সময় অনেক সমস্যা-সাগর পার হয়েছে।

'রঞ্জনদা' বলতে এরা অজ্ঞান। ছেলেটা যেমন দেখতে হাসিখুশি মাখন মাখা মতো, তেমনি ভিতরে ভিতরে ফিচেল মার্কা!

ঘন্টুর থেকে ছ-বছরের আর মন্টির থেকে চার বছরের বড়ো।

মন্টি বলে, 'তোর মনে আছে ঘন্টু? সেবারে আমাদের শুধু মা, বাবা তোর আর আমার গোয়ায় বেড়াতে যাবার সময় আমাদের সেই গুঁফো পিসেমশাই আমাদের সঙ্গে যাবে বলে ধরে বসল, তখন রঞ্জনদা কেমন বুদ্ধি করে সেটি বন্ধ করে দিল!'

'হুউউ! বোধ হয় মনে আছে। গুঁফো পিসে সঙ্গে যাবে শুনে আমাদের তো হয়ে গেছলো। তো কী করে ফোন করা হবে?'

'কী করে আবার? সোজা গিয়ে একটা দু'টাকার নোট গুঁজে দিয়ে রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে—'

'তুই পারবি?'

'কেন পারব না? সেদিন দাদুর সঙ্গে যাইনি বুঝি? দেখে শিখে এসেছি।'

'মা-র কাছ থেকে একটা দু-টাকার নোট হাতিয়ে আন তাহলে?'

মন্টি সতেজে বলে, 'কেন? মার কাছ থেকে কেন? আমার নেই বুঝি? দ্যাখনা আমার মানিব্যাগে কত টাকা!'

ঘণ্টু একটু ম্রিয়মাণভাবে বলে, 'সত্যি দিদি, তুই বেশ আছিস! তোকে মা 'পকেট মানি' বলে পুরো দশ দশটা টাকা দেয় মাসে মাসে। আর আমার বেলায়? ছেলেমানুষ টাকাপয়সা নিয়ে কী করবে? যা দরকার তা বললেই তো পেয়ে যাও। যেন 'দরকার' ছাড়া মানুষের আর কিছু দরকার থাকতে পারে না! তো কখন যাবি?'

'দেখি কখন কী ছুতো করে বেরোনো যায়!'

এই হেন গুরুতর বিষয় আলোচনার সময় কিনা সমুদ্রমুখী এই বারান্দাটায় দুই বৃদ্ধের আবির্ভাব। একেবারে ছন্দপতনের মতো!

শ্যাম গড়াই হরবোলা চক্কোত্তিকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে এসে বলে ওঠেন, 'এই যে চক্কোত্তি, তুমি আমার এই নাতিটারে বিশ্বাস করাও তো আমাদের ছেলেবেলায় বরিশালে টাকায় আঠারো সের খাঁটি গোরুর দুধ মিলত কি না? ছাওয়ালটা আমার কথা বিশ্বেস করে না। বলে দাদুর সব গুলতাপ্পি। দাদুর হিসেবপত্তরের ঠিক নাই।... আর তামাশা করে, দাদু, তোমার

ছেলেবেলায় তোমাদের বরিশালে পয়সায় দশটা ল্যাংড়া বোম্বাই আম পাওয়া যেত না? চার আনায় ইয়া বড়ো একজোড়া ইলিশ?'

ব্যস।

সঙ্গে সঙ্গে হরবোলা উদ্দীপ্ত।

'তা তামাশার কী আছে হে নাতিসাহেব? অবিশ্যি ল্যাংড়া বোম্বায়ের অত চলন ছিল না ওখানে। ছিল হিমসাগর, গোপালভোগ কিষেণভোগ, নবাবপছন্দ, কালো মানিক! পয়সায় দশটা, এ আর বেশি কী? দু'আনা দশ পয়সায় একখানা ইয়া পেল্লাই ঝোড়াই বসিয়ে দিয়ে যেতো। আবার খোকাবাবুরা খাবে বলে বাড়তি দু-চারটে দিয়ে যেতো দুধের কথা বিশ্বেস করছ না দাদা? নিয্যস ছিল টাকায় আঠারো সের! আর সে কী দুধ! একেবারে বটের আঠা! তোদের এখানের গোয়ালা হলে তাকে 'ওয়াটার প্লাস' করে এক সেরকে পাঁচ সের করে তুলত!

আরে ভাই তখন তো আর অদৃশ্য একশো পয়সায় টাকা ছিল না। ছিল ষোলো আনায় টাকা। চকচকে চৌষট্টি খানা তামার পয়সা। তার মান্যই আলাদা। তো ওই যে আমাদের দুধ দিতে আসতো ইলাস গোয়ালা! সে-ও ঘটির মাপে দুধ মেপে-টেপে দিয়ে হাঁক পাড়ত—'খোঁকাবাবু তোমার গিলাস আনো।'

আমার গিলাস মানে হচ্ছে ও আমার জন্যে বাড়তি এক পোয়া ফাউ দিত। তো সেই এক পোয়া মাপের গেলাসটা মজুত রাখা হত। ঢেলে দিয়েই আবার বলত, 'কিছু বাদে তুলবে খোঁকা।' কারণ কী? না দুধের ওপর চুড়ো করে ফেনা থাকত। তখন নাড়াচাড়া করলে উপচে পড়ে যাবে, তাই।'

ঘণ্টু সতেজে বলে, 'রোজ আপনাকে এক গেলাস দুধ ফাউ খাওয়াতো। আর আপনি তাই খেতেন? তাতে আপনার মান থাকতো? বাড়ির লোকেরও তো সেটা অপমান।'

হরবোলা অবাক হয়ে বলেন, 'মান থাকবে না? অপমান? তার মানে?'

'বাঃ রোজ রোজ' একজনের কাছে বিনা পয়সায় কিছু খাওয়া, এ খুব মান্যের? তাও সে হচ্ছে গরিব লোক।'

হরবোলা চক্কোত্তি গম্ভীরভাবে বলেন, 'গরীব সে ছিল না ভাই 'ভালোবাসায়' মস্ত ধনী ছিল। আমরা যদি বলতাম, বিনা পয়সায় রোজ দুধ নেব কেন? তাহলে সে অভিমানে মরে যেত না? তার মান যেত না? যাদের সঙ্গে আমাদের সর্বদা কারবার ছিল, তাদের কাউকেই আমরা 'গরিব লোক' ভাবতুম না, আপনজন ভাবতুম গোয়ালা, ধোবা, পরমানিক, ছুতোর,

কামার, কুমোর, তাঁতি সবাইয়ের সঙ্গে এক একটা সম্পর্ক পাতানো ছিল। চাচা, দাদা, জ্যাঠা, মামু ছিল এইসব। সেই ছেলেবেলায় আমরা জানতুম ওরা সত্যিই আমাদের আত্মীয়!'

মন্টি বলে ওঠে, 'আহা গো। আপনাদের যেন জাতপাতের কট্টর গোঁড়ামি ছিলো না? হিন্দু না অহিন্দু এইসব বিচার ছিল না? জানি না বুঝি?'

শ্যাম গড়াই দুঃখের সঙ্গে বলেন, 'ওই তো! ওই নিয়েই আমার সঙ্গে রাতদিন তক্কো! ওদের সঙ্গে যে আমাদের সম্পক্কটি কেমন ছিল বোঝাতে পারি না। বাইরে আচারে আচরণে হয়তো একটু ছিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোনো দূরত্ব ছিল না! আমার পিসি আর জেঠি ছিল দুর্দান্ত শুচিবাই। বাড়িতে মিস্ত্রি লাগলে, ঘর সংসারের জিনিসপত্তর সরিয়ে রাখতে কী তোলপাড় কান্ড! পাছে কিছু ছোঁওয়া যায়, পাছে কিছু চুনকামের বুরুশের জলের ছিটে লাগে। কিন্তু—'

ঘণ্টু হি হি করে হেসে উঠে, 'সেই কথাই তো বলছে দিদি। যতসব ছুঁৎমার্গ।'

হরবোলা চক্কোত্তি আবার গভীর গম্ভীর ভাবে বলেন, 'সে ব্যাপার আমাদের বাড়িতেও দেখেছি ভাই। ওটাই ছিল তখন প্রথা। কিন্তু আবার এও দেখেছি—মিস্তিরিদের কাজ চুকে গেলে ঠাকুমা একদিন তাদের সক্কলকে নেমন্তন্ন করে, তা সে যোগাড়েটাকে পর্যন্ত, কাছে বসে যত্ন করে খাওয়াতেন। মিস্তিরি বলে আজেবাজে খাওয়া নয়! তাদের জন্যে হয়তো-বা সেদিন পুকুরে জাল ফেলা হত। অনেকরকম রান্না না হোক ডাল, ভাত, চচ্চড়ি, টক আর তার সঙ্গে ঢালাও মাছ। ঠাকুমা বলতেন, ওরা এমন বাহার করে বাড়ি বানিয়ে দেয় তাই না আমাদের থাকার এত বাহার! কত দিন আগের কথা, তবু যেন সেই মিস্তরিদের কার কার চেহারা চোখে ভেসে ওঠে। সেই বাহার, আবদুল, রশিদ, বুড়ো মিঞা—'

গড়াই বলে ওঠেন, 'আরে! এরা তো আমাদের বাড়িতেও আসত দেখেছি। অ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ রশিদ, আবদুল, বুড়ো মিঞা—'

নেহাত নাতিনাতনির সামনে তাই, নচেৎ রেলগাড়ির কামরার মতো জাপটাজাপটি হয়ে বসত!

তবে 'অ্যাঁ? সত্যি? সেই পাকাদাড়ি বুড়ো মিঞা?' ইত্যাদি বলতে বলতে যা উচ্ছ্বাস। ওঃ!

উচ্ছ্বাস আর থামে না।

কথা চলেই চলে। 'আসলে কী জানো ভাই, সেকালে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ছিল! সকলের সঙ্গেই সকলের একটা বন্ধন, একটা টান। একটু ভালোবাসা। জমিদারে প্রজায় ভালোবাসা ছিল, মনিবে ভৃত্যে ভালোবাস ছিল, পড়শীতে পড়শীতে ভালোবাসা ছিল। হাটুরে বাজারে কড়েদের সঙ্গে মহাজনদের ভালোবাসা ছিল! নৌকোর মাঝিমাল্লা, চাষিবাসী ঘর-গেরস্থী সকলের মধ্যেই সেই একটা ভালোবাসা ভালোবাসার ভাব। ছিল না রে?

বাড়িতে কোনো কুটুম কি আত্মীয় বেড়াতে এলে সহজে ফিরতে পারত সে? দু-দিনের জন্যে এসে দু-হপ্তা পার।

কেবলই অনুরোধ উপরোধ, আর দুটো দিন থেকে যাও। এক একটা দিন থেকে যাও। নিদেন আর একটা বেলাও থেকে যা-ও। এ-গাড়িতে না গিয়ে পরের গাড়িতে যেও তবু আর দু-ঘণ্টা থাকা হবে জনে জনে সব্বাই সেই অনুরোধের ধুয়ো ধরে চলেছে এমনকী বাড়ির কাজকরুনি লোকেরাও বলতে থাকবে—মাসিমা আর দুটা দিন থেকে যান না। পিসিমা আর কডা দিন থেকে যান না। মামাবাবু, পিসে-ঠাকুর আর কডা দিন থেকে গেলে ভালো হতো! আর বাড়ির ছোটো ছেলেরা? তারা তো যেতে না দেবার ফন্দিতে অতিথিদের জুতো লুকিয়ে রাখছে, ঘড়ি, চশমা, ব্যাগ, ছাতা সরিয়ে ফেলে লুকিয়ে রাখছে, যদি ওতেই যাওয়া আটকায়। সকলের মধ্যেই ছিল এমনি আগ্রহ আর ভালোবাসা।'

ঘণ্টু আর মন্টি ভয়ে ভয়ে চোখাচোখি করে।

কী রে বাবা। এঁরা কী এদের দু-ভাইবোনের ষড়যন্ত্র শুনে ফেলেছেন নাকি? এসব কথা কেন?

বাঃ। তা কী করে হতে পারে? এরা তো এই এখানে চুপিচুপি পরামর্শ করছিল।

ও কিছু না।

ওঁদের সেই নাটুকেপনা স্বভাবের বশেই এত কথা বলে চলেছেন।

বাবাঃ! সাধে ষড়যন্ত্র। সবসময় এত আবেগ আদিখ্যেতা ভালো লাগে?

পৃথিবীতে যেন আর কোনো কথা নেই।

'আচ্ছা চক্কোত্তি, তোমার মনে আছে—ডাক্তারপাড়ায় যে একটা পিরবাবার দরগা ছিল—'

'আচ্ছা গড়াই তোমার মনে আছে, সেই যে—'

ঘণ্টু মন্টি চিমটি কাটাকাটি করে।

অর্থাৎ 'ওই হল আরম্ভ। ওঃ। অসহ্য! বুড়ো দুটোর ওই আদেখলেপনা আর নাটুকেপনা দেখলে মাথা জ্বলে যায়।'

শুধু কি ওইটুকুই?

আরও কত কী!

রাগও ধরে, আবার হাসিও পায়।

দুই ভাইবোন তাদের মায়ের কাছে গিয়ে হেসে লুটোপুটি।

'মা। মামণি। দাদু পদ্য লিখেছে। আর সেটি বন্ধুকে দেখাচ্ছে।'

'শুধু দেখানো? প্রেজেন্ট করছে তো! বলছে, নাও না চক্কোত্তি এটা তোমার কাছেই রাখো। ও মা—ভাবতে পারো? দাদু পদ্য লিখছে।'

ওদের মা কষ্টে হাসি চেপে বলে, 'অ্যাই হচ্ছেটা কী? গুরুজনকে নিয়ে ঠাট্টা।'

'ঠাট্টা কী গো মা? সত্যি সত্যি। শুনবে? আমার তো শুনে শুনে মুখস্ত হয়ে গেল—

বরিশাল। বরিশাল।

দেখি নাই তোমারে যে কতকাল!

জানি না এখন তোমার হইয়াছে কী বা হাল!

বরিশাল। বরিশাল।'

'মা! দাদু যদি ওই 'বরিশাল'কে কলকাতার বাড়িতে নিয়ে যায়?'

মা সাবধানে বলে, 'গেলে আর উপায় কী? তো ওঁর নিজের তো ঘরসংসার আছে? নাকি নেই?'

ওইটুকুই যা ভরসা!

কোনোমতে আরও দুটো দিন কাটে।

ইতিমধ্যে শ্যাম গড়াই নাকি আরও একটি পদ্য লিখে ফেলেছেন।

এবং ঘণ্টু তক্কে তক্কে থেকে সেটিকে একেবারে বাগিয়ে এনে মায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি।

মুশকিল এই, দিদাও এই বোকাটেদের দলে।

বাবাও কলকাতা চলে গেছেন।

মা ছাড়া আর গতি নেই।

'ওমা! শোনো, শোনো—

হরবোলা ভাই হরবোলা!

এতটা কাল কোথায় ছিল তোর ঝোলা?

সে ঝোলা যতই খুলিস, ততই অবাক!

কত ছিল জমা!!

সোনা রুপো, মুক্তো হিরে, পান্না চুনির বোমা!

হি হি হি! 'বোমা।' দাদুকে জিগ্যেস না করে পারিনি। 'দাদু, ভালো, জিনিসের সঙ্গে বোমার তুলনা কেন?' তো দাদুর কী জবাব জানো? 'ওরে ওইসব ভালো ভালো জিনিসই যেই এক একটা করে বার করছে বুকের মধ্যে যেন বোমা দাগছে। খবরের কাগজে যাকে বলে 'বিস্ফোরণ' না কি, তাই হচ্ছে ভেতরে। ওই হরবোলাও নাকি মাঝরাত্তিরে উঠে প্যাঁচা ধরার চেষ্টা করত! তা'লে বল? শুনলে বুকে বোমা দাগবে না?'

'প্যাঁচা! প্যাঁচা ধরে কী হবে দাদু? প্যঁচাকে কি খাঁচায় ভরে পোষা যায়? লেইপুষ বা কী লাভ? যা বিচ্ছিরি ডাক।'

'আরে না না! কালো প্যাঁচা তো নয়। লক্ষ্মী প্যাঁচা! একবার যদি একটাকে ধরে এনে ধানের গোলার মাথায় বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সাত পুরুষ ধরে নাকি চিরকালের জন্যে লক্ষ্মীমন্ত থাকা যায়। কক্ষন গরিব হতে হয় না। তো পিসি এই কথা বলেছিল বলে আমি ওই প্যাঁচা ধরার তাল করতাম। কিন্তু সে তো আমার পিসি আমাকে বলেছিল। হরবোলাও কিনা তার ঠাকুমার কাছে তাই শুনে ওই কর্ম করেছে। তাহলে ভাব? শুনে আহ্লাদে প্রাণ উথলোবে না? সেটাই বোমাতুল্য।'

চলছিল এই পদ্যর বোমা দাগাদাগির কথা।

হঠাৎ দুম করে ডাকপিওনের হাতে একখানি বোমা এসে পড়ে ফাটল।

তা বলতে গেলে সে তো বোমাই।

দুই বন্ধু সবে জগন্নাথ দর্শন করে ফিরেছেন হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির!

আগে হাতে নিলেন শ্যাম গড়াই-ই। কারণ তাঁর ঠিকানাতেই তো এসেছে। কিন্তু সেটা খুলে চোখের সামনে ধরেই তাঁর থলথলে মুখখানি শুকিয়েছ আমসি।

'এ আবার কী লিখেছে গো? অ চক্কোত্তি তুমি দ্যাখো তো! আমি বাবা ইংরিজি মিংরিজি তেমন বুঝি না। এ যেন বড়ো বিপদের বার্তা।'

বলে হাতটা বাড়িয়ে চক্রবর্তীর হাতে ধরিয়ে দিলেন টেলিগ্রামখানা।

কিন্তু চক্রবর্তী?

তিনি তো এক নজর দেখেই হো হো করে হেসে ওঠেন। 'আরেব্বাস! একেই বলে মাথা নাই তার মাথাব্যথা! হা হা হা!'

গড়াই ওঁর হাসি দেখে একটু স্বস্তি পেয়ে বলেন, 'ব্যাপারটা কী বলো তো? কে কী খবর জানিয়েছে?'

চক্রবর্তী বলেন, 'কে তা জানি না, তবে কী খবর জানিস? হা হা হা—বলেছে, হরনাথ চক্রবর্তী শীঘ্র ফিরে এসো। তোমার স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়।'

'অ্যাঁ।'

'এই মরেছে চমকাচ্ছিস কেন? স্ত্রী কোথায়? যে মরতে বসবে? জীবনের বিয়ে-থা করবার ফুরসত পেয়েছি? কেউ একটা বদ তামাশা করেছে।'

গড়াইয়ের প্রশ্ন, 'কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচা করে কে তোমার সঙ্গে তামাশা করতে বসবে বলো তো হরবোলা?'

'সেই তো কথা। কে, তবে নেহাত কাঁচা কেউ। জানেই না যে আমার স্ত্রী-টির বালাই নাই।'

গড়াইগিন্নি একবার বলে উঠলেন, 'আচ্ছা ওই নামে এই চক্রতীর্থে আর কেউ নাই তো? তংর টেলিগ্রামটা এখানে দিয়ে গেছে হয়ত।'

গড়াই সে কথা উড়িয়ে দেন, 'দুর। পষ্ট আমার ঠিকানা।'

অনেক চিন্তা করা হল। তবে আন্দাজ করতে পারা গেল না, কলকাতাতেই বা গড়াইয়ের এমন কে আছে? যে লোক জানে, তার এখানে হরনাথ চক্রবর্তী নামের একজন ক-দিন রয়েছে।

তাজ্জব!

মন্টি ঘণ্টু অবশ্য এত কথার কিছু জানে না। কী করে জানবে? তারা তো সেই কখন থেকে বাড়ির ছাতে উঠে বইখাতা নিয়ে গিয়ে লেখাপড়া করছে।

করতে হবে না?

ছুটি ফুরিয়ে এল না? গিয়েই ফার্স্ট টার্মিনাল পরীক্ষা না?

তারা নীচে নেমে এসে তো এই মজার খবরটা শুনে হাঁ হয়েই হেসে কুটিকুটি।

'কী বললেন নতুন দাদু। মাথা নাই তার মাথাব্যথা! হি হি হি।'

কিন্তু আড়ালে গিয়ে? ক-জনে মাথায় হাত।

'দিদি! কী হবে? যদি ধরা পড়ে যাই?'

'জানি না বাবা! রঞ্জনদা যে এমন একখানা বিদ্‌কুটে কাণ্ড করবে তা কে জানত!'

'ফোনে তুই বলে দিসনি কেন, ওনার বউ নেই।'

'বাঃ, চমৎকার। আমি কি জানি রঞ্জনদা এই লাইনে প্রতিকার করতে বসবে!

'আচ্ছা দিদি?'

'কী কেবল দিদি দিদি। বল কী বলিছস?'

'মানে বলছি কি লোকে আমাদের সন্দেহ করতে যাবে কেন? আমরা কি পাখি হয়ে উঠে গিয়ে কলকাতা থেকে টেলিগ্রাম করেছি? ওটা তো কলকাতা থেকে এসেছে।'

'তা অবশ্য। দ্যাটস রাইট। আমাদের ওপর সন্দেহ পড়বার কোনো কারণই নেই।'

'কিন্তু দিদি! বুকের মধ্যে যে ভীষণ ভয় ভয় করছে।'

'সেই তো মুশকিল। আমারও!'

'ওই হরবোলা আমাদের দিকে কীরকম করে যেন তাকাচ্ছিলেন না?'

'কই? কখন? তুই একটা ভীতুর রাজা। আমাদের সঙ্গে কী? কে ওঁর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে কে জানে। আমরা কোথা থেকে আসছি এর মধ্যে?'

'ঠিক বলেছিস? আচ্ছা দিদি, আজ থেকে আমরা ওঁর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করি কী বল?'

'আরে! তুইও ওই কথা ভাবছিস? আমিও তাই ভাবছিলাম।'

কিন্তু কীভাবে সেই ভালো ব্যবহারটি করা যাবে?

জল্পনা কল্পনা চলে। কী বলবে?

'নতুন দাদু, আপনার পাকা চুল তুলে দেব?'

'দুর। সে ভারি বোকা বোকা লাগবে।'

'আমরাও ওনার ছেলেবেলার গল্প শুনতে চাইব।'

'ধ্যাত! সে তো শুনে শুনে কান পচে গেছে!'

'নতুন দাদুর সঙ্গে বেড়াতে যেতে যাওয়া হবে?'

'হ্যাত। একলা নতুন দাদুকে পাব কোথায়? সবসময়ই তো বাড়ির দাদুর সঙ্গে সেঁটে আছেন।'

অবশেষে ঠিক করা হল। থাকুন দু-জনে সেঁটে। বলা হবে, 'নতুন দাদু, সেকালে পাড়াগাঁয়ে তো গাছপালায় ভূত থাকত, আপনাদের জঙ্গলবাগান পাড়ায় ভূত-টুত থাকতো না? বলুন একটা ভূতের গল্প। দাদু ভূতের গল্প জানে না?'

তারপর দেখা যাক কী বলেন!

এও ঠিক করে ফেলা হল, যদি তেমন ঘোরালো আর জোরালো কোনো

ভূতের গল্প নাও বলতে পারেন, নেহাত অর্ডিনারি বেলগাছের বেহ্মদত্যি কি শ্যাওড়া গাছের পেতনির গল্পও হয়, তাহলও খুব ভয় পাওয়া পাওয়া ভাব করতে হবে।

আর বাড়ির দাদুকেও না হয় একটু ডাউন করা যাবে, 'তুমি এত লোমহর্ষক ভূতের গল্প বলতে জানো না!'

পরামর্শটি করে মনের মধ্যে যেন একটু শান্তি এল।

'আজ সন্ধেবেলাই অ্যাকশান শুরু হোক কী বলিস?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ভালো। আর তারপর রোজ সন্ধ্যাতেই—'

কিন্তু হায়!

সাধু সংকল্প আর সহজে কার্যকরী হয়ে ওঠে, কবে কার ?

সন্ধ্যাবেলা খোঁজ নিতে জানা গেল দুই বৃদ্ধই হাওয়া।

কোথায় গেছেন?

না হরবোলা চক্কোত্তির জন্যে ট্রেনের টিকিট কাটতে।

সে কী! মানে?

টিকিট কাটতে মানে?

মানে আর কী? মনটা আর বসছে না তাঁর।

কে অমন একখানা উড়ো টেলিগ্রাম করল। দোকানটার কোনো শত্রুপক্ষ কি-না! ভাগনেটাই বা কেমন আছে!

গড়াইয়ের বড়োবাজারের ভসিমালের ব্যবসার মতো রমরমা না হলেও চক্রবর্তীর ছাতা ও জুতোর দোকানেরও আয় উন্নত মন্দ নয়!

গড়াইগিন্নি বলেছিলেন, 'দোকান নিয়ে চিন্তা কী? দোকান তো আপনার ভাগনে দেখে দাদা।'

'তা দেখে। প্রাণতুল্য করেই দেখে। দেখবে না কেন? জানে তো এই বুড়োটা পটল তুললে সবই ওর হবে। তবে ওরই কোনো শত্রুপক্ষ এটা করেছে কি-না কে জানে! আজকাল তো যখনতখন দোকানে বাজারে আগুন লাগা একটা ফ্যাশান হয়েছে।'

এদিকে শুনতে শুনতে মন্টির কান মাথা আগুন হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

আর ঘণ্টুর?

তার ইচ্ছে হয় চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'না না, ওসব কিছু না। আসলে—'

কিন্তু বলা তো আর যায় না?

অতএব ট্রেনের টিকিট কেনা হয়ে গেলো!

তবু গড়াইগিন্নি বলতে থাকেন, 'কেনা হল তো কী হল? ফেরত দেওয়া যায় না নাকি? আর ক-টা দিন থেকে যান দাদা! আপনাকে গোকুল পিঠে খাওয়াব ভেবে রেখেছি। ভালো মতো নারকেল পাচ্ছি না বলে হয়ে ওঠেনি—'

হরবোলা হেসে উঠে বলেন, 'পেটে তো দুশো পাঁচশো রকমের জিনিস খেলুম দিদি, পিঠে আর নাই খেলুম।'

নাঃ, আটকানো গেল না!

হরবোলা বললেন, 'মনটা যখন একবার চঞ্চল হয়েছে তখন রওনা দেওয়াই ভালো। কিন্তু ভেবে তাজ্জব হচ্ছি ওই কলকেতা শহরে দুজনায় এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর চরে বেড়াচ্ছি, কেউ কারও টিকিটটি দেখি নাই কোনোদিন!'

গড়াই বলেন, 'আমিও তো হরদম তাই ভেবে চলেছি। তো ওখানে গিয়ে দেখা হবে এবার কী বলো?'

'ভগবান জানেন।'

গড়াইগিন্নি বলেন, 'কেন দাদা? ঠিকানা তো জানাজানি হয়ে গেছে!'

'শুধু ঠিকানা জানাজানিই কি সব দিদি? ঠিক সময়টি আসা চাই। ওই যে রথযাত্রা স্পেশালে চড়ে বসে দেখা হল, আর ফাটাফাটি কাণ্ড করতে করতে যোগাযোগ হয়ে গেল, তার রহস্যই আলাদা।'

'শ্যাম গড়াইয়ের চক্রতীর্থের এই বাড়িখানা তো তোমারও হরবোলা। যখন ইচ্ছে চলে আসতে পারো। থাকতে পারো।'

হরবোলা বললেন, 'প্রভু জগন্নাথের ইচ্ছে।'

অতএব আর কি!

জিনিসপত্র গোছগাছ বাঁধাছাঁদা। দোতলা থেকে সব নামিয়ে এনে নীচের তলার ঘরে এসে বসা হয় রিকশা আসার অপেক্ষায়।

হরবোলা গাঢ় গভীর গলায় বলেন, 'তোর বাড়িতে এসে এই মাসখানেক সময় যে আনন্দে কাটল শ্যাম, বাকি জীবনভোর তা ভুলব না। আহা! কী সোনার সংসারটি তোর! দেখে চোখ জুড়োয়, প্রাণ জুড়োয়। তোর গিন্নি না হয় আমাদের ওখানের মেয়ে। আমায় আপনজন ভাবতেই পারে, কিন্তু তোর ছেলে, ছেলের বউ, নাতিনাতনি? কীভাবে এই একটা উটকো লোককে আপন করে নিয়েছিল। বউমাটি তো লক্ষ্মী প্রতিমা। পরকে এত যত্ন! আর

নাতি-নাতনী দুটি! দেবশিশু। যেমন সোনার চাঁদের মতো দেখতে, তেমনি আচার আচরণ। দেখে দেখে ইচ্ছে হতো আমার ভাগনার ছেলেমেয়েগুলোকে ডেকে এনে দেখাই! উঃ কী বিচ্ছুমার্কা ছেলেপুলে সব! যখন 'অ্যাই মামাদাদু' বলে ডাক দেয়, মনে হয় যেন ঢিল ছুড়ে মারল। আর তোর নাতিনাতনিরা? যখন 'নতুন দাদু' বলে ডাকে কানে যেন মধু বর্ষায়। বড়ো ভাগ্যবান রে তুই গড়াই।'

আহা উনি তো এদের 'ভালোই বলছেন? তবে কেন দুটো ভাইবোনের এমন ভয়ংকর একটা অস্বস্তি হচ্ছে?

এ অস্বস্তি কিসের?

লজ্জার না ভয়ের?

রিকশা এসে গেল।

উঠে পড়তে হল!

গড়াইগিন্নি আঁচলে নাক মুছতে মুছতে 'দাদা'কে একটা প্রণাম ঠুকে হাতে একটা মস্ত টিফিন-কৌটো ধরিয়ে দিয়ে বলেন, 'এর মধ্যে গাড়ির খাবার রইল দাদা। আর দু-খানা গোকুল পিঠেও। খাবেন নিশ্চয়।'

হরবোলা চক্কোত্তি প্রায় আঁতকে উঠে বলেন, 'গাড়ির খাবার। ওইভবে পেট চরে খেয়ে আবার গাড়ির খাবার। আমাকে কি রাক্ষস ঠাউরেছ দিদি: একেবারে বক রাক্ষস!'

আশ্চর্য ঘণ্টু এ-কথায় হেসে না ফেলে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'নিন না নতুন দাদু। রেলগাড়িতে চাপলেই খিদে পায়, দেখবেন।'

রিকশাওলা ঘণ্টি দিচ্ছে।

গড়াই হাফ হাতা পাঞ্জাবিটার হাতার ধারটা দিয়ে চোখ ঘষে নিয়ে বলেন, 'চলো, তোমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।'

বলে হরবোলার ব্যাগটা হাতে তুলে নেন।

এগিয়ে গিয়ে দু-জনেই জিনিসপত্র গুছিয়ে একটা রিকশায় উঠে ঠেসেঠুসে বসেন।

রিকশা ছেড়ে দেয়!

গড়াইগিন্নি খেন রীতিমতো ফ্যাসফ্যাস করতে করতে আর নাকের জলে চোখের জলে আঁচলটা সপসপিয়ে ভিজিয়ে গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

মন্টি-ঘণ্টুর মা-ও আস্তে আস্তে শাশুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ান।

আর এরা দু-জন

হঠাৎ ছুটে দোতলায় উঠে গিয়ে সেই কোণের দিকের বারান্দাটায় এসে দাঁড়ায়। যেখান থেকে প্রায় রাস্তার শেষ সীমা পর্যন্ত দেখা যায়।

কিন্তু যখন আর দেখা গেল না, তখনও দাঁড়িয়েই থাকে। অনেক, অনেকক্ষণ। চুপিচুপি!

হঠাৎ ঘণ্টু একসময় আপন মনে বলে ওঠে, 'আচ্ছা উনি থাকায় আমাদের কী ক্ষতি হচ্ছিল!'

জিগ্যেসও নয়। 'দিদি' বলে ডেকেও নয়।

তবু মন্টি ছিটকে উঠে বলে, আমি কি জানি? তুই-ই তো কেবলই—জুতোর মধ্যে কাঁকড়া পুরে রাখব? বিছানার মধ্যে— আর কথা জোগায় না।

ঘণ্টু চুপচাপ হয়ে যায়।

শুধু সমুদ্রের শব্দ আর ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ!

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ দু-জনেই একই সঙ্গে রাগ দুঃখ ক্ষোভের গলায় বলে উঠল, 'এত দুম করে চলে যাবার দরকারটা কী ছিল? একটু ভালো ব্যবহার করার সময়ই পাওয়া গেল না।'

গল্পই কী অল্প?

গল্প শুনতে শুনতে, আর পড়তে পড়তেই গড়ে ওঠে মানুষ!... না না, আছাড় খেয়ে পড়ার কথা বলছি না— বলছি বই পড়তে পড়তে!

কাজেই এন্তার গোয়েন্দা গল্প পড়তে পড়তে যদি একটি 'কাজের মেয়ে' 'মেয়ে-গোয়েন্দা' হয়ে ওঠে, সে আর আশ্চর্য কী?

কী গো খুদে পড়ুয়ারা, গল্পের নাম শুনে অবিশ্বাসের হাসি হাসছ নাকি? হাসলে কিন্তু খুব ভুল করবে!

প্রথমে তো আসলে এটি বানানো গল্প নয়, নিছক সত্য ঘটনা! এই আমাদের পাড়ার সকলের জানাশোনাদের সামনে ঘটা ঘটনা!... তা বাপু 'ব্যাঙাচি থেকে যদি ব্যাঙ' হতে পারে, 'শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতি', 'ডাব থেকে নারকেল', 'এঁচোড় থেকে কাঁঠাল' আর 'খোকা থেকে দাদু', তাহলে এটুকু আর হতে পারে না?

ওই কাজের মেয়েটা যে মেয়ে-গোয়েন্দা হয়ে বসল, এ তো প্রত্যক্ষ সত্য!... লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে একখানা 'পুরস্কার'ও বাগিয়ে ফেললো মেয়েটা।... তা এ কথা শুনেও বোধ হয় তোমরা তেমন উৎসাহ বোধ করছ না? ভাবছো 'মেয়ে' আবার গোয়েন্দা হবে কী?

তা ভাবো যদি তো তোমাদের আর দোষ কী? এমন ধারণা তো হতেই পারে। সেই আমাদের আমলের 'গোয়েন্দারাজ মিস্টার ব্লেক'-এর সৃষ্টিকর্তা দিগেন্দ্রকুমার রায় থেকে এই তোমাদের আমলের 'অসাধ্য সাধক' 'ফেলুদা'র সৃষ্টিকর্তা সত্যজিৎ রায় পর্যন্ত কেউ কি একখানা মেয়ে-গোয়েন্দা গড়েছেন? এঁদের মধ্যবর্তী বিশাল সময়টায় আরও কত কতজনই তো গোয়েন্দা গল্প লিখে রাজ্য ভরিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু কী? গোয়েন্দা হিসেবে 'মেয়ে' তেমন কোথায়? অথচ— মেয়েরাও গোয়েন্দাগিরিতে কম তুখোড় হতে পারে না।... এই তো— ঘরে-সংসারে, এদিকে-সেদিকে নিরীক্ষণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে—মেয়েরা সহজেই সহজাত ক্ষমতায় 'অপরাধের' গন্ধটি পায়! আর পেয়ে তার মূল উৎসটি আবিষ্কার করে ফেলতে ছেলেদের থেকে চতুর্গুণ উৎসাহ বোধ করে।

তবুও গোয়েন্দা গল্পলিখিয়েরা যে কেন সেদিকে নজর দেন না! এমন কী বিশ্বজোড়া 'গোয়েন্দা গল্প-পাঠকদের' হৃদয় জয় করা মহিলা-লেখিকা আগাথা ক্রিস্টিও তেমন নয়।

কারণটা আর কিছুই নয়, অন্তত আমার তাই মনে হয়, মেয়েরা তো পুরুষের মতো কেবলমাত্র একটি 'সহকারিণী' বা একটি বিশেষ ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন কুকুরকে সম্বল করে রণে-বনে-অরণে, পাহাড়চুড়োয়, এমনকী সমুদ্দুরের তলায় পর্যন্ত হানা দিতে উঠতে পারে না। তাদের অনেক অসুবিধে!... আর আমাদের এই ঘরোয়া বাঙালি বাড়ির মেয়েদের তো কথাই নেই। পদে পদে বাধা!

'সন্তুর কাকাবাবু' তো স্রেফ দুখানা ক্রাচ বগলে নিয়েও পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেন। এখন বেড়াচ্ছেন। কিন্তু আমাদের 'মন্টির' পিসিমণি'? তিনিই কি কম? বাধা না পেলে তেমন একখানা হতে পারতেন না? তাঁর তো আস্ত দু-খানা পাও রয়েছে।

তা সে যাকগে—এ-কাহিনি তো মেয়ে হয়ে জন্মানোর জ্বালার কাহিনি নয়, একটি মেয়ে-গোয়েন্দার বাহাদুরির গল্প!...

ডাক্তার লাহিড়ীর বাড়ির সেই 'কাজের মেয়েটির'! যার আসল নাম হচ্ছে কাজল। কাজল মণ্ডল।

ঘটনার শুরু অবশ্য ডাক্তার লাহিড়ীকে নিয়েই। তারপর যা যা হয়ে চলল বলছি। শীতের রাত! এবং বেশ গভীর রাতই! সারাদিন দারুণ খাটুনি গেছে নার্সিংহোমের ফিমেল ওয়ার্ডে একটা ভীষণ শক্ত অপারেশন নিয়ে। বাড়ি

ফিরেই শুয়ে পড়েছিলেন ডাক্তার ভারি একখানা রাগ চাপা দিয়ে। ঘুমের অতলে তলিয়েও গিয়েছিলেন। তবু ডাক্তারের অভ্যস্ত কান। ঘরের বাইরের হলটার দেয়াল-ধারে রাখা টেলিফোনটার ক্রিং ক্রিং শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল।

গা থেকে কম্বলখানা ঠেলে পায়ের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে বসলেন ডাক্তার লাহিড়ী।

চিন্তিত হলেন।... কী হল? ওই অপারেশন কেসটায় কি কিছু গড়বড় দেখাদিল নাকি?... অ্যাসিসট্যান্ট ডাক্তারটি কিংবা হেড নার্স, সেটা তাঁকে জানাবার জন্যে—

.... ক্রিং ক্রিং-টা যেন আরো জোরালো লাগছে।

উঠে পড়ে শোবার ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে সামনের হলটায় বেরিয়ে এলেন।... এটা ডাক্তারের ড্রইংরুমও।

ডাক্তার লাহিড়ী চিৎকাররত ফোন-এর রিসিভারটা হাতে তুলে নিয়ে কানে চেপে স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ভারী গলায় বললেন, 'হ্যাঁ! ডাক্তার লাহিড়ী বলছি—বলুন! ...কী? কোথা থেকে বলছেন?"

নিশ্চিত ছিলেন নিরাময় নার্সিহোম থেকেই। নিশ্চয়ই একটি ভয়ার্ত স্বর শুনতে পাবেন, 'শুনুন! আপনার পেশেন্ট হঠাৎ—

কিন্তু তা শুনলেন না। যা শুনলেন তাতে তাজ্জব হয়ে গেলেন।... চমকে উঠে বললেন, 'কী বলছেন? বারুইপুর থানা থেকে বলছেন? কী ব্যাপার? অ্যাঁ। একটু আগে আমার বাড়ি থেকে ফোনে থানায় একটা মেসেজ পাঠানো হয়েছে?'

স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর ভারী গলার স্বরটা যেন চাঞ্চল্যে হালকা হয়ে গেল, 'কী অদ্ভুত কথা বলছেন? আমার বাড়ি থেকে?... অ্যাঁ? বলা হয়েছে এখানে ভীষণ একটা কাণ্ড ঘটছে। যতো শীঘ্র সম্ভব পুলিশ পাঠিয়ে দিতে!... ইম্‌পিসবল! আপনি বোধহয় একটু ভুল করছেন! অন্য কোনো ডাক্তার লাহিড়ী। গাইডটা দেখুন—হ্যালো! হ্যালো। কী বলছেন? 'নিউ বারুইপুর... আদর্শ উপনগরী'... সাউথ ব্লক, ফ্ল্যাট নাম্বার টোয়েন্টি টু, ডক্টর অভীক লাহিড়ী।... কী আশ্চর্য! এগুলো তো সবই মিলে যাচ্ছে। কিন্তু ওই মেসেজটা! এটা তো মিলছে না। মনে হচ্ছে কেউ, বোধহয় অযথা পুলিশকে হ্যারাস করতে, আমার নাম দিয়ে—... কী বললেন? খুব অস্থির হয়ে বলেছে? এবং সেটা মেয়ে গলায়?... মেয়ে গলায়? নাম বলেছে?... অ্যাঁ? বলেছে? কাজল মণ্ডল! ... কী আশ্চর্য এও তো মিলে যাচ্ছে। আমারই

বাড়ির কাজের মেয়েটির নাম। কিন্তু তার পক্ষে এটা তো সম্ভব নয়!... কোথাও কোনোখানে 'সামথিং রং' হয়েছে।... আচ্ছা দেখছি— কাইন্ডলি দুসেকেন্ড ধরুন তো...'

উত্তেজিত ডাক্তার লাহিড়ী রিসিভারের মুখটা চেপে ধরে, টেলিফোনের সামনের শৌখিন কাজ-করা পালিশ-করা টুলটা ছেড়ে উঠতে গেলেন, আর ঠিক সেই সময় হঠাৎ হাতের ওপর কীসের একটা স্পর্শ পেলেন। ... মানুষের হাতের নয়, একটুকরো কাগজের।

সেটা যেন পিছন থেকে পড়লো! না, ঠিক পড়লো না, কেউ ঠেকিয়ে ধরলো!

তাকিয়ে দেখলেন, তাতে বেশ গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, 'পুলিশকে আসতে বলুন। যতো শীঘ্র সম্ভব। ভীষণ কাণ্ড! তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে বোধ হয় একটা 'মার্ডার' হতে চলেছে।... জানলা দিয়ে দেখুন—"

জানলার বদলে পিছন দিকেই তাকালেন। দেখলেন, কাজল তাঁর পিছন দিক থেকে সামনের দিকে সরে আসছে।... তার ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকানো, 'মুখে চাবি দেওয়ার' ভঙ্গিতে।

যদিও এখন এখানের আলোটা তেমন জোর পাওয়ারের নয়!.... বড়ো হল-এর দুধারে দুটো সিলিং লাইট লম্বা দড়িতে ঝুলছে, সন্ধ্যাবেলায় তাদের (লোকজন এলে) জ্বালা হয়। এ-আলোটা দেয়ালে লাগানো একটা ঘষা কাচের ডুম-এর মধ্যে বন্দী।... তবু ডাক্তার লাহিড়ী কাজলের মুখের চেহারাটা দেখতে পেলেন ভয়ার্ত, উত্তেজিত, সাদাটে।

শরীরটাও যেন কাঁপছে। কে জানে সেটাও ভয়ে, না শীতে?

কিন্তু এতই বা কী শীত? বাঁয়ের জানলা-ঘেরা বন্ধ ঘর! গায়ে একখানা গরম চাদরও তো জড়ানো।

এখন কাজল ডাক্তার লাহিড়ীর হাতে ধরা ফোন-এর রিসিভারটার ওপর একটা আঙুল ঠেকিয়ে এমন একটা ইশারা করল যাতে বোঝা গেল পুলিশকে দ্রুত আসতে বলুন! অবস্থা ভীষণ!

তা এ সবই দু-এক সেকেন্ডের ব্যাপার। কাজেই ডাক্তার তখুনি রিসিভারের মুখে চাপানো হাতখানা সরিয়ে নিয়ে তাড়াতড়ি বলে উঠলেন, '...সরি! ইয়েস! মেসেজটা জেনুইন। আসলে আমার নেক্সট ফ্ল্যাটটাতেই একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছে। মনে হচ্ছে, মার্ডার কেস!... হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার জানলা থেকেই ওই মেয়েটি দেখতে পেয়ে—! চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

পুরো কথাগুলো যে স্থিরভাবে বলতে পারলেন তা নয়, ব্যস্ততায় ছাড়া ছাড়া ভাবে। কারণ এখন তো মনে হচ্ছে পুলিশ বাহিনী পাখির মতো উড়ে চলে এলেই ভালো হয়।

কারণ ততক্ষণে একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

কাজলের ইশারায় তিনি ফোনের দড়িটাকে যত সম্ভব টেনেটুনে জানলার ধারে এসে পড়েছেন এবং সেইখান দিয়ে তেইশ নম্বর ঘরের একটা খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে তাঁর টাকের চুল খাড়া হয়ে গেছে, চোখ দুটো গোল্লা হয়ে গেছে!

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে এমন একটা দৃশ্য দেকতে হবে, এমন কথা কী দুমিনিট আগেও কল্পনা করেছিলেন তিনি?

কিন্তু কী দেখলেন তিনি? যাতে শুধু টাকের চুলেরাই নয়, গায়ের রোমগুলোও ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠতে থাকলো।

ক্রমশই। কারণ এক ঝলকে শুধু দেখলেনই তো না, দেখে চলেছেন। ভি. ডি. ও. ক্যাসেটে ধরে রাখা ছবির মতো। ঘটে চলেছে একটা ঘটনা!...

ক্রমে শরীরের সমস্ত রক্ত দাপাদাপি করতে থাকে, মাথার মধ্যে দামামা বাজতে থাকে। ভয়ঙ্করভাবে চেংচিয়ে ওঠবার প্রেরণা আসছে! কিন্তু নাঃ। সেটা করা যাচ্ছে না করার উপায় নেই! তেমন বোকামি করে ফেললেই তো সব গুবলেট।

ধারেকাছে কাজল দাঁড়িয়ে আছে। তারও অবস্থা একই।...

দুটো মানুষের নিশ্বাস ফেলার শব্দটি পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না।

এত নিঃশব্দ স্তব্ধতা, অবশ্য অন্য এক বিপদের আশঙ্কাতেও। ডাক্তার লাহিড়ীর মা, নীহারিকা দেবী, যদিও এখন লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, ঠিক পাশের ঘরেই। তবে সামান্য একটু খুটখাট শব্দেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। ... আর ভাঙামাত্রই খ্যানখেনে গলায় চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, "কে র‍্যা? কে কোথায় কী করছিস? কীসের শব্দ হল?"

হয়তো এতক্ষণে টেলিফোনের শব্দয় এবং কাজলের আর ডাক্তার লাহিড়ীর এই ওঠাউঠির শব্দহীন শব্দটুকুতেই ভেঙে যেতে পারত সে ঘুম, তবে ক-টা দিন শীতটা বড়ো বেশি জাঁকিয়ে পড়ায়, লেপের ওপর আবার একখানা মোটা কম্বল চাপিয়ে শুচ্ছেন। তাই কানের ফুটো দুটো 'সিল' হয়ে রয়েছে। মাথা পর্যন্ত মুড়ি দেন তো!

ভাগ্যিস তাই দেন। না হলে—? তিনি জেগে উঠলেই তো 'হয়ে গেল'!

সব সাবধানতা ভেস্তে যাবে! তিনি তাঁর বিখ্যাত কণ্ঠস্বরে যদি "কে র‍্যা?

কে ওখানে? কে কোথায় কী করছিস?' প্রশ্নটি উচ্চারণ করে ওঠেন, সারা পাড়ার লোকই জেগে উঠবে।...

কাজল তাই তাঁর ঘরের দরজাটা ভালো করে চেপে বন্ধ করে দিয়ে এসেছে।

শীতের রাত!

তবু ডাক্তার লাহিড়ীর যেন ভিতরে ভিতরে ঘাম ছুটতে থাকে। আর তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে ওঠে।

ইশারায় কাজলকে জানালেন এক গ্লাস জল!

এই হলটার সংলগ্নই 'ডাইনিং স্পেস'! আর সেখানেই ফ্রিজ।

কাজল ফ্রিজ থেকে একটা জলের বোতল বার করেই তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখা 'থার্মোফ্লাস্ক' থেকে একটু গরম জল মিশিয়ে এক গ্লাস জল নিয়ে এসে হাতে ধরিয়ে দেয়।

এই রাত্রে ফ্রিজের ঠাণ্ডা জলটি খেলে আর দেখতে হবে না। গলা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। নচেৎ কাশি ধরে যাবে। নিজে ডাক্তার হলেও লাহিড়ী বারোমাস টনসিলে ভোগেন।... কাজল সে বিষয়ে সর্বদা সচেতন।

গরম জল অবশ্য মজুত থাকেই। নীহারিকা দেবী তো দিনে-রাতে যখনই জল খান জলে একটু করে গরম জল মিশিয়ে। নেহাত জুন-জুলাই-আগস্ট এই তিনটে মাস বাদে।

মেয়েটা সে বিষয়ে তৎপর।

এমনিতে বেশ ধীরস্থির শান্ত স্বভাবের মেয়ে। নীহারিকা দেবীর অযথা খিঁচুনিতেও বাদ-প্রতিবাদ করে না!... বরং ডাক্তার লাহিড়ী যদি বলেন, 'ও মা, যা করতে বলছ, একটু ভালো করে বুছিয়ে বল না? বকাবকি করে কষ্ট পাচ্ছ কেন?' তখন কাজল হেসে বলে, "ছাড়ান দ্যান না! বুড়ো মানুষ!"

এইরকম স্থির স্বভাবের মেয়ে। কিন্তু— ডাক্তার লাহিড়ী একবার ভাবেন, কিন্তু ও এমন একটা অদ্ভুত দুঃসাহসের কাজ করে বসল কেন? কী করেই বা?... থানায় ফোন করার কথা ওর মাথায়ই-বা এল কী করে? আর কোথায় কী-ভাবে করতে হয়, জানলই-বা কীভাবে?... ফোনটা বেজে উঠলে রিসিভারটা তুলে একটু 'হ্যালো' বলা বা বড়োজোর বলা, কাকে চাই?... ডাক্তারবাবু তো এখন বাড়ি নাই। নামটা বলবেন? ডাক্তারবাবু এলে বলব— এর বেশি দৌড় তো তার নেই। থাকবার কথাও নয়। সে তো আর নিজে থেকে স্বাধীনভাবে ডায়াল করে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্প করতে বসে না? শিখল কখন? কী সূত্রে?... তেমন কিছু যখন দেখল ডাক্তার লাহিড়ীকে

তো জাগিয়ে বলতেই পারত। প্রশ্নটা মাথায় পাক খেতে থাকে ডাক্তার লাহিড়ীর, কিন্তু এখন এ-প্রশ্ন করার সময় নয়।

জল খেয়ে, আবার সেই জানলাটার একদম ধারের কাছে সরে এসে তাকালেন।

এখন অবশ্য ঘরের সেই ঘষা কাচের ডুম-এ ঢাকা বাল্‌বটাও নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সব জানলা-দরজার ভারী ভারী পর্দাগুলো নিশ্চিদ্র করে টেনে দেওয়া হয়েছে। যাতে ওই 'ভয়ংকর নাটকের' ঘরের লোকেরা টের পেয়ে না যায়, কেউ কোথাও থেকে তাদের দেখছে।

আর কোথাও থেকেই দেখবার নয়, কারণ এই বাইশ নম্বর ফ্ল্যাট আর তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটের মাঝখানে একটি 'ছাড়' আছে। মাঝখানে সাড়ে ছ'ফুট একটা প্যাসেজ।... যেটাকে 'জমাদার আসার' পথ বলে রাখা আছে।

আসলে ফ্ল্যাট দুটো একদম পাশাপাশি হলেও ব্লকটা আলাদা।

অথচ ফ্ল্যাটের নম্বরগুলো ওইভাবে সাজানো। তবে তার আগে 'এ' ব্লক, 'বি' ব্লক বলে একটা ভাগ আছে।

জল খাবার পর ঘাম ঘাম ভাবটা ছাড়ল। এবং যদিও এঁদের দিকটা নিবিড় অন্ধকার তবু জানলার পর্দাটা সামান্য মাত্রই সরিয়ে চোখ ফেললেন।

অন্য জানলায় একইভাবে কাজল।

নিথর নিষ্কম্প!

এতক্ষণে নিশ্চিত হলেন ডাক্তার অভীক লাহিড়ী। এই ফ্ল্যাটে একটা খুনের ঘটনাই চলছে।

তবে 'খুনোখুনি' ভাবে নয়।

মুখোমুখি কেউ ঝগড়া করছে না, কেউ কারুর দিকে ছুরি উঁচিয়েও আসছে না, অথবা রিভলভার বাগিয়ে তাক করছে না।

অথচ 'মারণযজ্ঞ চলছে।'

কিন্তু দৃশ্যটা অভিনব, তাতে সন্দেহ নেই।

দু-দুটো মানুষ যেন একটা নাটকই দেখছে এখন!

কিন্তু এটা কী? এটা কী? নাটকে যে যবনিকা পড়ে যাচ্ছে। পুলিশ কই?... কতক্ষণে আসবে? আবার ফোন করা হবে?

ডাক্তার লাহিড়ীর মতো ভারিক্কী মানুষটাও ছেলে মানুষের মতো বলে উঠলেন, 'ও কাজল! কই বাবা? তোর পুলিশ কই? থানা আর এখান থেকে কত দূর? কাছেই তো!'

কাজল বললো, 'পুলিশের কথা বাদ দ্যান। ওদের তো আঠারো মাসে

বছর। 'আসছি' বলে হয়তো কাল সকালে আসবে।... তবে রাস্তাটা এখান থেকে ভালো দেখা যায় না। ও ঘরে গেলে--'

'ও-ঘর' মানে সেই ডাইনিং স্পেসটা যেখানে ফ্রিজটা আছে। আর ফ্রিজ, ডাইনিং টেবল, দু-খানা চেয়ার থাকা সত্ত্বেও যে-জায়গাটুকু পড়ে রয়েছে, সেইটাই হচ্ছে কাজলের 'বেডরুম'! একটা তিন পার্ট কাঠের স্ক্রীন দিয়ে আড়াল করা এই জায়গাটিতে সরু একটা ক্যাম্প-খাট, তার ওপর কাজলের বিছানা পাতা। দেখে মনে হচ্ছে একবারও শোয়নি। বিছানা ঠিকঠাক, পায়ের কাছে কম্বলখানা পাট করাই পড়ে আছে। এই খাটখানার পাশেই নীহারিকা দেবীর ঘরে ঢুকতে পারার একটা একপাল্লা দরজা আছে। দেখে মনে হয়, বোধ হয় বাড়ি তৈরি করার পর, ওটা বাড়তি সংযোজন।

সত্যিই তাই। এই ফ্ল্যাটটা কেনার পর, মায়ের সুবিধের জন্যে ডাক্তার লাহিড়ী ওটা করিয়ে ছিলেন। কারণ বাড়িতে যখন যে 'কাজের মেয়েটা' রাতদিন হিসেবে থাকে, তাকে ওইখানেই শুতে দেওয়া হয়। বৃদ্ধা মহিলার যদি রাতে কিছু দরকার হয়, যাতে ডাকলেই সাড়া পেতে পারেন।

তা দরকার নীহারিকা দেবীর কেবলই পড়ে। তবে শীতের রাতে একটু কম। লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন অঘোরে।... গরমকাল হলেই ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডাক, 'কাজল। অ কাজল!... ফ্যানটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে যা না।...কাজল। অ কাজল! মাথার ধারের জানলাটা খুলে দিয়ে যা না। ... অ কাজল! ঘুমিয়ে পড়লি? জানলা, পাখা দুটোই খুলে দিয়ে যে শীত ধরে গেলো। একটা বন্ধ করে দিয়ে যা'।

আসলে কাজল প্রধানত ওঁর দেখভাল করতেই আছে। বাড়ির অন্য কাজ করার আলাদা লোক থাকে। রান্না করা, ঘর মোছা, কাপড়কাচা, বাসনমাজা, বাজার করা—কাজ তো একটা সংসারের কম নয়?

হলেও মাত্র শুধু মা ছেলের সংসার।

একটা আশি বছর পার করা বুড়ি তো একাই একশো।... তা ছাড়া আবার বুড়ি একদা খুব শৌখিন বুড়ি ছিলেন। রোজ সকালে খান দুই খবরের কাগজ পড়া চাই। রোজ যত পত্রপত্রিকা আসে বাড়িতে, সব পড়া চাই, আর গাদা গাদা ডিটেকটিভ গল্পের বই পড়া চাই। প্রায় মাতালের মদের নেশার মতোই এই নেশা। কিন্তু এখন মুশকিল এই, চোখে পড়েছে ছানি, অত পড়াপড়ি আর চলছিল না। তাই তাঁকে সবকিছু পড়ে পড়ে শোনাতে পারে, এমন একটা মেয়ে জোগাড় করা হয়েছে। কাজল বলতে গেলে রীতিমতো বিদুষী। সে তাদের রাজপুরের 'মহামায়া বালিকা বিদ্যালয়ে' আট ক্লাস পর্যন্ত

পড়েছে। তারপর আর কী? বাবা মরে গেল, আর পড়া হল না। কাজে লাগতে হল।

সে যাক! কাজলকে পেয়ে নীহারিকা দেবী ভারি খুশি। সব বিষয়ে যেমন চৌকস, তেমনি স্মার্ট, আবার তেমনি মায়ামমতাশীলা!

মা খুশি বলে ডাক্তার লাহিড়ীও তার ওপর সন্তুষ্ট তবু আজ যেন কেমন একটা খটকা লাগছে। মনটা খচখচ করছে। প্রধান কারণ তো সর্দারি করে থানায় খবর দেওয়া। উচিত কাজ হলেও মনিবকে না জানিয়ে? এটা ঠিক না। তা ছাড়া মাঝরাত্তিরে ওই পাশের ফ্ল্যাটে যে একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, সেটা ও জানল কী করে? ও কি সারারাত জেগে জানলায় চোখ ফেলে বসে থাকে?

অন্তত আজ যে তাই ছিল, সেটা তো নিশ্চিত। বিছানা ছোঁয়নি।

তা মনটা খসখস করলেও 'এ-ঘর থেকে ভালো দেখা যাবে' বলে ডাকতে, আস্তে আস্তে চলে এলেন এ-ঘরে। খুব সাবধানেই। পাছে মা-র ঘুম ভেঙে যায়!

তবু ইশারায় বললেন, 'আজ একবারও বিছানায় শোওনি?'

কাজল মাথা নেড়ে বলল, 'না।' তারপর ইশারায় বলল, 'দেখবেন আসেন না, কেন শুইনি?'

দেখে তো ডাক্তার লাহিড়ী অবাক! হতবাক।

জানলার ধারের কার্নিশে এক অভাবনীয় জিনিস! ওদের ঘরটা ভালো করে দেখবার জন্যে একটা কৌশল আবিষ্কার করেছে সে। সেই কৌশলেই দেখতে লাগলেন, এতক্ষণ যেটা শুধু একপেশেভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল, সেটা একেবারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মানে পুরো ঘরখানার সমস্ত চেহারাটা।... ঘরের মাঝখানে মস্ত একখানা পালঙ্ক, দেয়ালের ধারে ধারে বড়ো বড়ো আলমারি, একটা দেয়ালে একটা বড়ো ওয়ার্ডরোব।

কিন্তু এখন কী ঘটনা ঘটছে? কী দেখলেন? দেখলেন, ওই পালঙ্কটার ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে কালো মুসকো মতো দুটো লোক। আর হাত বাড়িয়ে ঠিক তার মাথার ওপর যে একখানা সিলিংফ্যান ঝুলছে, তাতে একটা দড়ি লটকে ফাঁস লাগাচ্ছে!

অর্থাৎ ওইখানে ফাঁস লাগিয়ে কেউ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে!

কিন্তু কথা হচ্ছে কেউ যদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলবার বাসনা করে, সে কি কারও সাহায্য নিয়ে করে? না কারুকে সাক্ষী রেখে?

ডাক্তার লাহিড়ীর চোখ দুটো রসগোল্লা থেকে ফুটবল।

ফাঁস বাঁধা হলে লোক দুটো খাট থেকে নেমে এসে, মেজে থেকে কী একটা ভারী জিনিস তুলে খাটে রাখল।

কী সেই জিনিস?

আর কিছু না, একটা ভারীসারি লাশ!

অর্থাৎ একটি মৃতদেহ।...

মুসকো লোক দুটো অতীব নিঃশব্দে অথচ 'হেঁইও হেঁইও' ভঙ্গিতে সেই লাশটাকে উঁচু করে তুলে ধরে তার গলায় ওই দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু সহজে হচ্ছে না। বারেবারেই ফসকে যাচ্ছে। অথচ যেভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, খাটখানা না ভেঙে যায়! ... লাশটিও তো প্রায় দুশো কেজি। তার সঙ্গে ওই দুটো আড়াইশো কেজি করে।

এ-দেহখানি কার?

ভেবে কাঁটা হয়ে গেলেন ডাক্তার লাহিড়ী।

বাড়ির মালিক জগদীশ তালুকদারের না? কী সাংঘাতিক!...

কিন্তু এইসব দুষ্কর্ম কি ওরা ঘরে আলো জ্বেলে জানলার পর্দা খুলে রেখে চালিয়ে যাচ্ছে? তাই তো যাচ্ছে প্রায়। দর্শকরা দেখল, পর্দা খুলে রেখেই বটে, তবে আলো জ্বেলে নয়।... খাটের মাথার দিকে টিঙটিঙে একটা লোক হাত আড়াল করে একটা সরু লিকলিকে মোমবাতি জ্বেলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।... পর্দা না থাকায়, অত মৃদু আলোতেও দেখা যাচ্ছে। জানলায় তো কাঠের পাল্লা নেই। পুরো কাচের। এই ফ্ল্যাটগুলোর তো এই ফ্যাশান।

ডাক্তার লাহিড়ীরও তাই। তবে তাঁর সব ঘরেই মোটা কাপড়ের ভারী ভারী পর্দা ঝোলানো, একেবারে উঁচু পেলমেট থেকে। ... আচ্ছা তালুকদারের ঘরেও ছিল না? ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে। তবে? গেল কোথায়?

কে জানে কোথায়? তবে এখন অন্তত নেই।

শেষমেষ দেখা গেল, ওরা অনেক কসরত করে মরা মানুষটার শক্ত হয়ে যাওয়া ঘাড়ের ওপরকার মুন্ডুটাকে সেই ফাঁসের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে, হাত ঝেড়ে খাটের ধারে বসে পড়ল।

অর্থাৎ তালুকদারমশাই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে থাকলেন, আর এরা একটু জিরিয়ে নিতে বসল।

তারপরই কিন্তু ওরা খাট থেকে নেমে এসে হাত-মুখ নেড়ে কী যেন বলাবলি করল। অপছন্দভাবে মাথা নাড়ল। মনে হল, এত খেটেখুটেও ব্যবস্থা জুতসই হয়নি।

ওঃ। বোঝা গেছে।

গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলা লোকটার পা দুটো শূন্যে দুলদুল করে দুলছে না। বিছানায় ঘষটাচ্ছে।

দুলবে কী করে? মানুষটা যে আড়ে-দীর্ঘে দশাসই। আর ফাঁসটা যেন বেশ একটু লম্বা।

কিন্তু পা শূন্যে না দোলাতে পারলে তো সব কৌশলই বৃথা। প্রতিপন্ন তো হবে না লোকটা নিজে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে!

অর্থাৎ আত্মহত্যা করেছে!

কিন্তু লোকটা তো মনে হয় টাকার কুমির। শেয়ার মার্কেটের দালাল জগদীশ তালুকদার। চলাফেরায় কী মদগর্ব ভাব, পাড়ার লোকেদের দিকে তাকিয়েও দেখে না। বিশ্বনস্যাৎভাবে নিজের হাতে একখানা একটু ঝরঝরে অস্টিন গাড়ি চালিয়ে আসে যায়। বলতে গেলে চোদ্দবার আসে যায়। বাড়িতে থাকার মধ্যে গিন্নি, আর মোটকা-সোটকা গণেশ মার্কা গোটা তিন-চার ছেলেমেয়ে। তারাও তেমনি। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা-টেলা করে না। নিজেরাই সামনের রাস্তায় লাট্টু ঘোরায়, মার্বেল খেলে, কখনও কখনও একটা ফুটবলও লাথায়।... লেখাপড়া করে বলে মনে হয় না।

জগদীশকে আসতে দেখলেই ছুটে কাছে আসে, আর সবাই মিলে বাবার পকেট হাতড়ায়।

তখন জগদীশের মুখে একটু হাসি হাসি ভাব ফোটে। পকেট থেকে চকোলেট, লজেন্স, কী কমলালেবু বার করে ছেলেমেয়েদের হাতে দেয়। বাড়ি ঢুকে আসে।... এই মানুষটা কী দুঃখে আত্মহত্যা করতে যাবে?

ডাক্তার লাহিড়ীর সঙ্গে ওর একবার আলাপ হয়েছিল। কতদিন যেন আগে একবার ওঁর বুড়ো বাবা 'দেশ' থেকে, না কোন তীর্থফেরত ওর বাড়িতে দুদিনের জন্যে দেখা করতে এসে অসুখে পড়ে গিয়েছিলেন। তালুকদার তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।... সামান্য পেটের গোলমাল। দু-দিনেই সেরে গেলেন। তবে তালুকদারের বাবা আহ্লাদে বিগলিত হয়ে বলেছিলেন, 'ধন্বন্তরী!'

আর তালুকদার?

ড্যাম গ্ল্যাড হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তার কোনো ভিজিট নেননি বলে।

তা নেবেন আবার কী ? পাশের প্রতিবেশী।

তবু তালুকদার বলেছিলো, 'আপনার মতো মহৎ ডাক্তার ক-জন আছে? সর্বদাই তো শুনি ডাক্তাররা লোভী! ব্যবসাদার! টাকাই মা বাপ!'

কথার ধরনটা ভালো লাগেনি লাহিড়ীর।

ব্যস। তারপরে আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। চেষ্টাও করেননি। বিরক্তিকর ব্যক্তি।

তবু জলজ্যান্ত লোকটা এইভাবে চোখের সামনে 'হত্যে' হল, আর তাকে আত্মহত্যের রূপ দিতে পাজি লোক দুটো এইসব করল, দেখতে হওয়ায় খুবই খারাপ লাগছে।

মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেছে। রোগা লোকটা এখন একটা সরু টর্চ জ্বেলে ধরেছে। তাতেই দেখতে লাগলেন ডাক্তার লাহিড়ী। ওঁর বাবাকে দেখতে যে-ঘরে ঢুকেছিলেন, এটা সে-ঘর নয়। সেটা একটা সরুমতো ঘর। কোনো আলমারি-টালমারি ছিল না।

লাহিড়ীর ফ্ল্যাটে তো তেমন কিছু নেই। নিশ্চয় ওর অনেক কিছু মালপত্র! তাই তো এত আলমারির ব্যবস্থা।

এখন দেখা গেল সেই মুসকো লোক দুটো, এমনকী টিঙটিঙেটাও হাত লাগিয়ে খাটখানাকে ঠেলতে শুরু করেছে। ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ দেখা গেল 'গলায় দড়ির' পা দু-খানা খাট ছাড়িয়ে শূন্যে দুলে উঠল।

ওদের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল।

যেন, বাঁচা গেল বাবা।... আর কী? 'মার দিয়া কেল্লা'।

কিন্তু এত কাণ্ড ঘটছে, বাড়ির লোকেরা কিচ্ছু টের পাচ্ছে না? বউ ছেলেমেয়ে? তারা কোন ঘরে থাকে? কিছু সাড়া পাচ্ছে না?

ডাক্তার লাহিড়ী ভাবতে থাকেন, আচ্ছা এতে কি পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া যায়? আগে গলা টিপে মেরে ফেলে পরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিলে, বোঝা যাবে না? দড়িতে ঝুললে জিভটা বেশ খানিকটা বেরিয়ে আসে না? ডাক্তারী শাস্ত্র তো তাই বলে।

ও মা। ভাবতে না ভাবতেই কাজল চাপা আতঙ্কে সাবধানতা ভুলে প্রায় সরব হয়ে উঠল, দেখুন দেখুন কী ভীষণ কাণ্ড করছে ওরা!

কী করছে?

দেখে চড়াৎ করে পায়ের রক্ত মাথায়!... ভীষণ না বিভীষণ! এরকম বীভৎস কাজ করতে পারে মানুষ? কী দেখলেন রে বাবা!

দেখলেন— সেই রোগাপটকাটা হঠাৎ আবার খাটের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, লোহার সাঁড়াশির মতো সরু সরু শক্ত আঙুল ক-টাকে ঝুলন্ত মড়াটার মুখের মধ্যে চালিয়ে দিয়ে, জিভটাকে ধরে টানাটানি করছে।

তার মানে, যাতে খানিকটা বেরিয়ে আসে!

ডাক্তার লাহিড়ীও অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠলেন। আর কাজল এখন 'ওরে, বাবারে—' বলে দু-হাতে মুখ ঢাকল।

এমন নারকীয় কাজ করতে পারে মানুষ?

ওঃ। এই সবের কিছুই যদি দেখতে না পেল পুলিশ, তাহলে পরে এসে কী করবে? খুনের প্রমাণটাই-বা পাবে কী করে?... খুনিরা পালিয়ে যাবার পর এসে কি মাথাটা কিনবে?

এদের খুবই অস্থিরতা আসে। তবে পুলিশের ভাগ্যি, ঠিক এই মহামুহূর্তে রাস্তায় দেখা গেল পুলিশের সেই চিরপরিচিত কালো গাড়িখানি এসে পড়েছে।

জানলার পর্দাটা ভালো করে সরিয়ে দেখলেন এঁরা। হ্যাঁ, এসে গেছে।

এ তো আর দমকলের মতো লাল টকটকে আগুনরঙা বডিখানা নিয়ে রাস্তা দাপাতে দাপাতে, পাড়া কাঁপাতে কাঁপাতে আর ঘন্টির ধাক্কায় ঘুমন্ত জনেদের জাগাতে জাগাতে আসবার নয়।

এ তো কালো অন্ধকার শরীরটা নিয়ে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায়।

শুধু মোড়ের মাথায় রাস্তার ওপর ক্ষণিকের জন্যে একটা হেডলাইটের আলো পড়ল।... তারপর এই বি ব্লকের সামনে এসে দাঁড়াল।

উর্দিপরা একটা কনস্টেবল গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে কম্পাউন্ডের গেট-এর সামনে দাঁড়াল। একটা পেনসিল টর্চ জ্বেলে সেখানে গেটের পাশে পিলারে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের নেমপ্লেট বসানো, সেটাই দেখতে লাগল।

ততক্ষণে ডাক্তার লাহিড়ী নীচের তলায় নেমে এসে তালাবন্ধ গেট-এর মধ্যে থেকে হাত বাড়িয়ে নিজের পাওয়ারফুল ব্যাটারির টর্চটা বাড়িয়ে ধরে যেন আলোর সংকেত করলেন। তারপর আস্তে বললেন, 'খুব সময়ে এসে গেছেন, চটপট গেট ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ুন।'

আর এই অবসরটুকুর মধ্যেই কাজল দেখতে পায় খুনি লোক দুটো একটা শিশির মুখ খুলে ঝুলন্ত মড়ার ঠোঁটের পাশে কী যেন একটা ঢেলে মাখিয়ে দিল।

কী ওটা?

ওঃ, লাল রং!

ভাব দেখাতে হবে দড়ি দিয়ে ঝোলার সময় কষ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছে।

উঃ, কতোক্ষণে এসে পড়বে পুলিশরা, সিঁড়িতে খটখট আওয়াজ করতে

করতে! এসেই ঝাঁপিয়ে পড়বে ওই দুষ্কৃতিদের ওপর।... ওঃ, ওই যে গেট টপকালো।

কিন্তু কূলে এসে তরী ডোবে!

তা তো ডুববেই।

বদমাইশদের যে আলাদা ভগবান। তাঁর চোখ-কান খুব সজাগ!... ঠিক সময়ে এসে পরিত্রাণ করেন।

তা নইলে—ঠিক এই সময়েই, এই অতি নিঃশব্দ পরিবেশে হঠাৎ একতলার ঘোষবাবুদের বাড়ি থেকে আকাশভেদী চিৎকার ওঠে, 'চোর! চোর!... চো-র চোঁও-ও-ও-র।'

তাহলে?

চোখের সামনে চোর পালাচ্ছে দেখেও কি পুলিশ কোথায় কী মার্ডার কেস হচ্ছে তাই দেখতে অনিশ্চিতের সন্ধানে ছুটবে?

সে তো ওপরতলায়।

তা তারা আর পালাবে কোথা দিয়ে? এই গেট দিয়েই তো?... যাবে কোথায়? পরে ধরা যাবে।

এখন চোর তো ধরা পড়ল। যদিও নেহাতই ছিঁচকে চোর। রাস্তায় সস্তামার্কা ফেরিওয়ালাদের মতো পিঠে বড়োসড়ো একটা পোঁটলা বাগিয়ে ঝুলিয়ে ধরে সটকান দিচ্ছিলো জমাদার আসার গলি দিয়ে। বোধ হয় গেরস্থর কাপড়চোপড় কী বাসনপত্র, কিছু হাতিয়ে।... কাদের? কে জানে! ঘোষবাবুদের তো নয়, তাঁরা তো হঠাৎ জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন, চুপি চুপি সটকান দেওয়ার দৃশ্যটা দেখে ফেলে চেঁচিয়েছেন।

যাই হোক, ওই ছিঁচকে চোর ব্যাটাকেও তো ধরা হল হাতে হাতকড়া পরিয়ে তার পুঁটলিসমেত। এবং কালো গাড়িতে তুলে নিল।

তারপর অ্যাকশানে এগোল।

কিন্তু সিঁড়িতে জুতো খটখটিয়ে যখন সেই জগদীশ তালুকদারের ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল তখন পাখি উড়ে গেছে।

কিন্তু কোন পথে?

ছাতে ওঠার সিঁড়ির মুখে তো— কোলাপসিবল। এখানেও ফ্ল্যাটের দরজায় স্বয়ংক্রিয় দরজা। যা বজ্র হয়ে বন্ধ হয়ে আছে।

সব ফ্ল্যাটেরই 'সদর দরজা' বলতে যে-দরজাটা আছে, যাতে বেল লাগানো আছে, তার বেল বাজিয়ে বাজিয়ে হত্যে হয়ে পুলিশ অফিসারমশাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলে আসা ডাক্তার লাহিড়ীকে জিগ্যেস করেন, 'কী ব্যাপার

বলুন তো, বাড়িসুদ্ধু সব্বাইকেই মার্ডার করে ফেলেছে?... আপনি যা বলছিলেন, তাতে. তো—'

হ্যাঁ, এইটুকু সময়ের মধ্যে লাহিড়ী ঘটনাটা কিছু বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এও বলেছেন, বাড়ির আর কাউকে দেখতে পাননি।

তাহলে?

ফ্ল্যাটের দরজা খোলার উপায় কী?

উপায় অবশ্যই আছে।

এঁদের সঙ্গে সঙ্গে তো ব্লকের দারোয়ানটি উঠে এসেছিল। সে জানাল, সব ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি কেয়ারটেকারবাবুর কাছে থাকে।

অতএব ডেকে নিয়ে আসা হল তাঁকে।

সকলেই বিস্মিত ভীতচকিত।

তলে তলে কী ঘটল?

অথচ সব নিঃশব্দ, শুনশান।

ডাক্তার লাহিড়ীই-বা পুলিশের মুরুব্বি হলেন কী করে?

আর তালুকদারের ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজাটাই-বা খুলতে ইচ্ছে কেন পুলিশের?

তালুকদারের বউ ছেলে-মেয়ে, মায় কাজকরুনি মেয়েটা পর্যন্ত তো আজ কোনো এক আত্মীয়ের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে কলকাতার বাইরে নেমন্তন্ন গেছেন। শ্যাওড়াফুলি না শিয়াখালা কে জানে কোথায়?

তাহলে? রাতারাতি এমন একখানা অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখতে হবে না! আর পুলিশকেই-বা দেখাবে কে ডাক্তার লাহিড়ী ছাড়া? শুধুই 'প্রত্যক্ষদর্শী' বলে নয়, পুলিশকে ডেকে আনার দায়িত্ব যখন তাঁর ঘাড়েই চেপে গেছে!

কেয়ারটেকার ভদ্রলোক বলতে বলতে সিঁড়িতে ওঠেন, 'মিসেস তালুকদার সকালের দিকে যখন রওনা দিলেন, আমায় বলে গেলেন, 'দেখুন আমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে কটা দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। কাল সকালেই ফিরে আসব। একটা রাত ফ্ল্যাটটা আপনার হেফাজতেই থাকবে। সকলেরই যাবার কথা। তবে একটা মুশকিল হচ্ছে আপনাদের তালুকদার সাহেবের হঠাৎ শরীরটা একটু খারাপ হয়ে পড়ায় উনি আর যাচ্ছেন না। তো বাড়িটায় নজর রাখার সঙ্গে সঙ্গে ওনারও একটু খবর নেবেন।... বলা তো যায় না। 'একটু খারাপ'টিই 'এতোখানি' হয়ে উঠবে কিনা!'

শুধোলাম, 'হয়েছেটা কী?' বললেন, 'এখন এমন কিছু না জ্বরভাব,

মাথাধরা, চোখটা জ্বালা জ্বালা, শীত শীত ভাব! বলেছেন খাবেন না কিছু। শুধু ফ্লাস্কে চা রেখে যাচ্ছি। তবে এখন ভাবনা হচ্ছে ওই জ্বরভাব থেকেই যদি হঠাৎ তেড়ে জ্বর আসে—'

আসলে মহিলা ভীতু টাইপের। তাই অতদূর চিন্তা।

তো আমি সাহস দিয়ে বললাম, 'কিছু ভাববেন না। আমি দু-চার বার দেখে যাব।'... তো মশাই দুপুরে কী ভেবে আমার বাড়ি থেকে খান কতক মাছভাজা নিয়ে দেখা করতে এসেছিলাম, যদি চায়ের সঙ্গে খান।... হাজার হোক ওঁর গিন্নি যখন অত করে বলে গেলেন।... ও মশাই আপনাদের কী বলব? তালুকদার মশাই কিনা আমায় দেখে, আর কথা শুনে একেবারে অট্টহাস্য! বলেন কিনা, 'শরীর খারাপ? এই শর্মা তালুকদারের? জন্মজীবনেও ওসব হয় না। শরীর খারাপ শত্তুরের হোক। ওটা গিন্নীকে বলেছিলাম, স্রেফ ভাঁওতা দিতে। কে মশাই গিন্নীর মামাতো দিদির মেয়ের বিয়েতে রেলগাড়ি চড়ে নেমন্তন্নবাড়ি ছুটবে? সমস্তটা দিন নষ্ট করতে? বলে কতো কাজ আমার। একবারও একা বসে একটু নিজস্ব কাজটাজ করি এমন সময় হয় না। সর্বদাই তো লোকচক্ষু। যদি বা পাকেচক্রে একটা নির্জন নিষ্কণ্টক দিন জোটে তার সদ্ব্যবহার করব না? অসুখের ছুতো না করলে ছাড়ত?... তা গরম গরম মাছ ভাজা এনেছেন! বেশ। বেশ। তোফা জিনিস চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে।'

তো বললাম, 'অসুখই যখন হয়নি, ভাত খেতে আপত্তি কী? আমার বাড়ি থেকে ভাত পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করিগে?' জবাবে আবার হাসি। ওই লোককে এত হাসতে দেখিনি কখনও। হেসে হেসে বললেন, 'লাঞ্চের ব্যবস্থা আমি গিন্নিকে টের না পাইয়ে তলে তলে নিজেই করে রেখেছি। খাটের তলায় ঢোকানো আছে। ঠিক সময়ে টেনে বার করে টিফিন-ক্যারীটি খুলে খেতে বসে যাব।... একার জন্যে তো? বেশি খরচ হল না। আর মনে সান্ত্বনা, ওরা তো বিয়েবাড়িতে খাবেই—ভালোমন্দ কিছু। তাই মশাই মবলগ কিছু খরচা করে মজুত রেখে দিয়েছি—ফ্রায়েড রাইস, চিকেন কারি, মাংসের চপ, ফিসফ্রাই। দেখবেন যেন পরে আমার গিন্নির কাছে বলে ফেলবেন না।'

এই তো মশাই হিস্ট্রি। এরপর আবার কে ঘনঘন খোঁজ নিতে আসবে? এখন আপনাদের কাছে এই বার্তা শুনে তো হার্টফেল করার জোগাড়। তবে ডাক্তারবাবু রাতের অন্ধকারে বিশ গজ দূর থেকে কী দেখেছেন, কী না দেখেছেন কে জানে! হয়তো স্বপ্নই দেখেছেন। ঘর খুলে হয়তো দেখবেন পেট মোটা করে খেয়ে-দেয়ে নিপাট ঘুমিয়ে পড়ে আছেন ভদ্রলোক, বেল

বাজা শুনতে পাননি... দারুণ বক্তার লোকটা। কথা শুরু করলেন কী, যেন মেল ট্রেন চলল!"

পুলিশ অফিসারটি অসহিষ্ণু গলায় বলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা চলুন তো—ঘরটা খুলে দিন তো—'

তা দিলেন তিনি বৃহৎ একগোছা চাবি থেকে নম্বর দেখে একটা চাবি ঘুরিয়ে—

কিন্তু দরজাটা খুলল কি?

খুলল না।

ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ! ওপর নীচে ছিটকিনি তো আছে দু-জোড়া। তবে সেটা তো বড়ো কেউ কাজে লাগায় না। দরজাটা একটু চেপে দিলেই লক হয়ে যায়।

ঠেলে ঠেলে, ধাক্কা মেরে মেরে, এবং পুলিশি গলায় হাঁক দিয়েও যখন কোনো কাজ হল না, পুলিশ অফিসারমশাই কেয়ারটেকারবাবুর দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টি হেনে বলেন, 'কী স্যার? আপনার কী এখনও ধারণা আপনাদের তালুকদারমশাই টিফিন কৌটো খুলে চিকেন কারি, ফ্রায়েড রাইস, ফিসফ্রাই, মিটচপ-টপ খেয়ে পেটমোটা করে সুখে নিদ্রা দিচ্ছেন? চিরনিদ্রা নয়।?'

কেয়ারটেকার তো অধোবদন!

শেষ পর্যন্ত আর কী?

দরজা ভাঙতেই হল পাড়া-কাঁপানো শব্দে। যে-কাজে একমাত্র পুলিশেরই নির্ভয় অধিকার। আর চটজলদি ভেঙে ফেলবার কায়দাও জানা।

অতঃপর?

কিন্তু কপাটটা ভেঙে পড়ে যাওয়ামাত্রই বাকি সবাইও যে হুড়মুড়িয়ে পড়ো পড়ো।

এ কী দৃশ্য!

সেই বিশাল দশাসই চেহারার তালুকদারমশাইয়ের বৃহৎ লাশটি পাখার সিলিং-এ দড়ির ফাঁসে ঝুলছে বটে, কিন্তু কী বিদকুটে বাঁকাচোরাভাবে! ঘাড়টা বুকের ওপর লটকে পড়ে একপাশে দুলছে। আর জিভটা? ওরে বাবা! যেন রক্ত মেখে লকলক করছে।

পুলিশ যা করবার করল।

দড়ি কেটে মড়া নামাল এবং তখুনি ধরা পড়ল ওই ফাঁসটার একদিক একটু ফেঁসে যাওয়ায় মৃতদেহখানা অমন বাঁকাচোরা 'ত্রিভঙ্গমুরারি' হয়ে দুলছিল, আর জিভের পাশ দিয়ে যেটা গড়াবার কথা, সেই 'রক্ত'টা ভেতর

দিকে গড়িয়ে গিয়ে জিভটাকে অমন মা কালীর জিভের মতো লকলকে করে তুলেছে।

রক্ত তো নয়, আসলে 'খুনখারাপি রং'।

এত সব দেখা এবং আর অনেক সব শোনার পরও পুলিশ সাহেব রিপোর্ট লিখলেন, 'সন্দেহ হচ্ছে, এটি 'আত্মহত্যা' নয়, হত্যার ঘটনা।... আগে গলা টিপে হত্যা করে পরে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।... অবস্থানও সন্দেহজনক।... হত্যাকারীরা দড়িটা একটু বেশি লম্বা করে ফেলায় খাটের ওপর দোলাতে না পেরে খাটখানাই ঠেলে খানিকটা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে, যাতে দৃশ্যটি 'নির্ভুল' হয়।

কিন্তু ঘরের মেজেয় সেই খাটের পায়া সরানোর চিহ্ন স্পষ্ট! অনেকদিন বসিয়ে রাখা কোনো আসবাব নড়ালে খুরোর নীচে দাগ হবেই।

গোয়েন্দাগিরির নিপুণতায় আত্মপ্রসাদে গর্বিত অফিসার সাহেব বললেন, "নিহতের ফ্যামিলি এসে না পড়া পর্যন্ত তো কিছু করা যাবে না। তাঁরা এসে শনাক্ত করে বলবেন, হ্যাঁ, এটাই এই ফ্ল্যাটের মালিক মিস্টার তালুকদারের দেহ, তবেই 'মর্গে' পাঠানো যাবে।"

তা তাঁরা তো সকালের আগে আসছেন না।

তাও খুব ভোর সকালে হতে পারে না।

অন্য একটি অফিসার চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'তাঁরা এই শীতের সকালবেলা, কোন না বাসি ফ্রাই আর চপ আবার ভাজিয়ে নিয়ে টাটকা করে চায়ের সঙ্গে সেঁটে এবং কোন না যজ্ঞিবাড়ির দু-একটা মিষ্টির হাঁড়ি-টাড়ি গুছিয়ে নিয়ে তবে আসবেন! তারপর ট্রেন... তারপর ট্যাক্সি।... বিলম্ব তো হবেই কিছু। আজ আমরা এই দরজা সিল করে রেখে দিয়ে চলে যাই, আগামীকাল যখন সময় সুবিধে হবে আসা যাবে।'

অ্যাঁ!

ডাক্তার লাহিড়ী আঁতকে ওঠেন, 'যখন সময় সুবিধে হবে? লাশ পচে উঠে গন্ধ ছাড়বে না?'

'উপায় কী?'

'পরিবেশ দূষণ হবে যে—'

'উপায় কী?'

'এইসব ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের হেল্‌থ সম্পর্কে ভাববেন না?'

'আমরা হেল্‌থ অফিসার নই!'

চলে যান মটমিটিয়ে।

একটা জলজ্যান্ত চোরকে তো বমাল সমেত গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। সেটাই-বা কম কী?

তবে যাবার আগে আরও একটি কাজ করে গেলেন তাঁরা। এই তেইশ নম্বর, আর বাইশ নম্বর ফ্ল্যাটের কাজকর্ম করবার লোকগুলোর বাড়ি থেকে না বেরোবার অর্ডার দিয়ে, একটা পুলিশ পাহারা বসিয়ে রেখে গেলেন। অবশ্য তাঁদের প্রধান টার্গেট হচ্ছে 'কাজল'। কাজল সম্পর্কে ঘোরতর সন্দেহ।

কাজল যাতে ওপরতলা থেকে নামতে না পারে, তাই সিঁড়ির দরজাটা তালা মেরে গেলেন।

ডাক্তার লাহিড়ী হতভম্ব হয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি? তাতে তো আমিও বন্দী হয়ে থাকব?'

'উপায় কী? এখন থেকেই নেমে নীচে তলায় থেকে যেতে পারেন।'

'অসম্ভব! নিচেতলাটা তো অন্যের।'

'তাতে কী? পড়শি তো? পড়শির অসুবিধের সময় দেখবে না? এই যে আপনি! একজন পড়শীর বিপদ দেখেই না পুলিশকে খবর দিলেন, সারারাত জানলা দিয়ে ওয়াচ করলেন।'

'কী আশ্চর্য! নার্সিংহোমে যে আমার একটা অপারেশনের পেশেন্টের মরণবাঁচন অবস্থা। আমাকে যেতেই হবে।'

'ঠিক আছে, যান। তবে কাইন্ডলি, একটু লিখে দিয়ে যান—'

'লিখে দিয়ে যাব! কী লিখে দিয়ে যাব?'

'কেন? নিজের দায়িত্বে যাচ্ছেন এই কথাটা। আমাদের তো স্যার ওপরতলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

'কী মুশকিল। আপনারা যে দেখছি আমাকেই সন্দেহ করে বসেছেন।'

'উপায় নেই? যেকোনো কাউকেই সন্দেহ করাটাই হচ্ছে আমাদের পেশার মূলমন্ত্র।'

অতএব ডাক্তার লাহিড়ী সেই লেখাটা লিখে দিয়েই নার্সিংহোমে চলে যাবার ছাড়পত্র পেলেন। বাকি সবাই নজরবন্দি। আর কাজল? ঘরবন্দি।

অবশ্য নীহারিকা দেবীর সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি হলো না। তাঁর সবকিছুর উপকরণই হাতের কাছাকাছিই মজুত থাকে।

তবে তিনি যখন ভাঙা ভাঙা গলায় বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, 'হ্যাঁরে কাজল, অভীক আজ এত তড়বড়িয়ে বেরিয়ে গেল কেন? আমার সঙ্গে দুটো কথা কইলনা!'

তখন কাজলের ঠান্ডা গলা, 'নার্সিংহোমে অপারেশনের রুগি।'

'ওঃ। ওই রুগিতেই আমার বাছাটাকে রুগি করে তুলবে।... বলি চা-টা খেয়েছিল ভালো করে?'

'খেয়েছেন!'

যদিও খেয়ে যাননি। বলে গেছেন বাইরে কোথাও খেয়ে নেবেন।... কিন্তু এতো কথা কে বোঝাতে বসবে এই বুড়িকে!

আবার কিছুক্ষণ পরে, 'কাজল! অ কাজল! আজ এখন দুধের বদলে হরলিকস দিলি যে?'

'আজ দুধ আসে নাই।'

'ক্যানো? ক্যানো দুধের আবার কী হল?'

'আজ দুধের গাড়ি বন্‌ধ। কাগজে লিখে দিয়েছিল।'

'কই! কাগজ এলো কখন?'

'বাংলাটা আসে নাই। ইংরিজিটা এসেছে। তাতে লিখেছে।'

'সেটা কে বলল তোকে?'

'ডাক্তারবাবু।'

অনেক গল্পের বই পড়ার ফলে, এন্তার গল্প বানাতে শিখে গেছে কাজল। তাই আবার যখন তিনি হাঁক পাড়েন, 'কাজল! অ কাজল! রাজুকে বলে রাখ আজ যেন আমার জন্যে দু-খানা পলতা পাতার বড়া করে—' তখন কাজল অনায়াসে বলে, 'আজ তো বাজারও বন্‌ধ কর্তা-মা।'

'নিকুচি করেছে তোদের বন্‌ধে। মন হচ্ছিল দু-খানা পলতা পাতার বড়া খাই—তাতেও বাদ সাধল।'

হরলিক্স বিস্কিট খেয়ে খবরের কাগজের জন্যে উসখুসুনি!

কাজল বেশ সপ্রতিভভাবে দু-তিন দিন আগের একখানা কাগজ এনে পড়ে শোনাতে বসে। জানে, এ-সব যে পুরোনো কথা, তা উনি বুঝতেই পারবেন না। মনে তো নেই। আর সত্যি বলতে 'নতুন কথা' আর আছে কী দেশে রাজ্যে? কাগজে তো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রায় রোজ একই কথা।... শুধু নতুন কোনো 'দুর্ঘটনা' হলে।... কাজল ভাবে, আগামীকালের কাগজে ওই জগদীশবাবুর দুর্ঘটনার খবরটা বেরোবে?

'কাগজ' শুনতে শুনতে নীহারিকা আবার হঠাৎ বলে ওঠেন, 'হ্যাঁরে কাজল, কাল রাতে কখন যেন কোথায় 'চোর! চো-র' করে চেঁচানি শুনলাম মনে হল। স্বপ্ন দেখলুম, নাকি সত্যি?'

'কখন শুনেছিলেন বলেন তো? কত রাতে?'

'তা সে আবার কেমন করে বলবো? ঘড়ি দেখিছি নাকি? তোরা শুনেছিলি?'

কাজল একগাল হেসে বলে, 'হ্যাঁ! ওই নিচের তলায় ঘোষবাবুদের বাড়িতে, রান্নাঘরে বেড়াল ঢুকে বাসন ফেলেছিল, সেই শব্দে ভয় পেয়ে ওরা 'চোর চোর' করে চেঁচিয়েছিল।'

হি-হি করে আবারও হাসতে হয় কাজলকে।

নীহারিকা দেবী বলেন, 'তবু ভালো।... তো আজকে নতুন কী বই আছে রে কাজল?'

'নতুন বই? নতুন বই?... ও হ্যাঁ—'গোবিন্দ গোয়েন্দার নতুন বাহাদুরি'।'

'মোটা সোটা বই? না রোগাভোগা?'

'মাঝারি! গোয়েন্দা গল্প কি আর বেশি মোটা হয় কর্তামা?'

'তা তো হয় না। তবে ফুরিয়ে গেলে যে মন ছটফট করে। হ্যাঁরে, সেই মূর্তি চুরির গল্পোটার শেষটা কী হল?'

'বাঃ। চোর ধরা পড়লো না? গোবিন্দ গোয়েন্দা তবে আছে কী করতে?'

'তা বটে! গোবিন্দর বই আরও আছে?'

'আছে আর দু-একটা।'

'সেটা ফুরিয়ে গেলে কী হবে?'

'কেন কর্তামা, জগতে কি আর গোয়েন্দা নাই? না হবে না? জগৎসংসারে চুরি ডাকাতি খুন এসব হয়েই চলবে, আর তা নিয়ে গোয়েন্দা গল্পো লেখা হয়েই চলবে। অন্তত আপনি যতকাল থাকছেন, ততকালের মধ্যে আকাল হবে না। জোগান পাবেন।'

'তাই হলেই ভালো।'... বলে বুড়ি পায়ের ওপর ঢাকা দেওয়া শালখানা আরও ভালো করে টেনে ঢাকা দিয়ে আরামের নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'তা এখন তুই নিজে চা-টা খেতে যা। তো হ্যাঁরে, আজ একবারও রাজুকে দেখছিনে কেন? বামুন মেয়েকেও না। সব কেমন যেন নিঃসাড়, শুনশান! গেল কোথায় তারা?'

কাজল অনায়াসে বলে, 'যাবে আবার কোথায়? নিজেদের জন্যে ঘি চপচপে মোটকা মোটকা পরোটা বানাচ্ছে, আরও একবার চায়ের সঙ্গে সাঁটবে বলে।'

নীহারিকা দেবী বকে ওঠেন, 'তা সাঁটবে তো সাঁটবে, তোর তাতে হিংসে ক্যানো রে? নিজে নিখাকি বলে, অন্যেরাও তাই হবে? খাটতে এসেছে

প্রাণভরে খাবে বলেই তো? পরোটার সঙ্গে একটু আমতেলের আচার নিতে বলিস। খুব জমে। আমরা না ছেলেবেলায় পাঁচ ভাইবোনে—ও, কী? কে কোথায় অমন ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল রে?...অ কাজল! দ্যাখ না।...ও মাগো— এ যে মড়াকান্না কাঁদতে লাগলো রে— ওরে বাবা! আমি যে ছুটেমুটে দেখতে যেতে পারি না রে। দেখগে। দেখগে যা না— এ যে দু-পাঁচজন চেঁচাচ্ছে মনে হচ্ছে। যা না— দেখে আয়।'

হায়। দেখতে যাবার উপায় কী আছে বেচারি কাজলের?... প্রকৃতপক্ষে সে এখন নেহাত নজরবন্দিও নয়, স্রেফ ঘরবন্দি। এই ওপরতলাটুকুতেই তো আটকে থাকতে হয়েছে।

তবু সরে গিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। যে কাঁদছে তাকে দেখতে পায় না, তবে বুঝতে তো আর বাকি থাকে না, তালুকদারগিন্নি ফিরেছেন নেমন্তন্নবাড়ি থেকে। তিনি চেঁচাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন-চারটে ছেলেমেয়েও চেঁচাচ্ছে।

জানলায় কান পেতে শুনতে পায় কাজল, তিনি চেঁচিয়ে চলেছেন, 'জানতুম! আমি জানতুম, এইরকম অপোঘাত মিত্যুই কপালে আছে ওর। যত রাজ্যির বদলোকের সঙ্গে মেলামেশা ভাব-ভালোবাসা! আমাকে পর্য্যোন্তো নুকোছাপা করে কী যে করত ভগোমান জানে।... কতদিন ভেবেছি একদিন পুলিশে খবর দিয়ে দিই! তাহলে পাপকর্মোগুলো কমবে, আর ওই বদমাশদের হাত থেকে উদ্ধার হবে ও। তা হল না গো— কেন মরতে আমি নেমন্তন্ন গেলুম গো!'

কাজল শুনে চলেছে, আর বুড়ি মহিলা চেঁচিয়ে চেলেছেন, 'কাজল! অ কাজল। কোথায় গেলি? কোথায় কে কাঁদছে সেটা বলে যাবি তো?... আচ্ছা আসুক আজ আমার ছেলে, তোকে দেখাচ্ছি মজা।'

কিন্তু মজা দেখাবার জন্যে তাকে কি আর পেলেন তিনি সেদিন?

তালুকদারগিন্নির ফাটাফাটি কান্নার সময়, পাড়ার আর সবাই কেয়ারটেকারবাবু ইত্যাদি তাঁকে বোঝাতে থাকেন, 'একদম চুপ করুন। এইসব কথা একদম বলবেন না। পুলিশের কানে গেলে রক্ষে থাকবে না। আপনাকেই থানায় নিয়ে গিয়ে লকআপে ভরে দেবে, বলবে যে, 'মনে হয়েছিল তো পুলিশে খবর দেননি কেন? জানছেন যখন একটা অন্যায় কিছু হচ্ছে'?

তখন তিনি একবার তড়পে উঠেছিলেন, 'তা আমি জানি, কী করে পুলিশে খবর দিতে হয়?'

ব্যস, তারপর চুপ করে যান।

আর হিতৈষীরা তখন বুঝিয়ে যান, পুলিশের স্বভাব হচ্ছে জেরা করা! জেরা করা আর সন্দেহ করা। তো যখন জেরা করবে, তখন খুব সাবধান। বেশি কথা বলবেন না। মুখে কুলুপটি এঁটে থাকবেন। তখন থেকে মুখে এমন্ন কুলুপটি এঁটে বসলেন যে মুখ খুলে জলটি পর্যন্ত খেলেন না এবং ছেলেমেয়েরা 'মা মা' করে ডাকাডাকি করলেও একটি সাড়া দিলেন না।

কেয়ারটেকারবাবুর গিন্নি ওই ছেলেপুলে কটাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে নাওয়া-খাওয়া করালেন; ইনি তো নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু।

তা কী আর করবেন? সবাই বলেছে 'মুখ খুলবে না'। খুলছেন না।

মৃত্যুসংবাদটি তো পেয়েছেন আসামাত্রই, মৃত্যুর কারণটিও। কিন্তু মৃতদেহটি তো দেখেননি। দেখলে কী করে বসতেন কে জানে?

তা সারাটা দিন গেলো, সন্ধ্যার মুখে পুলিশ সাহেবরা এলেন 'সময় সুবিধে' করে।

এসে তাঁদের পেশা অনুযায়ী প্রথমেই ওই তালুকদারগিন্নিকে জেরা করতে বসলেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কেবলমাত্র চোখের জল ছাড়া আর কিছু আদায় করতে পারলেন না।

মুখে একদম তালাচাবি।

হার মানলেন তাঁরা। ধরে মারতে তো আর পারেন না।

অতএব? অতঃপর? অতঃপর—

কাজল মণ্ডল!

তাকেই বন্দী অবস্থা থেকে উদ্ধার করে স্রেফ কাঠগড়ায় দাঁড় করাল।

জেরা শুরু। জেরা বলে জেরা। যার নাম 'পুলিশি জেরা'!

১। কী দেখে সে অনুমান করেছিলো, ওই তেইশ নম্বর ফ্ল্যাটে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে? যার ফলে সে থানায় ফোন করার মতো অমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করে বসেছিল?

২। মনিবকেই-বা জানায়নি কেন?

৩। কোনখান থেকেই-বা দেখতে পেয়েছিল?

৪। মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে পাশের ফ্ল্যাটেই-বা নজর দিতে গিয়েছিলো কেন? তাও শীতকালে?... লেপকম্বল ছেড়ে।... গরমকালে হলে তবু অজুহাত দেওয়া যেত... গরম হচ্ছিল, হাওয়া খেতে উঠেছিল।

৫। তার মানে, তোমার এ বিষয়ে কিছু জানা ছিল।... এখন বেপোট অবস্থায় পড়ে 'ন্যাকা' সাজছ!

তা পুলিশের যা করবার সে তো তাই করবেই।

সন্দেহ।... সন্দেহ কী? প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাস।... নিশ্চিত বিশ্বাসটি হচ্ছে— এই কাজল মন্ডলের ওই খুনীদের সঙ্গে গভীর যোগসাজশ আছে। ওই ও-বাড়ির সন্ধান-সুলুক জানিয়েছে খুনিদের। তবে এখন হয়তো টাকাপয়সার বখরার ব্যাপারে কোনো গোলমাল ঘটায়, আক্রোশের বশে, ওই 'মহামুহূর্তে' দলের লোকদের ধরিয়ে দেবার জন্যে পুলিশে খবর দিয়েছিল।... এ ছাড়া এই ব্যাপারের আর কোনো কারণ থাকতে পারে না।

জেরার সঙ্গে ধমক চমক! ধরে নিয়ে গিয়ে থানার লকআপে আটকে রাখার হুমকি। অল্পস্বল্প রুলের গুঁতো, চোখের সামনে রিভলভার নাচানো এবং দাঁতখিঁচুনি, আর চোখরাঙানি।... এই সবই হয়।

আর তার সঙ্গে কূটকচালে প্রশ্ন।

'প্রশ্ন' মানে জেরাই। তবে দশ দিক থেকে খোঁচা দিয়ে প্রকৃত সত্য বার করে ফেলবার জন্যে বিভিন্নভাবে প্রশ্ন :

১। কাজল মণ্ডলই তার প্রকৃত নাম, না বানানো নাম? প্রকৃত নাম কী?... মা বাপ ভাইবোন ইত্যাদি প্রভৃতির নাম কী?...

'দেশের বাড়ি' বলে যে ঠিকানা দিয়েছিল ওখানে 'কাজে' লাগবার সময় সেটা সঠিক কিনা।... না হলে সঠিক নামধাম ঠিকুজি কুলুজি কী?

২। এই খুনে দলের সঙ্গে যদি যুক্ত হয়ে থাকে, সেটা কবে থেকে? এবং কীভাবে?

৩। এদের সবরকম কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা আছে কিনা?

৪। এদের ডেরা কোথায়? এবং সেটা একটা, না দশ-বিশটা?...এরা বাঙালি না বেহারি, না নেপালি, না আকালি?

প্রশ্ন করে আর মিচকে মিচকে হাসে।

একজন আবার থেকে থেকে গোঁফ চাড়া দিতে থাকে।

ভেবেছিল, ওই 'কাজল মণ্ডল' বোধ হয় এই হুমকি খিঁচুনি তর্জন-গর্জনের সামনে আর মাঝেমাঝে রিভলভার নাচানো দেখে ভয় খেয়ে 'প্রকৃত তথ্য' কবুল করে বসবে।

আর থানায় নিয়ে গিয়ে 'টু' ডিগ্রি, 'থার্ড' ডিগ্রি প্রয়োগ করলে তো কথাই নেই।... হুড়হুড় করে সব কথা বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু কাজল মণ্ডল নামের মেয়েটাকে ওই হুমকিতে তেমন বিচলিত হতে দেখা গেল না। সে ধীরস্থির অটল অচল।

হবেই তো। যত যত গোয়েন্দা গল্প সে পড়েছে এযাবৎ, সবেতেই

পড়েছে এরকম ক্ষেত্রে জেরাকারী যতই শাসাক, 'জেরা পীড়িতটি' ততই ধীরস্থির থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের ভূমিকাই হাস্যকর হয়ে উঠবে। এমনই হয়।

তা এতকাল এত পড়ে পড়ে 'শক্ত' হয়েছে, আর এইটুকু জেরার হুমকিতেই ভেবড়ে যাবে?... না, তা হয় না। হল না।

তবে 'প্রকৃত সত্য'টি সে পেশ করলই অকুতোভয়ে। তার তো আর বানানো সত্য নয়।

বেশ বুকটান করেই জবাব দিয়ে যায় সে, ডাক্তার লাহিড়ীকে ও উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে।

প্রঃ— কী দেখে সে বুঝতে পেরেছিল ওই ফ্ল্যাটে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটতে চলেছে?

উঃ— কী দেখে আবার? যদি হঠাৎ দেখা যায়, একটা মানুষ তার বিছানায় আরাম করে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে, আর কোথা থেকে দুটো ধুমসো লোক এসে হঠাৎ লাফিয়ে তার খাটের ওপর চড়ে বসে তার গলা টিপে ধরল, তাহলে কি ভাবতে হবে একটা মজাদার ঘটনা ঘটতে চলেছে?

প্রঃ— দুজনেই গলা টিপে ধরেছিল?

উঃ— নাঃ, একজন দু-হাতে তার হাত দুটো চেপে ধরেছিল, আর অন্যজন দু-হাতে গলাটা—

প্রঃ— দেখেই মনিবকে জানায়নি কেন?

উঃ— কেন আবার? মায়ামমতার বশে। জানতে পেরেছিলুম আজ খুব শক্ত একটা মরণবাঁচন অপারেশন কেস-এ সারাদিন খেটে সবে ফিরে মাত্র একগ্লাস কমপ্ল্যান খেয়ে শুয়ে পড়েছেন। তাঁকে জাগাব? মাইনে-করা লোক বলে কী তাদের মায়ামমতা বলে কিছু থাকতে নেই? নিজের বাবা, জ্যাঠা, কি দাদু হলে, এমন অবস্থায় ডিসটার্ব করা যেত? তাছাড়া—

প্রঃ— 'তা ছাড়া'টি আবার কী?

উঃ— তা ছাড়া ডাক্তারবাবুর নব্বুই-একশো বছরের 'মা'টি যদি সাড়াশব্দে ঘুম ভেঙে উঠে 'কে র‍্যা? কীসের শব্দ' বলে চেঁচিয়ে উঠতেন? তাহলে? অপরাধীরা সর্তক হত না?

প্রঃ— এ-ফ্ল্যাটের থেকে বুড়ো মানুষ একটু চেঁচিয়ে উঠলেই ও-ফ্ল্যাট থেকে শুনতে পাওয়া যেত?

উঃ—সারা পাড়া থেকে শুনতে পাওয়া যেতে পারে।

...কোনখান থেকে দেখেছি?... আমি যেখানটায় শুই সেখানের একটা

জানলা থেকে। সেটাকে 'ঘর' বললে বলতে পারা যায়, আবার ফালতু জায়গা বললেও বলা যায়।

প্রঃ—তো সেখান থেকে এত সঠিক সব দেখা যায়?

উঃ—সরাসরি যায় না। তবে নিজস্ব কৌশলে অত পষ্ট দেখা গেল।

প্রঃ—কৌশলটা কী?

উঃ—বলে বোঝানো যাবে না। নিজে এসে দেখুন সাহেবরা।

তা দেখলেন এসে তাঁরা। আর দেখে ডাক্তার লাহিড়ীর মতোই তাজ্জব হয়ে গেলেন।

জানলার ধারের কার্নিশে জানলার গ্রিলের সঙ্গে কী করে যেন সুতো-টুতো কিছু বেঁধে একখানা ছোটো মাপের হাত-আয়না এমন তেরছাভাবে আটকে রাখা হয়েছে যে, ওই ঘরখানার সব দেখা যাচ্ছে। এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল। চার দেয়াল। দরজা-জানলা, মায় ঘরের আসবাবপত্র।

'আয়না' যে কী একখানা মারকাটারি জিনিস! সবসময় হয়তো সেটা কারুর খেয়াল থাকে না, তাই। খেয়াল থাকলে হয়তো যেমন কোনো কোনো বাড়ির দরজায় লেখা থাকে 'কুকুর হইতে সাবধান।'... তেমনি লোকের ঘরে ঘরে লেখা থাকত 'অপরের ঘরের আয়না হইতে সাবধান।'

সত্যি, লক্ষ করলেই দেখা যাবে, আয়নায় ঠিক নিজের পাশের দেয়ালের দৃশ্যটিও দেখা যাচ্ছে।... মুখোমুখি না হলেও দেখা যাবে কোথায় না কোথায় রাস্তায় গাড়ি চলছে, ছাতা মাথায় লোক চলছে। ... কোন কোণের দিকের সাততলা ফ্ল্যাটের বারান্দায়, কী রঙের শাড়িখানা ঝুলছে, হাওয়ায় দুলছে।... কী ভাবে যে এসব হয়!

তা ঠিক হয়। এটা একটা জানা ব্যাপার। তবে কে আর সবসময় সেই নিয়ে মাথা ঘামায়? কাজল মণ্ডলের মাথাটা হঠাৎ এ নিয়ে খেলে উঠল কেন? রহস্যটা কী? কোন উদ্দেশ্যে এই এক্সপেরিমেন্ট?

রহস্যও কিছু নয়, অভিসন্ধিমূলক কোনো পরীক্ষাও নয়, হঠাতের ব্যাপার। একটা আকস্মিক আবিষ্কারের ফলে, কৌতূহল জেগে ওঠার ফল।

ওঃ। সেই আকস্মিক আবিষ্কারটি কী?

কী সেটাই সংক্ষেপে বোঝাবার চেষ্টা করে এই উত্তরে দাঁড় করায় কাজল... হঠাৎ একদিন পড়ন্ত বেলায় ঘরের দেয়ালে ঝোলানো বড়ো আয়নায় ছায়া ছায়া ভাব হওয়ায় কপালের টিপটি ঠিক জায়গায় সেঁটে বসাতে, একখানা ছোটো হাত-আয়না নিয়ে খোলা জানলার ধারে বেরিয়ে এসে টিপ সাঁটতে

গিয়ে হঠাৎ ও-ফ্ল্যাটের খোলা জানলার দিকে চোখ পড়ে যাওয়ায় একদম হাঁ; অবাক-করা দৃশ্য।

একদম হাঁ? অবাক করা দৃশ্য? কী সেই দৃশ্যটি?

সে-দৃশ্যটি?...

হঠাৎ দেখা গেল তালুকদারমশাই বাইরে থেকে এসে ঘরের ভেজানো দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন, বেশ পেটমোটা একটি ব্যাগ হাতে করে, যেন হাঁপাতে হাঁপাতে। তড়িঘড়ি ঘরের ভেতরের ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিয়ে সরে এলেন দেয়াল-ধারে রাখা মস্তবড় গডরেজের আলমারিটার সামনে।... পকেট থেকে চাবি বার করে কডোং করে খুলে ফেললেন তার একটা পাল্লা, আর—? আর ওই ব্যাগটার মুখের চেন খুলে ফেলে গোছা গোছা নোটের বাণ্ডিল বার করে আলমারির মধ্যে গুঁজে গুঁজে ভরে ফেলে চটপট আলমারির পাল্লা বন্ধ করে খালি ব্যাগটাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়লেন একবারে চিৎপাত হয়ে।... আবার তক্ষুনিই উঠে পড়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন দরজাটাকে টেনে বন্ধ করে দিয়ে।... ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটলো, দেখে মনে হল যেন পেছনে কেউ তাড়া করেছে!... তা তাড়া যদি কেউ করে থাকে, তা সে বোধ হয় তাঁর গিন্নি।...কারণ দেখা গেল মিনিট খানেক না যেতেই গিন্নি ঘরে ঢুকলেন... এদিক ওদিক তাকালেন, তারপর গালে একটা হাত দিয়ে দুমদাম করে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই গাড়ি বেরিয়ে যাবার শব্দ শোনা গেল।

প্রঃ—তো বলা তো হচ্ছিল, 'পড়ন্ত বেলা' নিজের ঘরের আয়নায় কপালে 'বিন্দি সাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল! ওদের ঘরের মধ্যেটা এমন খুঁটিনাটি দেখা গেল কী করে?'

উঃ—কারণটা হচ্ছে এই, এ-বাড়িতে যে-দেয়ালে আয়না ঝোলে, সেই দেয়ালটা 'জন্মছায়া'। আকাশে একটু মেঘ করলেও মুখ দেখা যায় না। তবে বাড়ির লোকদের মধ্যে আর দেখছে কে?... কর্তামার তো সে-প্রশ্নই নেই। আর ডাক্তারবাবু? তাঁরই-বা সময় কোথায়? ভোরসকালে বাথরুমের আয়নায় তো দাড়িটা কামিয়ে নেন। সে-আয়নার দু-ধারে দুটো লাইট ফিট করা থাকে।... এখানে আয়নায় মুখ দেখতে এই কাজল!... সে কী আর বলতে যাবে, আয়নাটা অপর দেয়ালে টাঙালে ভালো হয়। তা ছাড়া—

আবারও 'তা ছাড়া'? এই 'তা ছাড়া'টি কী?

এটি হচ্ছে— তা ছাড়া জগদীশবাবুর ঘরের জানলা দুটো পশ্চিমমুখো, তখন একেবারে ঘরে সোনাঝরা আলো। সব দেখা গেল। তা সেদিন সেই

দৃশ্যটি দেখে কেমন সন্দ সন্দ হওয়ায় তদবধি ওই বাড়িটার, বিশেষ করে ওই ঘরটার দিকে 'নজর' রাখতে শুরু করেছিল কজল। আর সেটা রাখার দরুন অনেক কিছু দেখেছিল। তবে সে-সবের মানে তখন বুঝতে পারেনি।

প্রঃ—সেই 'অনেক কিছুটা' কী?

উঃ—সে-কথা পরে হবে। অনেক কথা।

প্রঃ—তা টাটকা কথাটাই শোনা যাক। মাঝরাত্তিরে জেগে উঠে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে নজর ফেলতে গিয়েছিলেন কেন?

কেন? সেও দৈবাৎ! জানলাটা একটু খোলা ছিল, ঠান্ডা হাওয়া আসছিল বলে শুয়ে পড়বার আগে, সেটা বন্ধ করতে গিয়ে যা একখানা দৃশ্য দেখল, তাতেই আক্কেল গুড়ুম।... শোয়া আর হল না। জানলায় চোখ ফেলেই রাত বাড়তে লাগল। বোঝা যাচ্ছিল তো ভয়ংকর একটা কিছু ঘটতে চলছে ও-ঘরে।

সেই আক্কেল গুড়ুম করা দৃশ্যটি কী এমন? যাতে মনে হল পুলিশে খবর দেওয়া উচিত?

তা যদি হঠাৎ দেখা যায় একটা মানুষ বিছানায় পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে, আর খাটের ধারে দুটো ধুমসো লোক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে, তাতেই ভয় ভয় করে না? আর তারপর যদি দেখা যায়, সেই ধুমসো দুটো লাফিয়ে খাটের ওপর চড়ে বসে ঘুমন্ত লোকটার গলা টিপে ধরল, তাহলেও কি সেটাকে 'ভয়ংকর' না ভেবে একটা মজাদার দৃশ্য বলে মনে হবে?

প্রঃ—দুজনেই গলা টিপে ধরেছিল?

উঃ—না। একজন দুহাতে ঘুমন্ত লোকটার হাত দুটো চেপে ধরেছিলো, অন্যজন গলাটা—

'এই তো! প্রথমে এটি খুলে বলোনি তো? চেপে যাচ্ছিলে।'

'কী? হাত দুটো চেপে ধরেছিল ওই কথাটা চেপে যাচ্ছিলাম? কেন? কী জন্যে? অদ্ভুত কথা!'

'জেরার মুখে পড়লে সব কথাই অদ্ভুত মনে হয়।... তো তারপর?'

'তারপরের কথা তো সবই ডাক্তারবাবুর মুখে শুনেছেন। জেনেছেন।'

'হুঁ! তো আগের সেই 'অনেক কিছু' দেখার কথাটা?'

ও, হ্যাঁ। সে একটা অবশ্য মজার দৃশ্য! দিনের পর দিন, দেখতে দেখতে কৌতূহল বেড়ে যাওয়ায় যেন দেখার নেশায় পেয়ে বসেছিল কাজল মণ্ডল নামের মেয়েটার।

ফ্ল্যাটগুলোর একদম নীচের তলায় জমাদার যাওয়া আসার জন্যে যে একটা সরু প্যাসেজ থাকে, যেদিকের দেয়ালে যত সব মোট-মোটা পাইপ,

বাথরুমের জল বেরোবার, গ্যাস বেরোবার, সারি সারি। কেলে কেলে কুচ্ছিত সেই পাইপগুলো দেখলে বিচ্ছিরি লাগে। একদিন হঠাৎ এ-বাড়ির বাথরুম থেকে চোখে পড়ল ও-বাড়ির তেমনি একটা পাইপ বেয়ে শুঁটকো মতো একটা লোক তালুকদারবাবুর ঘরের আটাচড বাথরুমটার জানলার কার্নিশে উঠে কী যেন করছে। লোকটার কোমরে বাঁধা একটা ঝোলায় কী যেন সব যন্ত্রপাতি!

এরকম দেখে মনেই হতে পারে জানলাটার কিছু মেরামত করতে এসেছে।... কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে বাথরুমের ভেতরে দাঁড়িয়ে না করে, অতখানি রিস্ক নিয়ে পাইপ বেয়ে কেন? পা রাখবার জন্যে তো মাত্র কয়েক ইঞ্চি চওড়া কার্নিশটা।

তা একদিন দেখলে তেমন কিছু মনে হবার কথা নয়। মনে হল কে জানে কী...।

কিন্তু দিনের পর দিন যদি ওই একই দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়? তাও—হয় ভর দুপুরে যখন রোদ ঝাঁ ঝাঁ, রাস্তার লোক ওপর দিকে তাকায় না, নয়তো—অন্ধকার হয়ে আসা সন্ধের সময়।

দিনের পর দিন ওই দৃশ্য?

তবে না তো কী? অন্তত পনেরো-বিশদিন। আসলে বোধ হয় একসঙ্গে বেশিটা করা সম্ভব হচ্ছিল না। তো পরে মনে হয়েছিল যেন স্ক্রু-ড্রাইভার ঘুরিয়ে গ্রিলের স্ক্রুগুলো টাইট মারছে।... আসলে সে করছে ঠিক তার উলটো, তা কে বুজেছে?

বোঝা গেল পরে।

মানে পুলিশ সাহেবরাই বুঝলেন।

তালুকদারগিন্নিকে সঙ্গে করে ওপরে উঠে এসে মড়া শনাক্ত করিয়ে ওঁরা ঘরের সবদিক দেখে বলে উঠলেন, আচ্ছা, অপরাধীরা তো ঘরের ভেতরের দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে রেখেছিল। দরজা ভেঙে ঢুকতে হল। কিন্তু তারা নিজেরা বেরোল কোনখান দিয়ে? ঘরটায় তো আর কোনো দরজা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। জানলায় জানলায় শক্ত গ্রিল। তাহলে? পাখি হয়ে উড়ে গেল নাকি? এটা তো কাল খেয়াল হয়নি।... নাকি ভৌতিক ব্যাপার!

ইতি-উতি চোখ পাততে পাততে, হঠাৎ খেয়াল হল, মস্ত একটা সস্তামার্কা হালকা কাঠের দেয়াল জোড়া ওয়ার্ডরোব যেন দেয়াল থেকে সামান্য এগিয়ে রয়েছে। পিছনে সরু একটু ফাঁক।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন পুলিশ সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে। ... বাকিরাও—

আর তখনই ধরা পড়ল আসলে সেটা ওয়ার্ডরোব নয়, ফাঁকা খিলেন! আর ওই পাল্লা দুটোই তার দরজা।

ব্যস! খুলে ফেলতেই বাবাজিরা ঢুকে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'মাই গড' বলে।

কেন?

সেখানেও কি কোনো মৃতদেহ নাকি?

'ঝুলন্ত' অথবা 'শায়িত'?

নাঃ, অতটা নয়।

দেখা গেল সেখানে একটি নিরেট নিশ্চিদ্র দেয়ালঘেরা ছোটোমতো ঘর। ফুটোফাটাহীন সেই ঘরটার দেয়ালের ধারে ধারে ড্রয়ার লাগানো টানা টানা দুটো গড্‌রেজের আলমারি। অনেকটা 'ব্যাঙ্ক লকার'র মতো।

দুটোই হাটপাট করে খোলা খালি।

তার মধ্যে যে দেরাজগুলো রয়েছে সেগুলোও হাঁ করা—খালি। ভোঁ ভোঁ, ফাঁকা।

তবে ঘরের মেজেয় বেশ কিছু কাগজপত্র ছড়ানো।...

দলিল টলিল গোছের, কিংবা ক্যাশমেমো ধরনের। আর বেশ কিছু পোড়া বিড়ির টুকরো।

এ ঘর দিয়ে বেরিয়ে যাবার সাধ্য পাখিরও নয়। একমাত্র সাধ্য ভূতের।

কিন্তু ভূতেরা কি বিড়ি খায়?...

মড়া তো মর্গে চলে যেতে তাদের কেয়ারে চলে গেলো।...

আবারও তালুগদারগিন্নীকে জেরা।

কিন্তু তাঁর মুখে যে তালাচাবি!

যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'এই মৃতদেহ আপনার স্বামীর?'

তখন কাঠপুতুলের মতো একবার ঘাড় হেলিয়ে ছিলেন মাত্র। ইতিবাচক।

এখন যখন জিগ্যেস করা হল, 'এইখানে এরকম একটা ঘর আছে আপনি জানতেন?'

তিনি জোরে জোরে দু-বার ঘাড় নাড়লেন। নেতিবাচক।

'আপনার স্বামী কী ধরনের ব্যবসা বা কাজকর্ম করতেন। আপনি জানতেন না?'

আবার সেই জোরে জোরে মাথা নাড়া।

ডাক্তার লাহিড়ী এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই রয়েছেন। কারণ কাজলকেও তো ধরে নিয়ে এসেছেন এঁরা।

তা তালুকদারগিন্নির অবস্থা দেখে ডাক্তার লাহিড়ী বলেন, ‘দেখুন, হঠাৎ দারুণ একটা মেন্টাল শক্ খেয়ে হয়তো এঁর স্বর বন্ধ হয়ে গেছে। এঁকে ছেড়ে দিন, আর কষ্ট দেবেন না।’

অগত্যা শুনলেন তাঁরা তাঁর কথা।

বললেন, ‘আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।’

কিন্তু আসল হদিসটার কী হবে?

খুনি দুটো পালাল কোথা দিয়ে?

দেয়ালে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে দেখলেন এঁরা। না। কোনোখানে ফাঁপা-টাঁপা নয়।

শেষ পর্যন্ত কাজল মণ্ডলের আবেদন নিবেদন! ‘বাথরুমটা একবার, মানে এই জানলাটা ভালো করে দেখলে হতো না?’

‘আমাদের অত ‘বেশি ভালো’ করে দেকতে হয় না। নজর ফেললেই দেখা যায়।... ওই জানলাটার মাপ দেখা হয়েছে? ওর মধ্যে দিয়ে ‘ধুমসো মুসকো’ দুটো লোক গলে যেতে পারে?’

‘একটা রোগা টিঙটিঙে লোকও তো ছিল, যে লোকটা দিনের পর দিন পাইপ বেয়ে উঠে সরু কার্নিশে পা রেখে গ্রিলের স্ক্রু ঘুরিয়েছে!’

‘ঘুরিয়েছে। কিন্তু কোনদিকে? ওই তো গ্রিলখানা দিব্যি টাইট ফিট হয়ে জানলার ফোকরে সেঁটে রয়েছে।... তবে যদি বলা হয় গ্রিলের ডিজাইনের ফাঁক দিয়েই গলে গিয়ে—কিন্তু কত টিঙটিঙে সেই লোক? একটা বেড়ালছানাও তো ওর মধ্যে দিয়ে—’

বলেই প্রধান অফিসারমশাই গ্রিলটায় একটা চাপড় মারলেন।... আর সঙ্গে সঙ্গে যেন একখানা ‘উড়নচাকি’র মতো সেটা ফস করে উড়ে গিয়ে ঝনঝন শব্দে নীচে বাঁধানো শানের ওপর পড়ে গেল।... নাকি কার মাথার ওপর?

নীচে কোনো আর্তনাদ উঠল না?

উঠল। তবে সেটা মাথায় বাজ পড়ে মরণ হলে যেমন আর্তনাদ ওঠে, ঠিক তেমন নয়।

এ হচ্ছে হই হই করে আর্তনাদ।

কী হল? কী হল? কোথা থেকে কী পড়ল?

নীচের তলা থেকেই উঠল এই হই চই। গতকাল যেখান থেকে ‘চোর—চো-র’ ধ্বনি উঠেছিল!

এখন নিরীক্ষণ করে দেখা গেল গ্রিলের স্ক্রুগুলো সব খোলাই ছিল, শুধু কোনোমতে একটু ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল।

অর্থাৎ লোকটা ওই খোলা গ্রীলের খাঁজ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে, পূর্ব অভ্যাসমতো কার্নিশে পা রেখে, সেটাকে লোক-ঠকানো করে ঠেকিয়ে রেখে পাইপ বেয়ে চম্পট দিয়েছে।

নীচে নেমে এসে দেখা গেল গ্রিলখানা নোংরা নর্দমার ওপরে পড়েছে।

কিন্তু পুলিশের কাছে আবার 'নোংরা'!

একজন কনস্টেবল সেটাকে টেনে সরিয়ে সামনে এনে বলে উঠল, 'এর গায়ে কোনো জামা-টামা কিছু ছেঁড়ার টুকরো লেগে রয়েছে।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি?'

'কীরকম জামার টুকরো? দেখি দেখি।'

দেখা হল।

সবাই মিলেই দেখা হল।

আর কাজল মণ্ডল বলে উঠল, 'এ তো দেখছি তালুকদারবাবুর ঘরের জানলার পর্দার টুকরো!'

'তোমার চেনা আছে?'

'বাঃ। নিত্যদিন দেখছি না?'

কনস্টেবলটা বলে ওঠে, 'আরে, কাল যে ব্যাটা চোরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো মস্ত একটা পুঁটুলি সমেত, এ যে দেখছি সেই পুঁটুলিটার কাপড়ের টুকরো।'

তারমানে চোরটা ঘোষবাবুদের বাড়ির বাসনপত্র, কাঁসা, পেতল নিয়ে ভাগছিল না। ওই তালুকদারবাবুর বাড়ি থেকেই কিছু সরিয়েছে।... এবং সরাবার সুবিধের জন্যে একটা জানলার পর্দা খুলে নিয়েছিল পুঁটুলি বাঁধতে।

অবশ্য বলতে হবে, সুবিধে করতে কাজল মণ্ডলের গোয়েন্দাগিরিরও। পর্দাবিহীন জানলা বলেই না অত ঠিকমতো দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু সেই পুঁটুলিতে কী ছিল তা দেখা হয়নি?

সর্বনাশ। কে দেখবে?

কেন? এই এরাই তো ধরে নিয়ে গেল!

ওঃ। ধরে নিয়ে গেল বলেই সবকিছুর কর্তা হয়ে যাবে?... অমন কর্মটি করে বসলে চাকরি যাবে না?... সে-পুঁটুলি পড়েছে হেড অফিসে।

এবং তারপর?

দেখা গেছে, তার মধ্যে বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোটের গোছা, আর গোছা গোছা সোনার বিস্কুট।...

...অভাবনীয়।

সেই সূত্রে ধরা পড়ল বিরাট একখান চোরাচালানের ব্যবসার কর্মকাণ্ড।... যে-কাণ্ডের জাল বিছানো রয়েছে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে কাঠমান্ডু, কাঠমাণ্ডু থেকে আরও সব কোথায় কোথায় যেন।

এই কাণ্ডরই একটি চুনোপুঁটি সদস্য ছিলেন তালুকদারবাবু।... যাঁর কাজ ছিলো শুধু চালান দেওয়ার আংশিক ভার।... খুব সম্ভব তার বেশি কিছুটা জেনে ফেলেই ভদ্রলোকের এই পরিণতি।

তবে বহু তদন্তে প্রকৃত তথ্য ধরে ফেলার আগে পর্যন্ত কাজল মণ্ডল নামের মেয়েটার কি কম 'হেনস্থা' হয়েছে?

সেই এককথা—

'কাজল মণ্ডলই' কি তার প্রকৃত নাম, না ছদ্মনাম?... এখানে কাজে লাগার আগে আর কোথায় কোথায় কাজ করেছিল?... 'দেশের বাড়ি' বলে যে ঠিকানা দিয়েছিল, সেটা সঠিক, না বেঠিক? সঠিক হলেও আরও নামধাম ঠিকুজি-কুলুজি কী?... এই খুনে দলের সঙ্গে কোনরকম যোগসাজস ছিলো কিনা? থাকলে, কবে থেকে? এবং কীভাবে? এদের ডেরা কোথায় জানা আছে কিনা। এরা বাঙালি না নেপালি? না আকালি? নাকি বিহারী? অথবা সারা ভারতের কোনো প্রদেশের? এসব কথা বারবার জিগ্যেস করেছে শাসিয়ে, হুমকি দিয়ে। কিন্তু কাজল মণ্ডল নামের মেয়েটাকে কোনোরকমেই কাত করতে পারেনি।... সে একদম সোজা সতেজ।

'কাজল মণ্ডল' ছাড়া আবার কটা নাম থাকবে? এ কী বড়োলোকের ঘরের মেয়ে? যে দশ-বিশটা আদুরে নাম থাকবে?

এদের বাড়ি কাজে লাগার আগে জন্মেও আর কোথাও কাজ করেনি। ইস্কুলে পড়েছে। ইচ্ছে হলে সেই রাজপুর মহামায়া বালিকা বিদ্যালয়ে গিয়ে নামের খাতা দেখুনগে।... বাপ মরে গেল বলেই পড়া খতম।... খবরের কাগজে 'কর্মখালির' বিজ্ঞাপন দেখে চলে আসা।...ইচ্ছে হলে, সেই তারিখের সেই বাংলা কাগজখানা দেখতে পারেন।

কাজলের কাছে তোলা আছে সেই কাটিংটুকু। দেখাতে পারল।

সেই কাটিং-এর বয়ান হচ্ছে—

'একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা মহিলার দেখাশুনোর জন্য একটি নির্ঝঞ্ঝাট মেয়ে আবশ্যক। সামান্য লেখাপড়া জানা বাঞ্ছনীয়। বয়স কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে। প্রার্থী নিজ নাম ঠিকানাসহ নিচের ঠিকানায় আবেদন করুন।'

সেই নীচের ঠিকানাটি অবশ্যই ডাক্তার লাহিড়ীর।

মিলে গেল যথাযথ।

এমনকী কাজে যোগ দেবার তারিখটি পর্যন্ত নির্ভুল।... ডাক্তার লাহিড়ীর ডায়েরিতে পাওয়া গেল।

অতএব ওই খুনে দলের সঙ্গে যোগসাজশের কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কাজল মণ্ডল নামের মেয়েটার।

হাজত থেকে ছেড়ে দিল তাকে।

হাজতে থাকতে হয়েছিল অতদিন!

তা হবে না? যতদিন না জেরা করে করে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় ততদিনই থাকতে হয়।

জামিনে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছিলেন ডাক্তার লাহিড়ী। সফল হননি।

পুলিশ পক্ষের বক্তব্য, 'এই ধরনের মেয়েরা দারুণ ডেঞ্জারাস হয় মশাই, অতএব জামিনের অযোগ্য!'

তবে অনেকদিন যাবৎ তদন্ত সাপেক্ষে, সেই পর্দাছেঁড়া কাপড়ের টুকরোর দৌলতেও কিছুটা, ধরা পড়ে গেল একটি চোরাচক্রের কারবার।

কী থেকে যে কী হয়! কোথাকার জল যে কোথায় গড়ায়!... নোটের বাণ্ডিলে লেগে থাকা সেই ছেঁড়া সুতোর আঁশ ধরিয়ে দিল একটি বৃহৎ ঘুঘুকে।

ক্রমশ দেখা গেল ওই খুনে দলে সারা ভারতের নানা প্রদেশের লোকই যুক্ত।... কিন্তু এরা হচ্ছে ভাড়াটে খুনে। মোটা কিছু টাকা পেলেই যে কাউকে খতম করে দিতে পারে, লাশ লোপাট করে দিতে পারে। এই ধরনের অনেক কিছুই পারে! টাকা ফেললেই হল।

তবে এরা ওই 'চক্রের' কেউ নয়। কীসের চক্র, তা নিয়ে এদের মাথা ঘামানোও নেই! এরা যে তাদের নিয়োগকর্তার নামধাম পরিচয় ইত্যাদি পুলিশের কাছে কবুল করে, সেটা বিশ্বাসঘাতকতার পর্যায়ে পড়ে না। এদের ইষ্টমন্ত্র হচ্ছে—'টাকা যার, আমি তার।'

অথচ, এদের হাতেই মাথা বাঁধা ওই অপরাধীদের। স্বয়ং কর্তারা তো আর মাঝরাত্তিরে কারও ঘরে চড়াও হয়ে খুন করতে আসতে পারেন না। অথবা 'মৃত'কে নতুন করে 'মৃত' সাজাতে মড়ার গলায় দড়ির ফাঁস পরাবার ফুরসত করতে পরেন না। তাঁরা তো দামি দামি স্যুট পরে, পাঁচতারা হোটেলের ঘরে বসে মান্যগণ্য লোকেদের সঙ্গে চা খান ডিনার খান।

ধরা পড়লে, মরতে হয় ওই ভাড়াটে খুনেদের!

সে যাকগে। এসব তো অন্ধকার জগতের চিরকালের ঘটনা।

তবে ডিটেকটিভ হতে হলেই, ওইসব অন্ধকার জগতের সন্ধানসুলুক জানতে হয়।... দেখা যাক, অতঃপর কাজল কী কী পারতে পারে? সে তো পরের কথা।

একটি বিশেষ চোরাচালানের চক্র আবিষ্কার করে ফেলায় কলিকাতা পুলিশের 'বুদ্ধিমান বিভাগের' নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল।

সেই দপ্তরের কার কার যেন পদোন্নতি হল এবং ভাগ্যে ভালোমতো 'পুরস্কার'ও জুটল।

আছে এমন ব্যবস্থা লালবাজারে!

তা বোধ হয় একটু বিবেকের দংশনেই সেই দপ্তর থেকে 'কাজল মণ্ডল' নামের মেয়েটাকে ডাক দেওয়া হল, তার তীক্ষ্নবুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও স্মার্টনেসের জন্যে পুরস্কার দিতে।

একদিন অন্য কোনো ব্যাপারে পুরস্কার প্রাপকদের ব্যাচ বিতরণী অনুষ্ঠানের দিন কাজলকেও ডাকা হয়েছিল। গিয়ে পুরস্কার নিয়ে এল।

তা কী সেই পুরস্কার!

এমন আহামরি কিছু না।

নগদ পাঁচশো টাকা, আর ইংরিজিতে লেখা কী একটা সার্টিফিকেট।

তা সেটাই-বা কম কী?

'পুরস্কার' বলে কথা।

তাও আবার রাজ্য সরকারের দেওয়া।

কাজল বেচারি তো তার সেই রাজপুর মহামায়া বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাসে ফার্স্ট হয়েও কখনও প্রাইজ পায়নি।

পাবে কোথা থেকে? সে তো 'ফ্রি'তে পড়ত। যারা 'ফ্রি'তে অর্থাৎ কিনা বিনা বেতনে পড়ে, তাদের ভাগ্যে 'প্রাইজ' জোটে না। এই নিয়ম ছিল তাদের সেই স্কুলে। কী যে অদ্ভুত নিয়ম!

তা জীবনে কখনও পুরস্কার পাওয়ার স্বাদ জোটেনি যার, তার তো এই পরম প্রাপ্তি।

তা ছাড়া পাড়ায় ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল।

চেনাজানা সব মহলেও।

কী একখানা খবরের কাগজে বেরোলও খবরটা খুদে খুদে অক্ষরে।

তাই বা কম কী? ছাপার অক্ষরে বেরোলো তো 'কাজল মণ্ডল' নামটা!

ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা দেখবার জন্যে কত মহা মহা লোকেদেরই মনের মধ্যে কত আকুলতা থাকে।

তা সে যাক—সবাই ধন্যি ধন্যি করল, শুধু নীহারিকা দেবী ঠোঁট উল্টে বললেন, 'পোড়া কপাল সরকারের! এই পুরস্কার! লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যার কারবার, তার হাত দিয়ে এই ক-টা টাকা বেরোলো? এ তো ওদের হাতের ধুলোও নয়। ছিঃ। এদিকে তো শুনলুম ওই কাজলের বুদ্ধিতেই নাকি মস্ত একখানা চোরামির চাঁই ধরা পড়ে গেছে! তাই থেকেই পুলিশ নিজেদের খুব বাহাদুরি দেখিয়ে পুরস্কার লুটেছে।'

তা শুনেছেন বই কী।

এই খুনের কেসটি নিয়ে যত কিছু খবর বেরিয়েছে, সবই আদ্যোপান্ত শুনেছেন তিনি। না শুনে ছাড়বার মেয়ে?

কাজলকে হাতে না পেয়ে, হাত করে ফেলেছিলেন রাজুর একটা স্কুলে পড়ুয়া ভাইপোকে। বছর তেরো-চোদ্দর ছেলেটা। নিজেই সে খবরের কাগজের পোকা। অবশ্য খেলার খবরের পাতাটার। সেটা প্রায় মুখস্থ করে ফেলে।

তবে ডাক্তারবাবুর মা তার কাছে কাগজ পড়া শুনবেন, আবার তার বদলে 'মিষ্টি খেতে' টাকা দেবেন শুনে সে আহ্লাদে গলে গিয়ে সাত সকালে এসে কাগজ নিয়ে বসে, আগাগোড়া সব পড়ে শোনায়।

এমনকী গল্প করতে করতে কাগজ বহির্ভূত অনেক খবরও শোনায়। যেমন বাজারে শুনে আসা গুজব।

তা ছাড়া গল্প করতে সময় পেলেই চোখ বড়ো বড়ো করে শোনায়, 'বুঝলেন কর্তামা! গোয়েন্দাদের একালে খুব মান্যি। এরপর কাজলদিরও তা হবে।... যেখানে যত চুরিডাকাতি খুন-টুন হবে, সবাই 'কাজল মণ্ডল'কে খুঁজতে আসবে। টি.ভি.-তে দেখেননি। যেখানে যা অপকাজ ঘটছে তারা খুঁজে খুঁজে গোয়েন্দা 'রাত্রি রায়'কে এসে ধরছে কেসটা নেবার জন্যে।'

নীহারিকা বলেন, 'তা হ্যাঁরে গজু! অ গজু (রাজুর ভাইপোর নাম গজু)! বলি তুই এত কথা জানলি কী করে!'

গজু বলে, 'মন দিয়ে টি.ভি. দেখলে জগৎসংসারের কিচ্ছুটি অজানা থাকে না কর্তামা।'

'তা হ্যাঁরে! ওই পাজী দুটোর কী শাস্তি হবে? ওই খুনে দুটোর?'

'তা সে তো এখনো রায় বেরোয়নি।'

সেই বেরোনোর জন্যে অপেক্ষা বুড়ির।

অবশেষে বেরোলো একদিন। এ খবরটা দিলেন ডাক্তার লাহিড়ী!

'বুঝলে মা? পাপের শাস্তি হাতে হাতে। সেই খুনে দুটোর ফাঁসির হুকুম হয়ে গেলো। আপিল চলবে না।'

নীহারিকা দেবী বললেন, 'ফাঁসির হুকুম? ক-দফা?'

'ক-দফা মানে?'

বলছি, 'যে-মহাপাপী পাতুকিরা, নিজেদের কোনো রাগ ঝগড়া শত্রুতা নেই, শুধুমাত্তর পয়সা পেলেই মানুষ খুন করতে পারে তাদের ওই বাজার চলতি একবারের জন্যে ফাঁসির হুকুম হল! সাধে বলেছি তোদের সরকার হচ্ছে হাড়কিপটে। পুরস্কারেও হাত দিয়ে জল গলে না, 'তিরস্কারের' বেলাতেও তাই। আমার হাতে ভার থাকলে আমি ওই পাজি লক্ষ্মীছাড়া নরকের কীট দুটোর জন্যে ডবল ফাঁসির হুকুম দিতুম।'

আর কাজল যখন একবার দেশ থেকে ঘুরে এসে পুস্কারটি হাতে নিয়ে কর্তামাকে প্রণাম করতে এল, কর্তামা বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে কাজল, তুই এত বাহাদুরি দেখালি, নাম কিনলি, আমারও ইচ্ছে তোকে কিছু পুরস্কার দিই। তো কী দেব বল? কী চাস? যা মন হয় বল্।'

কাজল আস্তে বলে, 'বলব? বলছি, আপনি যতকাল থাকবেন, আপনার কাছে থাকতে চাই।'

'অ মা! এ আবার কী একটা চাওয়া হল? এ তো বরং আমারই প্রাইজ পাওয়া হল?... আমি বরং ভেবে মরছি, এখন তো পাঁচজনে তোকে ডাকাডাকি করবে, আমিই আর তোর নাগাল পাব না।... গজু বলেছে—'

'গজু? গজুর কথা বাদ দ্যান তো! তবে—এও বলতেই হবে কাজলের যা কিছু বাহাদুরি সবটাই তো আপনার দৌলতে! আপনার কাছে না থাকতে পেলে এত গোয়েন্দা গল্পের বই পেতুম কোথায়? দিত কে? গাদা গাদা গোয়েন্দা গল্পের বই পড়েই না মাথায় বুদ্ধি গজিয়েছিল। গল্পই কি অল্প জিনিস কর্তামা?'

'ওমা এ তো বেশ বললি!' ফোকলা মুখে হি হি হেসে বলে ওঠেন নীহারিকা দেরি, 'সেই যে বলে না—কচুগাছ কোপাতে কোপাতে মানুষ কোপানো ডাকাত হয়ে ওঠা—' এ যে দেখছি তাই বলছিস?... হিহি। তবে তোরটা উলটো— এ হল 'পড়তে পড়তে গড়ে ওঠা'!

সুতোর টানে

জুন মাসের বিকেল।

সারাটা দিন গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে অবশেষে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে প্রভাংশু বলে উঠলেন, 'নাঃ! আর শুয়ে পড়ে থাকতে পারা যাচ্ছে না। সারা দুপুর লোডশেডিং, পাখা বন্ধ।'

ভাগনে পলু বলে ওঠে, 'সারাটা দুপুর নয় মামা। মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। সারা দুপুরই ফুলফোর্সে পাখা ঘুরছিল।'

'তবে? অতো গরম হচ্ছিল কেন?'

'কেন আর? পাখার হাওয়াও আগুন ঢালছিল বলে। এত করে তোমায় বলছি মামা, একটা রুমকুলার কেনো, তো কিনছ?'

'ওরে বাবা কিনছি না কী আর সাধে? রেস্ত থাকলে তো কিনব?'

'ওটা তোমার গাজুরি কথা মামা। ইচ্ছে করলেই কেনা যায়। কত সময় কত খদ্দের আসে, টাকা নিয়ে সাধাসাধি করে, তুমি ফেরত দাও।'

'পলু রে! তারা হচ্ছে পাজি পার্টি! নিজেরা খুন জখম করে, কিংবা চুরি-জোচ্চুরি করে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপাতে চায়, তেমন পার্টির কাজ আমি নিই না।'

'তুমি তাদের দেখলেই বুঝতে পারো?'

'পারব না? দেখলেই বোঝা যায় কে সৎ, আর কে অসৎ।'

'আহা। তুমি একেবারে ভগবান। কার ভেতরে কী আছে তুমি অমনি দেখেই বুঝে ফেলতে পারো! এই আমার মধ্যে কী আছে তুমি জানো?'

'ওরে বাবা। জানি না আবার? সেখানে একটি দুষ্টু বুদ্ধির চাষ চলছে সর্বদা।'

'ওঃ। তবু আমায় নিয়ে সংসার করছ? তাড়িয়ে দিচ্ছ না?'

প্রভাংশু হা হা করে হেসে উঠে বলেন 'তোকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে কোন সংসারে থাকব রাস্তায়?

'কেন? আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই?'

'কই আর? দেখা।'

'কেন তোমার আরও সব কত ভাগনে আছে?'

'তারা তো 'অকাল কুষ্মাণ্ড'। 'মামা' বলে সাত জন্মে খোঁজ নেয়?'

পলুর গায়ে শুধু একটা হাতকাটা গেঞ্জি। আর পরনের পায়জামাটা হাঁটু পর্যন্ত গুটানো। হঠাৎ উঠে গিয়ে একখানা তোয়ালে সপসপে করে ভিজিয়ে নিয়ে এসে পা দুটোকে ভেজাতে থাকে। অথবা মুছতে থাকে।

প্রভাংশু আড়চোকে তাকিয়ে বলেন, 'ওটা কী হচ্ছে?'

'কী আর? পায়ের চামড়াটা পুড়ে যাচ্ছিল, একটু ঠান্ডা করছি।'

'আচ্ছা তোর এত গরম কেন রে পলু? কই আমার তো—'

'তোমার? তোমার বয়েস হয়ে রক্ত 'কুল' হয়ে গেছে মামা।'

প্রভাংশু আবার হো হো করে হেসে ওঠেন।

এই সময় সহসা কানাইবাবুর আবির্ভাব। তার গায়ে একখানা ভিজে গামছা জড়ানো। পরনের লুঙিটা হাঁটু পর্যন্ত গুটানো।

ঢুকে এসেই বলে ওঠেন, 'ওঃ! মামাভাগনের নিদ্রে ভঙ্গ হল? তো এতো তাতা-পোড়ায় এতো হাসি কিসের?'

পলু বলে ওঠে, 'কেন? আমরা কি 'রামগরুড়ের ছানা' হাসতে মোদের মানা'?'

'আঃ। কী 'ছানা-মানা' কইছেন' 'ছানা আজ আর কাটাইনি। সব দুধটাকে দৈ পেতে ঘোল বানিয়ে 'ফিজিডেয়ারে' ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছি। খাবেন তো খান এক গেলাস করে।'

'অ্যাঁ! ঘোলের শরবত? কী স্বর্গীয় কথা শোনালি বাপ।'

প্রভাংশু বলে ওঠেন, 'কই আন আন।'

কানাই এগিয়ে গিয়ে রেফ্রিজারেটারটা খুলে, সাবধানে বড়ো দু-গেলাস ঘোলের শরবত নিয়ে এসে দুজনের সামনে ধরে।

দু'জেনই প্রায় এক চুমুকে শেষ করে ফেলে খালি গেলাস দুটো কানাইয়ের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'মাত্তর এই দু-গেলাসই করেছিলে?'

'কেন? আরো খাবে?'

'না, না, আমরা নয়। মানে তুমি এত কষ্ট করে বানিয়ে রেখেছিলে, তুমিও তো একটু খেতে পারো।'

'আমি? কানাই মণ্ডল? ফিজে রাখা ঠাণ্ডা ঘোলের শরবত খাবে? হায়! হায়! আপনাদের মাথার চিকিচ্ছে করান তো।'

পলু অপ্রতিভভাবে বলে, 'কেন? তোমার খেতে নেই?'

'আছে। সে অন্য 'ঘোল'। গেরামের বাড়িতে কাকার কাছে খেয়েছি বিস্তর। সেই খাওয়ার তাড়নায় সো-জা পিঠটান দিয়ে এই কলকেতায়।'

'কাকা? তোমার কাকা ছিল বুঝি?'

'ছিল কেন? এখনও আছে গেরামের বাড়ি আলো করে। মাস মাস মনি-অর্ডারে ট্যাকা পাঠাচ্ছি তেনার নামে।'

'অ্যাঁ! বললে যে কাকা পাজি!'

'আহা, তা কী আর অস্বীকার করছি। তবে হাজার হোক কাকা তো। আপনজন। আপনজন। যাক, ছাড়ান দ্যান ও-কথা। বলি এর পর কি চা হবে এক রাউন্ড?'

'ও বাবা। কানাইদার মুখে আবার ইংরিজি বুলি। তো মামার কি আর চা না হলে চলবে?'

'তোরই চলবে?'

প্রভাংশু বলে ওঠেন, 'গরম নিবারণের ওষুধই হচ্ছে গরম চা, বুঝলি? মনে নেই, পড়িসনি ছেলেবেলায়, 'এ কী গ্রীষ্ম ভাই, প্রাণ আইঢাই, কোথায় জুড়াই ভেবে না পাই। পিপাসা সদাই, শুধু জল খাই। তবু ঘাম ঝরে, নিস্তার নাই।' চা খেলে আর এটি হতো না। পিপাসা মিটে যেত, ঘাম ঝরা বন্ধ হয়ে যেত।'

কথা শেষ হয়েছে কি না হয়েছে, হঠাৎ ডোরবেলাটা বেজে উঠল।

'ওই কে এল জ্বালাতে,' বলে কানাই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আর মামা-ভাগনে দু-জনে চট করে পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ে একটু ভদ্রস্থ সাজ করে নিতে!

এখান থেকেই শুনতে পান প্রভাংশু, কানাইয়ের শানানো গলার স্বর, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আছেন বই কী। এই গ্রীষ্মেম কোথায় আর যাবেন? দার্জিলিং পাহাড়ে? নাঃ! সেখানে যান নাই। এই এখানেই আছেন। ডেকে দিচ্ছি—'

ততক্ষণে প্রভাংশুও প্রায় সভ্যভব্য সাজে পর্দার ওপিঠ থেকে বেরিয়ে এসে সোফায় বসেছেন।

দেখলেন এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকছেন। পিছন পিছন কানাই।

ভদ্রলোক সাবধানে বলেন, 'আপনিই শখের গোয়েন্দা প্রভাংশু গুহ?'

প্রভাংশু মাথাটা হেলান। তারপর বলেন, 'কিন্তু আপনি।'

'আমি? বলছি ধীরেসুস্থে। একটু... ইয়ে এক গেলাম ঠান্ডা জল যদি—'

সঙ্গে সঙ্গে কানাই ফ্রিজ থেকে আর এক গেলাস ঘোলের শরবত এনে ভদ্রলোকের সামনে ধরে।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বলেন, 'জল চাইতে শরবত। আমি আসব জানতেন নাকি?'

কানাই গম্ভীরভাবে বলে, 'জানতুম বৈকি। হাত গুনতে জানি যে। আপনি নির্ঘাত একখানা কেস নিয়ে এসেছেন! খুনের কিংবা চুরির।'

ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেন, 'এ কী! এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!'

ভদ্রলোক এখন প্রভাংশুর দিকে তাকান। দেখেন অতি সৌম্য চেহারা। হাতে একটি জ্বলন্ত মোটা বর্মা চুরুট।

এটি পলুর 'স্যাজেস্‌শান'। তার মতে—শখের গোয়েন্দাদের হাতে সর্বদা একটা জ্বলন্ত বর্মা চরুট থাকাই নিয়ম। জ্বলবে কিন্তু টানবে না। খদ্দের এসে দেখলেই বুঝতে পারবে, ইনিই হচ্ছেন গোয়েন্দাপ্রবর।

তা পলুর নির্দেশ সবসময় অক্ষরে অক্ষরে মানেন প্রভাংশু।

এখন প্রভাংশু আগন্তুকেরদিকে তাকান।

ভদ্রলোকের চেহারা পাকশিটে, রং কালো। বয়েস আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন। বেশিও হতে পারে। বেশ ঢ্যাংঙা চেহারা। পরনে একটা একটু খাটো ঝুল মোটা ধুতি, আর গায়ে লম্বা ঝুল লংক্লথের পাঞ্জাবি! গলায় একটা পাক দিয়ে কোঁচানো উড়ুনি ঝোলানো। অনেকটা ডাক্তারদের গলায় ঝোলানো 'স্টেথিসকোপ' ঝোলানোর ভঙ্গিতে। মুখটি কাঁচুমাচু।

বললেন, 'আমি কিন্তু সত্যিই একটা ইয়ে, খুনের কেস-এর তদারকির জন্যে আপনার কাছে—'

'বুঝেছি, বুঝেছি। বলুন। ওই সকালে কাগজে যে এক ব্যবসায়ীর খুনের খবরটা বেরিয়েছিল?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে একটি গৃহবধূ হত্যা? স্বামী ও শাশুড়ি ফেরার?'

'না না। ইনি বধূ-টধু নন। স্বামী কী শাশুড়ি কেউই নেই। বয়স্কা মহিলা, বিধবা। হাঁপানি রুগি। নিজের ঘরে রাতে শুয়েছিলেন, রাতারাতি কে বা কারা গলা টিপে খুন করে রেখে গেছে।'

'ঠিক আছে। বলে যান।'

প্রভাংশু পলুর দিকে তাকান। দেখেন সে যথারীতি পকেট থেকে নোটবুক বার করে বিবরণ নোট করে চলেছে।

অতঃপর সব নোট নেওয়া হয়। ভদ্রলোক হাতজোড় করে বলেন, 'তাহলে আপনি এই কেসটা হাতে নিচ্ছেন তো?'

'ধরে নিন নিচ্ছি।'

'ধরে নেওয়া-নিয়ি নয়, নিশ্চয়ই নিচ্ছেন। তাহলে বড়দাবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসছি খানিক পরে।'

'বড়দাবাবু কে?'

'ওই যে বললাম পরলোকগত কর্তাবাবুর ভাইপো, অলক ব্যানার্জি! কোন একটা কলেজের মাস্টারমশাই। লিখে নেননি এসব খোকাবাবু?'

'খোকাবাবু' অর্থে পলু। 'খোকাবাবু' শুনে সে মুখটা একবার কোঁচকায়, তারপর মাথা হেলিয়ে জানায়, হ্যাঁ, লিখে নিয়েছে।

প্রভাংশু বলেন, 'বেশ নিয়ে আসুন তাঁকে। কিন্তু আপনি ওঁদের কে? আপনার নামটিও তো জানা হয়নি।'

আগন্তুক ভদ্রলোক বিনয়ের অবতারের মতো আভূমি নত হয়ে হাত কচলে বলেন, 'আজ্ঞে আমি কেউ না। বলতে গেলে রাজার সরকার। কর্তাবাবু ভালোবেসে 'ম্যানেজারবাবু' বলতেন, গিন্নিমাও তাই বলেছেন। এখন তো বলাবলির বাইরেই চলে গেলেন। এ অদমের নাম 'রামতারণ তরফদার'।'

পলু ফট করে বলে ওঠে, 'রাম' তারণ তরফদার। তো কাকে তারণ করতে চান? নিহতের দিকের নাম আসামি পক্ষের?'

'আসামি পক্ষের? ছি ছি, কী বলছেন। আমায় দেখে কি তেমন মনে হচ্ছে? অবশ্যই নিহত মহিলার পক্ষ থেকে। তবে আসমি যে কে তা সত্যি বোঝা যাচ্ছে না। নিরীহ একটা মেয়েকে পুলিশে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে ভরে দিল বটে, তবে মেয়েটাকে দেখলে কিছুতেই সন্দেহ করতে পারা যায় না সে এমন ভয়ংকর একটা কাজ করতে পারে। নিপাট ভালোমানুষ একটা

আয়া মাত্তর। সে কেন কর্তামাকে গলা টিপে খুন করতে যাবে! এতে তার স্বার্থ কী? সে তাঁর কাছে আয়াগিরি করছে, চারবেলা চর্বচোষ্য খাবার পাচ্ছে, আরামের বিছানায় ঘুমোচ্ছে, দৈনিক মোটা অঙ্কের একটা টাকা পাচ্ছে, সে কি নিজের হাতে নিজের সুখের গাছটাকে কুপিয়ে কাটবে?'

প্রভাংশু বলেন, 'আয়া? তা মহিলা তো বলছেন তেমন কিছু পঙ্গু ছিলেন না। তবে আয়া কী জন্যে?'

'আহা, পঙ্গু ছিলেন না ঠিকই। তবে, হাঁপানি আর্থরাইটিস ইত্যাদি নিয়ে শারীরিক অপটু তো ছিলেনই একটু! সর্বদা তো ওঠাউঠি করতে পারতেন না। কাজেই খিদমদগার গোছের একটা মেয়ে হাতের কাছে দরকার হতো। আসলে বাড়িতে লোক তো তেমন বেশি কেউ নেই। কাজের লোকের মধ্যে এক বুড়ি বাসনমাজুনি ঘরমুছুনি আর একটা বুড়ি রান্নাঘরের ফরমাশের জন্যে। তাদের নিজেদেরই নড়তে-চড়তে সাত বছর।'

'রান্নাঘরের ফরমাশ খাটুনি। ও বাবা! বাড়িতে কি এত লোক যে এত বড়ো ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, বাড়ির লোকসংখ্যা তেমন না হলেও ওই কাজ-কামের লোকরাই অনেক।'

'তাহলে রান্নার জন্যেও আলাদা লোক আছে?'

'তা তো আছেই। বাবুর আমল থেকেই আছে জগবন্ধু পাণ্ডা। উড়িয়্যার লোক। সে তো মাইজির এই দুর্ঘটনায় মাথা চাপড়াচ্ছে। ইচ্ছে করলে বাংলা বলতেও পারে, তবে বলবে না। মাতৃভাষাতেই অনড় থাকবে। আচার-আচরণেও। বটুয়ার মধ্যে পান রেখে সেজে সেজে খাবে, গুণ্ডি খাবে! মাথাটা চকচকে করে কামিয়ে লম্বা একটা টিকি রেখে তার আগায় একটা গিঁট বেঁধে ঝুলিয়ে রাখবে। খেঁটে ধুতি পরবে হাঁটু বার করে, তবু মরে গেলেও বড় ধুতি পরবে না। গায়ে জামা দেবে না। শীতে ভুষো কম্বল একখানা গায়ে জড়িয়ে থাকবে, আর গরমকালে স্রেফ গামছা গায়ে জড়িয়ে ঘুরবে।'

'বাঃ। আদর্শ পুরুষ!' প্রভাংশু বলে ওঠেন, 'আমাদের বাঙালিদের মতো অনুকরণপ্রিয় নয়।'

পলু বলে ওঠে, 'কেন হবে? বাঙালি যে হ্যাংলা-ক্যাংলা জাত। যা দেখে তাতেই মজে। তাই জন্যেই তো 'বাঙালি' শব্দটার সঙ্গে 'কাঙালি' শব্দটার এমন মিল। আর কোন প্রদেশে এমন দেখবে?'

'তোর বাকচাতুরি রাখ তো পলু,' প্রভাংশু বলেন, 'ভদ্রলোককে সব কথা

বলতে দে। সময় নষ্ট করিয়ে দিস না। হ্যাঁ, তাহলে আপনি বলছেন, মৃতা মহিলার ঘরে একজন আয়া ছিল। আর ঘর ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখা ছিল। কেমন? সেই আয়াই করেছিল অবশ্য, কারণ তার মনিবানী তো আর উঠে দরজা বন্ধ করতে পারতেন না। আপনি বলছেন সেই আয়া মালতী মণ্ডল নাকি সারারাত ঘুমিয়ে সকালবেলা জেগে উঠে দেখে কর্তামা—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু সারারাত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার জন্যে মাইনেপত্র দিয়ে রাখা হয়েছে নাকি তাকে?'

'সে তো নিশ্চয়ই নয়। তবে কর্তামার তো তেমন কিছু দরকার থাকে না। রাত্রে যেটুকু যা খাবার, খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, গভীর ঘুমোন। বড়োজোর এক দু-বার জাগেন। হয়তো জলতেষ্টা পেলে কী বাথরুমে যাবার দরকার হলে। তো তাঁর হাতের কাছেই টেবিলে একটা 'ঘন্টি' রাখা থাকে, তিনি হাত বাড়িয়ে সেটায় একটু চাপ দেন। সেটা কোঁক কোঁ করে বেজে ওঠে। ব্যস, মালতীও ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে কর্তামার কাছে ছুটে আসে। তো সেদিন আর ঘন্টিটা বাজেনি, কাজেই তারও ঘুমটা ভাঙেনি। সকালবেলা চোখে দিনের আলো ঠেকতেই ঘুম ভেঙে গিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে কর্তামার দিকে তাকানো মাত্রই আঁতকে উঠে আঁ আঁ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল।'

'কেন? আঁৎকে ওঠার কারণ?'

'কারণ ভয়াবহ।

কর্তামার নিয়ম তিনি শীত-গ্রীষ্ম যাই হোক, গায়ে একখানা সাদা চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমোন। সারা গায়ে নয়, হয়তো বুক পর্যন্ত। শীতকালে অবশ্য তার ওপর লেপ কম্বল ঢাকেন। তো এখন তো শীত নয়, শুধু ওই সাদা চাদরখানাই ছিল শোবার সময় বুক অবধি ঢাকা। মালতী জেগে উঠে দেখল চাদরখানা মুখ-মাথা পর্যন্ত টেনে ঢাকা দেওয়া। দেখেই মনে হচ্ছে নিজে টানা নয়, কেউ টেনে ঢাকা দিয়ে গেছে। হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে রোগী মারা যাওয়া মাত্রই যে ভাবে মুখের ওপর পর্যন্ত সাদা চাদর ঢেকে দেয়।

কাজেই মালতী ওই সাদা চাদর ঢাকা দেখেই কেমন গা ছমছমে ভাবে ভয় খেয়ে আঁতকে উঠে আঁ আঁ করে উঠেছিল!

ওই বাড়ির বৃহৎ দোতলাটায় তো কেবলমাত্র কর্তামাই থাকতেন, অর্থাৎ কর্তাবাবু মারা যাওয়া ইস্তক। তিনি গত হয়ে পর্যন্ত কর্তামার ঘরে ওই আয়া মালতী।

সিঁড়ির সামনের কোলাপসিবল দরজাটায় তালাচাবি লাগিয়ে রাখে। একটা ভালো ব্যবস্থা আছে!... মালতী যেমন ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দিয়ে চাবিটা গিন্নিমার কাছে দিয়ে শুয়ে পড়ে, ওদিকেও তেমনি বামুনঠাকুর বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চাবিটা বড়দাবাবুর কাছে দিয়ে শুয়ে পড়ে।'

'কারণ?'

'কারণ নিরাপত্তা'।

আয়া যাতে নিজের ইচ্ছেয় রাতারাতি চুরিচামারি করে পালাতে না পারে, আবার নীচের তলা থেকেও কোনো বাজে লোক বা বাইরের চোরছ্যাঁচোড় ফট করে দোতলায় ঢুকে আসতে না পারে।...

তো বামুনঠাকুর তার আগেই জেগে উঠেছিলো দাদাবাবুকে 'বেডটি' দেবার জন্যে। ওই আঁ আঁ শুনেই চাবিটা নিয়ে ছুটে ওপরে উঠে এসেছিল। কিন্তু এসে কোলাপসিবলে ধাক্কাধাক্কি, 'এই আয়া দিদিমণি, গেটটা খুলে দেও।'

কিন্তু আয়া দিদিমণি সেটা পারবে কী করে? চাবিটা যে কর্তামার বালিশের তলায় রাখা আছে। তাই থাকে!

সে তাই ওই কোলাপসিবলের সামনে দাঁড়িয়ে—হাঁকপাক করতে থাকে, 'আমি পারব না বাবা!'

'পারবে না মানে?'

'পারবো না মানে পারব না।' তখন কর্তামার গায়ে হাত দিতে যাবে এমন সাধ্যি নেই তার।

অগত্যা বড়দাবাবু উঠে এলেন। এবং বাড়ির অন্যান্য মেম্বাররাও। অর্থাৎ যতো সব কাজকরুণীরা।

মালতী কোনোমতে অবস্থাটা বোঝাতে চেষ্টা করলো তাদের। শুনে-টুনে বড়দাবাবু তাঁর কাছে রাখা তালার ডুপ্লিকেট চাবিটা খুঁজে-পেতে নিয়ে এসে, কোলাপসিবলের ফাঁক দিয়ে মালতীর হাতে ধরিয়ে দিলেন। তবে কাঁপাকাঁপা হাতে মালতী সেটা খুলে ফেলল।

অতঃপর সবাই গেট ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ভিতরে ঢুকে এল। এসে?

এসে হতভম্ব, হাঁ!

কর্তামা নিথর নিস্পন্দ।

আপাদমস্তক সাদা চাদর ঢাকা।

বুকের কাছটাও ওঠাপড়া হচ্ছে না!

বড়দাবাবুই সবচেয়ে নিকটজন এবং বলতে গেলে বাড়ির মালিকই। তাই

তাঁর সাহস বেশি। কাজেই তিনি চাদরখানা মুখ থেকে সরালেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও আঁতকে উঠলেন!

দেখলেন তাঁর কাকিমার ফর্সা ধপধপে মুখখানা কালিমারা, যেন কেউ ভুসো মাখিয়ে দিয়েছে। কাকিমার মাথাটা বালিশের ওপরই আছে বটে, তবে ঈষৎ কাত হয়ে যেন লটকে পড়েছে। আর ঠোঁটের কোনটায় কষ বেয়ে একটি কালচে রক্তের রেখা জমাট হয়ে শুকিয়ে রয়েছে।... চোখদুটো বিস্ফারিত।

এই দৃশ্য! যত শক্ত ছেলেই হোক, আঁতকে উঠবে না?

তবু ভাগ্যিস ছোড়দাবাবু উপস্থিত নেই! থাকলে কি রক্ষে থাকত? নির্ঘাত বুক চাপড়ে মাথা খুঁড়ে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে তুলে 'ওগো পিসির এমন অবস্থা কে করল গো—' বলে পাড়ার লোকদের জড়ো করে ছাড়ত। তো তিনি উপস্থিত নেই। দু'দিন হল মালদায় গেছেন, মামার বাড়ি রুগন্ বুড়ো মামাটাকে একবার দেখে আসতে।

কাজেই পাড়ার লোক জড়ো হয়ে হাঙ্গামা আরো বাড়াল না। বড়দাবাবু নিঃশব্দে টেলিফোনে ডাক্তারবাবুকে ডাকলেন, পুলিশকে খবর দিলেন।

বাড়ির চিরকেলে চেনা ডাক্তারবাবু! শোনামাত্রই ছুটে এলেন। এবং এসেই নিহতের কবজিটা তুলে ধরে নাড়িটা একবার দেখে নিয়েই ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'দেখার কিছু নেই। হয়ে গেছেন।'

তবু আবার সেই বিস্ফারিত চোখ দুটোর নীচেটা টেনে টেনে দেখে বললেন, 'রক্ত জমে রয়েছে, গলা টিপে হত্যা।'

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে গলা টিপে হত্যা। কতক্ষণ আগে? তা অন্তত সাত-আট ঘণ্টা আগে। অর্থাৎ রাত বারোটা নাগাদ। ডাক্তারি চোখের হিসেবে তাই বলছে।

আর পুলিশ এসেই মৃতার ঘাড়টায় হ্যাঁচকা একটা টান মেরে বলে উঠলো, 'এই তো গলায় গলাটেপার দাগ! ভারী থাবায় কেউ দু-হাতে টিপে ধরে ফিনিশ করে দিয়েছে!'

তবু?

তবুও মালতীকে তাঁরা ছাড়বেন নাকি? হলেও তার আঙুলগুলো সরু সরু কাঠির মতো! দরজা বন্ধ ঘরের মধ্যে সে একা, কর্তামার বিছানার থেকে হাত তিন-চার তফাতে শুয়ে। সে রইল ঘুমিয়ে! তাকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে হাজতে ভরে ফেলা হবে না? আর জেরায় জেরায় জেরবার করা হবে না?

হাজতে ভরবেন না তো কি সন্দেশ খাওয়াবে তাকে পুলিশ?

যদিও মালতীর যুক্তি, জীবনে এত সুখ তার ঘটেছে কখনও? তাহলে? ওনাকে মেরে মালতীর কী ইষ্টসিদ্ধি হবে?

যুক্তিটা অকাট্য।

তবু ব্যাপারটা যে অবোধ্য! বাইরের থেকে লোক আসার যখন কোনো পথ নেই, তাহলে গলাটা টিপে ধরে মহিলাকে খুন করে গেল কে? ভুতে? একমাত্র ভূত ছাড়া কে অদৃশ্য পথে ঘরে আসা-যাওয়া করতে পারে? অদৃশ্য হাতে গলাটা টিপে ধরতে পারে ?

তাহলে ভূতই মানতে হয়। কিন্তু পুলিশ তো আর তা মানতে রাজি নয়। কাজেই মানুষটাকে ধরেই উৎপীড়ন!...

মালতীর কান্নাকাটি পুলিশ অফিসারকে নরম করতে পারে না।

ক্রমাগত প্রশ্ন, 'তুই মারলি না তো মারল কে?'

'মেরে আমার লাভটা কী হল?'

'নিশ্চয় মনিবানীর টাকাপয়সা সোনাদানা বেশ কিছু হাতিয়েছিস?'

'হাতিয়ে রাখলাম কোথায়? এইখানেই তো পড়ে রয়েছি?'

সবই সত্যি। তবু জলজ্যান্ত আসামিটাকে হাতকড়া না পরিয়ে, হাজতে না ভরে থাকা যায়?..

অতঃপর অবশ্য পুলিশের কুকুরও এসেছিল। গিন্নির বিছানা থেকে সারা ঘর শোঁকাশুঁকি করে একবার বাথরুমটার মধ্যে পদার্পণ করে শেষ পর্যন্ত ফেলিওর হয়ে নিজের মনিবের জুতোর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল।

আর কী করবে পুলিশ বাহাদুর? খুন হওয়া মহিলার লাশটা উঠিয়ে নিয়ে গেলেন মর্গে পাঠাবার জন্যে, আর দরজাটাকে 'সিল' করে রেখে গেলেন, যাতে আর কেউ না ঢুকতে পারে। এরপর আসবেন কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশারদ। তিনি তদন্ত করে দেখবেন কে বা কারা এই নারকীয় কাণ্ড করে গেছে!'

'তা তো বুঝলাম সবই', প্রভাংশু বললেন, 'কিন্তু আমার সন্ধানটা দিল কে?'

'বড়দাবাবুর একজনা বন্ধু। তিনি আপনার নামঠিকানা জানেন।'

'তাই নাকি? তা তাঁর নামটা কী?'

'তা জানি না! বড়দাবাবু এলেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হবে। অনুমতি করেন তো এখনই আনি।'

তা অনুমতি করলেন প্রভাংশু। ক্রমেই তো বেলা পড়ে আসছে, রাত

হয়ে গেলে অসুবিধে। 'কিন্তু পুলিশ থেকে যে দরজা সিল করে গেছে? দেখবটা কোথায়?'

'সে সবই বড়দাবাবু বলবেন।'

পলু গলার স্বর নামিয়ে বলে, 'আচ্ছা এক বড়দাবাবু পেয়েছে!'

প্রভাংশু হঠাৎ বলে ওঠেন, 'আচ্ছা কোন থানার খবর দেওয়া হয়েছিল?'

'আজ্ঞে আমাদের এই কড়েয়ার থানাতেই।'

'তাই বুঝি? তো এখন সেখানে ইনচার্জ কে?'

'আজ্ঞে নাম তো শুনলাম।

গোবিন্দগোপাল গাঙ্গুলি? থ্যাঙ্ক গড। সে আমার বিশেষ বন্ধু। একদার সহপাঠী। নো প্রবলেম। নিয়ে আসুন আপনার বড়দাবাবুকে।'

সরকারমশাই বিদায় নিতেই প্রভাংশু টেলিফোন রিসিভারটা হাতে তুলে দিয়ে একটি পরিচিত নম্বরে ডায়াল করেন।

'হ্যাল্লো! কড়েয়া থানা? ও. সি. আছেন? মিস্টার গাঙ্গুলি?'

'আমিই মিস্টার গাঙ্গুলি বলছি—'

'ওহো-হো! গলাটা কী রকম বদলে ফেলেছিস রে গোবিন্দ? উঁচু পোস্টে উঠলেই বুঝি গলার স্বরও এরকম উঁচুতে ওঠে?'

'ওঃ। বটে? তো তুইও তাহলে এখন খুব উঁচু পোস্টে উঠে পড়েছিস পেভা? তাই তোর গলার স্বরও—'

'ধ্যাত। আমার কিস্যু বদলায়নি। যাক চিনতে পেরেছিস তাহলে? বাঁচা গেল। একটু 'কারে' পড়ে তোর শরণাপন্ন হচ্ছি রে ভাই।'

'সে তো বুঝতেই পাচ্ছি। 'কারে' না পড়লে কে আর কবে আমাকে স্মরণ করে বাড়িতে ডেকে সন্দেশ খাওয়াতে? নেভার। যাক, 'কার'টা কী? বলে নে চটপট। এখুনি বেরোতে হবে।'

'চটপটই বলছি। জানি তো তোদের সবসময়ই ঘোড়ায় জিন পরানো থাকে! তা খুব অসময়ে ডিসটার্ব করলাম!'

'নাঃ, খুব অসময় নয়। বলতে পারা যায় বরং—কিঞ্চিৎ সুসময়। এই কিছুক্ষণ আগে ধড়াচুড়ো ছেড়ে, স্নান-টান সেরে ফ্রেশ হয়ে চা পান করে, লুঙ্গি গেঞ্জি গায়ে চড়িয়ে আরাম চেয়ারে থানায় বসে একটা সিগার ধরিয়েছি।'

'আহা-হা, তা হলেও ডিসটার্ব করলাম। তো ঘরে আর কেউ নেই তো?'

'এ সময়? এই অবস্থায়?'

'আহা-হা, বাইরের লোক না হোক, তোর পা-টিপুনি দলাইমলাই করনেওয়ালারা?'

'নাঃ। কেউ নেই। আজকাল ব্যাটারা মহাপাজি হয়েছে। সহজে কাছ ঘেঁষতে চায় না। ডাক দিলেই 'ডিউটি' দেখায়। যাক, কী বলবি বল। নির্ভয়েই বল।'

'বলছি তাহলে! গতকাল মালতী মণ্ডল নামের একটা মেয়েকে হাতকড়া লাগিয়ে— খাঁচায় এনে ভরেছিস?'

'মা-লতী মণ্ডল! হ্যাঁ হ্যাঁ, এনেছি তো? তোর চেনা নাকি : একটা ইয়ের কেসে—'

'চেনা নয়। তবে 'শোনা'। একটা খুনের কেসে তো? তো কেসটা হঠাৎ আমার হাতে এসে পড়েছে। তাই মেয়েটাকে একটু জেরা করতে চাই। তুই যদি অনুমতি করিস—'

'মারব এক থাপ্পড়। তোর সঙ্গে আমার এইসব ফর্ম্যালিটির সম্পর্ক? যখন ইচ্ছে চলে আয়। তবে আমার মনে হয়েছে মেয়েটা বোধহয় তেমন নয়। ইনোসেন্ট টাইপ।'

'ওঃ, মনে হচ্ছে? ওরে ভাই, তুই পুলিশের লোক হয়ে এই কথা বলছিস? আমি এই চুনোপুঁটি শেখর গোয়েন্দা প্রভাংশু গুহই কত ইনোসেন্ট দেখলাম। মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়ো। কথা শুনে মনে হয় ভাজা মাছখানি উলটে খেতে জানে না। আর? জেরার চোটে জেরবার করতে পারলেই ঝুলির মধ্যে থেকে জ্যান্ত মাছ বেরিয়ে পড়ে লাফায়।'

'ঠিক আছে। এখুনি চলে আয়। কর মেয়েটাকে জেরায় জেরবার। তোর যখন এত আত্মবিশ্বাস।'

'আহা-হা, একেবারে এখুনি নয়। এখন অন্তত আধঘণ্টাটাক তুই আরাম চেয়ারে ঠ্যাং তুলে দিয়ে মৌজ করে চুরুট ধ্বংসা। আমি একটু প্রস্তুত হয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আরে আমার আবার মৌজ! জগতের ওঁচা জাত হচ্ছে এই থানার ও সি গুলো। এক্ষুনি ধড়াচুড়ো পরে ছুটতে হবে ট্যাংরায়। যাক তুই চলে আয়, তোর সঙ্গে একটা কনস্টেবল থাকবে জেরার সময়।'

'মেয়েটা খাঁচার মধ্যে থেকেই কথা বলবে তো?'

'তাতে অসুবিধে আছে?'

'না না, অসুবিধে আর কী?'

'ইচ্ছে হলে খাঁচা থেকে বার করে সামনের প্যাসেজে-পাতা-বেঞ্চটায় বসাতে পারিস। তাতে যদি তোর নোট নেবার সুবিধে হয়।'

'নোট নেবার দরকার নেই। সঙ্গে টেপ্-রেকর্ডার আছে।'

'ওঃ! তবে তো উত্তম। তবু যাই বলিস, আমি মেয়েটার মধ্যে খুনের 'মোটিভ'টা তো খুঁজে পাচ্ছি না। তোর শার্প চোখে যদি দেখতে পাস তো দ্যাখ। আচ্ছা, ও. কে!'

অতঃপর।

অতপর প্রভাংশু গুহ তাঁর নিজ নিকেতনে।

ভাগনে পুলকে তার টেপরেকর্ডারটি ফেরত দিয়ে আরামে চোখ বুজে নিজস্ব 'সোফা-কাম বেডে' শুয়ে শুনে যাচ্ছেন টেপ-রেকর্ডারে তোলা কথোপকথন। একটা স্বর তাঁর নিজেরই, অপরটা সেই খাঁচায় বন্দিনী মালতী মণ্ডলের। প্রশ্ন এবং উত্তর।

প্রশ্ন : 'আচ্ছা এই খুন সম্পর্কে তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?'

উত্তর : (ভীতভাবে) 'আ—আমার, কেন কাকে? আ—আমি দাসদাসী দরের মানুষ—'

'আহা, তাতে কী? এখানে তো তোমার মনিবদের কেউ উপস্থিত নেই। এমনি যদি কারুকে সন্দেহ হয়ে থাকে, আমার কাছে নির্ভয়ে বলতে পারো। বললাম তো আমি পুলিশের লোক নই। প্রাইভেট ডিকেটটিভ! এক ব্যাটা কনস্টেবল আছে বটে সঙ্গে তো সে বাংলা বোঝে না।'

'আমার—আমার যাঁকে একটু একটু সন্দেহ হয়, তিনি তো খুনের আগেই তিন-চার দিন ধরে দেশছাড়া। মালদায় মামার বাড়ি গিয়ে বসে আছেন।'

'কে তিনি? তোমাদের সেই ছোড়দাবাবু নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনেছি গিন্নিমার নিজের ভাইপো। ভাইপো হলে কী হবে, গিন্নিমা তেনাকে যমের মতো ভয় করতেন।'

'সে কী? কেন?'

'কেন আর? ভাইপোর স্বভাবগুণে। যখনই পিসির কাছে আসত, রক্তচক্ষু, আঙুল তুলে শাসানি আর টাকা দেহি দেহি।... কেলাবের চাঁদা বাকি পড়ে আছে, টাকা দাও। বন্ধুদের সঙ্গে ফিস্টি করব, টাকা দাও। বন্ধুদের সঙ্গে রেস্টুরেণ্ট খাব, টাকা দাও। বন্ধুদের সঙ্গে দিঘায় না কোথায় যেন বেড়াতে যাবো, টাকা দাও। বন্ধুরা পুরী যাচ্ছে, আমায় যেতে ধরেছে, টাকা দাও। গিন্নিমা যদি বলেছেন, 'হ্যাঁর এত টাকা আমি কোথায় পাব? আমার কাছে কি টাকার থলি ভর্তি আছে!' তো চক্ষু লাল করে বলত, 'তুমি চেক কেটে দিলে আমি তুলে আনতে পারি।'

'বলত এই কথা!'

'বলতই তো। গিন্নিমা বলতেন, 'ব্যাঙ্কের পাসবই নয় আমার কাছে, চেকখাতাও আমার কাছে। কিন্তু সরকারমশাই যখন শুধোবেন কর্তামা এত টাকা আপনি তুলবেন কোন দরকারে? তখন কী জবাব দেব?' তো জোড়দাবাবু অগ্যেরাঝ্যি করে বলত, 'ও সরকারমশাইয়ের কাছে জবাবদিহির ভয়? তুমি মনিব না তিনি মনিব?... থোড়াই কেয়ার করো না তাকে।' আর তাতেও যদি গিন্নিমা দোনামোনা করত, 'এত টাকা বেঙ্কে আছে কী না তাই জানি না।' তো শাসাতো, 'ওঃ, নাই? পিসে ঢের টাকা রেখে গেছে, জানি না আমি? বেশ, না দাও তো, এই চললুম।' সর্বদা ওই হুমকি, 'টাকা না দাও তো চললুম'।'

'তা চলে গেলেই-বা তোমাদের লোকসানটা কী হত? ওই তো গুণের ভাইপো? এত কী মায়া?'

'মায়া না ছাই! শুদু ভয়। চলে গেলে পাছে বাপের বাড়ির আত্মসমাজের কাছে নিন্দেহ হয়। যদি তারা বলে, 'আহা, মা-বাপ মরা একটা মাত্তর ভাইপো। বড়োমানুষ পিসি তাকে একটু পুষতে পারল না?' সেই ভয়েই কাঁটা!'

'তা তুমি এত সব জানলে কী করে? তোমার সামনেই সব বলতো?'

'ও বাবা! আমার সামনে? তেনার সামনে আমি সাদা পক্ষে বেরোতুম নাকি? তিনি আসতেছেন টের পেলেই আমি ওই বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিতুম। তো আসার সাড়া আগে থেকেই বোঝা যেত। সিঁড়িতে উঠত দুম ধুম পা ফেলে।'

'বাথরুমের মধ্যে ঢুকে পড়তে? তা হলে কী করে দেখতে রক্তচক্ষে তাকাচ্ছে, আঙুল তুলে শাসাচ্ছে? কী বলছে?'

'সে তো সব ওই বাথরুমের দরজার ফুটো দিয়ে দেখে।'

'ফুটো দিয়ে? ফুটোটা কী?'

'ওই যে আই-হোল না কী একখানা আছে দরজার কপাটে। শুনি নাকি কর্তাবাবুর আমল থেকেই আছে ওটা। তিনির নাকি চানের ঘরে অনেক দেরি হতো, তখন গিন্নিমা তো একটু ভালো ছিল। তিনি রান্নাঘরে, ভাঁড়ারঘরে ঘোরাঘুরি করতেন, ঘরখানা আদুড় থাকত। আর সেইসময়ই কাজের লোকেরা আসত ঘর সাফ করতে। বিছানা ঝাড়তে। আর বালিশের তলাতেই সব্বস্যর চাবির গোছা।'

'বালিশের তলায়? সর্বস্বর চাবির গোছা?'

'তা কী করবেন? সর্বোদা তা নাকি নিজের শরীরের সঙ্গেই রাখতেন,

কিন্তুক চানের সময় তো আর শরীরের সঙ্গে রাখতে পারেন না পৈতেয় বেঁধে? তাই ওই ফুটোয় চোখ রেখে দিষ্টি দেওয়া। তো হককথা বলব বাবু গিন্নিমার বাড়িতে যে সব কাজের লোকজন আছে, সক্কলেই পুরাতন। আর সক্কলেই সৎ ভালো, কেউ চোর-চোট্টা নয়! দেখছি তো! এই তো রান্নার ঠাকুরমশাই, নিজের হাতে তো সব, তবু কখন জলখাবারের রুটি বই দু-খানা লুচি পরোটা খায় না! সে খাবে শুধু বড়দাবাবু ছোড়দাবাবু।'

'ওহো হো তোমাদের যে একজন বড়দাবাবু আছেন। তা তিনি কেমন লোক?'

'আজ্ঞে তিনি? একদিকে দেবতা তো অন্যদিকে তিনি! এমন মানুষ হয় না! লোকজনকে কখনো উঁচু কথাটি কইতে জানেন না। খুড়িকে কী ভক্তিমান্যি! যখনই দেখতে আসে, কাকী কেমন আছো? ওষুদ খেয়োছ কিনা? ফল-টল দুধ ছানা এসব খাছো কিনা। আবার টেবিল হাঁটকে দেখতো ওষুদ আছে না ফুইরেছে।... আহা, খুড়ির ওই অপঘাত মৃত্যুতে কী কাতরানি! চেঁচামেচি না, যেন কাঠ-পাথর-তুল্য হয়ে গেল মানুষটা। শুদু একবার বলে উঠল, 'কোন নিষ্ঠুর এমন সব্বোনাশ করল? ওঃ!' তারপর আবার তাঁকেই তো বুকবেঁধে সব করতে হল? ডাক্তারকে টেলিফোন, পুলিশকে টেলিফোন, সরকারমশাইকে খবর। এদিকে আবার পাড়ার লোক যাতে হই ‑ই না করে সে বিষয় সাবধান। তো পুলিশ এসেই তো গেট বন্ধ করে দিল যাতে বাইরের লোক না ভেতরে আসতে পারে আর ভেতরের লোক না বাইরে যেতে পারে। এই কাজের লোকগুলোর ওপরই তো যত সন্দ! সব্বাই যেন খুনে গুন্ডা। পারলে তো সব ক-টাকেই হাতে হাতকড়া লাগিয়ে থানায় চালান দেয়। শেষ পর্যন্ত এই হতভাগী মালতী মণ্ডল। কারণ সে ঘরের মধ্যে ছিল! ছিল তা সত্যি। কিন্তু গিন্নিমাকে মেরে তার কী ইষ্টসিদ্ধি হবে, তা ভাবল একবার? ওনার দৌলতে চারবেলা রাজসই খাওয়া-দাওয়া, কাজের মধ্যে কিছুই না, শুদু শুয়ে বসে থেকে একটা মানুষকে আগলানো। তার বদলে মাস মাস এককাঁড়ি করে টাকা! সেই ওনাকে আমি মারতে যাব? আমি পাগল?'

'তা বটে? তো আচ্ছা আর কেউ আসত-টাসত ওঁর কাছে? মানে বাইরের লোক? অন্য আত্মীয় বন্ধু?'

'আত্মবন্ধু কাউকে তো আসতে দেখি নাই কোনোদিন। তবে একজন বাইরের লোক আসত। তিনি হচ্ছে ছোড়দাবাবুর এক বন্ধু। ওনারই মতো বয়েস। গিন্নিমাকে 'মাসিমা' ডাকত। তো খুব ভদ্দর। খুব মিষ্টি কথা।

ছোড়দাবাবুর মতো চাষাড়ে না! তো তেনার বোনের সঙ্গে নাকি ছোড়দাবাবুর বে'র সম্বন্ধ করতে সাধ! তো গিন্নিমার মত ছেলো না। বলতেন, 'এক জাত তো নয়।' কিন্তু ছোড়দাবাবু এক একদিন রোখ করে বলত, 'বিয়েতে মত দেবে তো দাও, তো এই দিলুম গলায় ফাঁস।' বলে একখানা চাদর কী তোয়ালে নিয়ে গলায় জড়িয়ে ফাঁস লাগিয়ে টান দিত। একদিন তো গিন্নিমার গায়ের ঢাকা চাদরখানা তুলে নিয়ে গলায় পাক, 'এই দিলুম টান। এই দিলুম টান।' গিন্নিমা হাঁ হাঁ করে হাত জোড়, 'দোহাই বাবা, দিচ্ছি মত।' তো নাকি সেই মত পেয়েই মামাকে জানাতে মামার বাড়ি ছোটা। ছোটোকালে মামা-মামিই তো মানুষ করেছে। বড়ো হয়ে পিসির বাড়ি।'

'যাই হোক, খুনের দিন তাহলে তিনি ছিলেন না?'

'ছিল কেন? তার তিন দিন আগে থেকেই না!'

'এর মধ্যে বাইরের লোক আর কেউ আসেনি?'

'ওই বন্ধুবাবুটিই এসেছে রোজদিন একবার করে। আর বলেছে, 'মাসিমা, আপনি এই বে'তে মত দিয়ে আমাকে একেবারে কেনা করে দেছেন। বোনের বে-র জেন্য আমার খেয়েশুয়ে শান্তি নেই। তারপর যদি বা কোনো পাত্তোর জোটে তো তাদের এত এত খাঁই। আমি গরিব মানুষ এত টাকা কোথায় পাব বলুন তো? আপনি বলেছেন কিছু দিতে হবে না। এই আরামেই আছি।' তো তিনি রোজ একবার করে এসেছে, সেদিনও সন্ধেয় এসেছিল! এসে বলল, নীলুর খবর কী? কবে আসছে'?'

'নীলু?'

'ওই যে ছোড়দাবাবুর ডাকনাম। ভালো নাম কী যেন জানি না! তো সেদিন কী হল— এসেই বলল, 'এই সেরেছে, একটা দরকারি ব্যাগ বোধ হয় রাস্তায় পড়ে গেছে—' বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল!

ঠাকুরমশাইকে নাকি এসেই বলেছিল, 'ঠাকুর, একটু চা খাব।' ঠাকুরমশাই চা নিয়ে এসে তো 'থ'। মানুষ কোথা? মানদা মাসি বলল, 'বাড়ির চারধারে ঘুরতেছে, মায় জমাদার আসার গলির দিকে পর্যন্ত।' তারপর এসে বলল, 'নাঃ। পেলুম না। বোধ হয় বাড়িতে ফেলে এইছি।' তারপর কতক্ষণ বসল, চা খেল। তারপর গেল। ওমা! চলে যাবার পর দেখা গেলো তেনার সেই ব্যাগ মাসিমার ঘরেই একটা জানলার ধাপিতে পড়ে।'

'ব্যাগটায় টাকাকড়ি ছিল?'

'তা আমরা তো খুলে দেখি নাই! গিন্নিমাই বলল, 'দেখি তো কী আছে ওর ব্যাগে, যার জন্যে এত হাঁপাহাঁপি।' তো দেখল তেমন কিছু না। ওই

বোনের বে'র জন্যেই কিছু ফর্দ-ঠর্দ। কেটারার, ডেকরেটার, নেমন্তন্নিদের নামের ঠিকানা-টিকানা। আর ক-টা দোকানের ক্যাশ মেমো। লন্ড্রির বিল, এইসব। গিন্নিমা। হাসল, বলল, 'ছেলেটা যেন পাগল। এর জন্যে এত?' সেই হাসিই শেষ হাসি!'

বলেই ডুকরে ওঠে কান্নার শব্দ!

প্রভাংশু বলেন, 'কান্না-ফান্না থামাও বাপু, এখন অনেক কথা জানতে হবে আমায়। তোমাদের গিন্নিমাকে কে খুন করেছে, এটা তো জানতে হবে? নাকি হবে না?

আবার টেপে মালতীর গলা, 'তা আবার না হবে। তার একটা উচিত শাস্তি না হলে আমারই কি প্রাণ কাঁদবে না? গিন্নিমা গেলেন, আমার সর্বসুখ ঘুচল, আবার তার ওপর এই বিনি অপরাধে জেলখানায় বন্দী!'

'সেই তো বলছি—এখন যথাযথ জবাব দাও। তোমার নিজের কাউকে সন্দেহ হয়?'

'আ—আমা-র? আজ্ঞে—আমি দাসীবাঁদি লোক। আমার কী সে-কথা বলা মানায়?'

'আঃ! রাখো তো তোমার বিনয়। সন্দেহ হয় কিনা কাউকে তাই সোজাসুজি বলো!'

'আজ্ঞে হয়।'

'কাকে?'

'ওই ছোড়দাবাবুকেই। ওনার ভাবভঙ্গি রীতি-প্রকিতি যেন সর্বোদাই খুনে গুন্ডার মতন। অথচ বড়দাবাবু একটি পয়সাও নিত না, নিজের খুড়োর টাকার। নিজে কোন কলেজে মাস্টারি করত। সেই মাহিনা থেকেই নিজের সব খরচা চালাত। আবার তা থেকেই কখন কখনও খুড়ির জন্যে ফলটা মিষ্টিটা এনে বলত, 'কাকি খাও'।'

'কাকি বলেন!'

'হ্যাঁ, ওই অভ্যেস। খুড়ি' না বলে 'কাকি'।'

'তা ভালো। ও একই! তা হলে বড়দাবাবু লোক ভালো?'

'বলেছি তো একদিকে দেবতা তো আর দিকে বড়দাবাবু! মানুষ না দেবতা। আর ইনি? ছোড়দাবাবুটি? ঠিক উলটো। দানবদৈত্যি।'

'তাহলে তো ইনিই খুন করতে পারেন?'

(টেপে মালতীর দোনামোনা স্বর)

'আজ্ঞে পারেন না তা নয়, তবে তিনি তো খুনের আগের দিনের দিন

আগে থেকে দেশছাড়া। মালদায় মামার কাছে গিয়ে বসে আছে। অদৃশ্য হয়ে উড়ে এসে তো আর খুন করে যেতে পারে না?'

'মালদায় গেছে তার প্রমাণ আছে?'

'তা আছে। সরকারমশাই নিজে রেলের টিকিট কেটে তেনারে গাড়িতে তুলে দিয়ে গাড়ি ছেড়ে গেল দেখে তবে ফিরেছে। নইলে গিন্নিমা তো মনে শান্তি পাবে না।'

প্রভাংশু বললেন, 'যাক, আর বলতে হবে না। তোমার ছুটি। আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে।'

প্রভাংশু বললেন, 'পলু, কী বুঝলি?'

'বুঝলাম আসল রহস্য ওই ব্যাগ হারানোর মধ্যে।'

'তাহলে?'

'আমাদের কাল সকালেই একবার নিহতের বাড়িতে যেতে হবে তদন্ত করতে।'

'কী আর তদন্ত করবি? পুলিশ তো সব চিহ্ন-টিহ্ন ঘুচিয়ে দিয়ে এসেছে। 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশারদ'-এর তো আর কিছুই করার নেই।'

(এইখানে বলে রাখা ভালো, প্রভাংশুও নিজে একজন 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট-বিশারদ'। এটা তাঁর একটা 'হবি।')

'তবু যেতে তো হবে একবার।'

'তা অবশ্য হবে।'

এলেন পরদিন সকালে প্রভাংশু ভাগনে সঙ্গে করে বাড়ুজ্যে বাড়ি! তখন ওদের বাড়ির বড়দাবাবু খেয়েদেয়ে কলেজ চলে গেছেন। খাওয়া আর কী, খুড়ির মৃত্যুতে অশৌচ চলছে—একটু আলু, কাঁচকলা, সেদ্ধ আতপ চালের ভাত আর একটু গাওয়া ঘি। ব্যস!... তো চলে গেছেন। সরকারমশাইকে খবর দেওয়ায় তিনি এলেন। আর বাড়ির লোকগুলো তো আছেই। সরকারমশাই বললেন, 'পুলিশ তো ও-ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে রেখে গেছে, ঘরে ঢোকার তো উপায় নেই।'

এরা বলল, 'তা হোক। বাইরে থেকেই যতটা যা পারি—' বলে বাড়ির আশপাশ এদিক-সেদিক মায়া জমাদার আসার গলি পর্যন্ত। আর সেই সময় পলু হঠাৎ গলার স্বর নামিয়ে বলল, 'মামা, এইখানে দেখেছ?'

'কী রে?'

'ওই গিন্নীমার ঘরের অ্যাটাচড্ বাথরুমে উঠে যাওয়ার জমাদারের ঘোরানো লোহার সিঁড়িতে কাদামাখা জুতোর ছাপ?'

প্রভাংশু এসে নিরীক্ষণ করে দেখে বলেন, 'তা তাতেই বা কী হল? আজকাল তো জমাদাররাও জুতো পায়ে দিয়ে কমোড সাফ করতে আসে।'

'তা আসে! কিন্তু উনি মারমা যাবার পর আর আসেনি নিশ্চয়? আসার দরকার হয়নি। আর তার আগে—'

'তার মানে এই পথেই? জমাদার ব্যাটাই খুনি নয় তো?'

'পাগল নাকি? তার মোটিভ কী হতে পারে?'

'তাহলে?'

'তাহলে—অন্য কেউ। আরও একটা দ্রষ্টব্য আছে মামা! এসে দ্যাখো।

জমাদারের ঢোকার দরজা বলে ঘেন্না করে লাভ নেই। এই কালো সুতোটা দ্যাখো।'

'কালো সুতো?'

'হ্যাঁ, কালো সুতো!'

দিনদুপুরেই টর্চের আলো ফেলে দেখলেন প্রভাংশু। বাথরুমের দরজার মাথ::ায় যে একটা লোহার শিক বসানো, খানিকটা কাটা জানলা মতো আছে, ঘরের মধ্যে বাতাস আসবার জন্যে, তারই একটা শিকে একটা সরু কালো সুতো বাঁধা।... আর সেই সুতোটা? বাথরুমের দরজার ভেতরদিকে যে ছিটকিনিটা আছে তার সঙ্গে বাঁধা!

অর্থাৎ?

অর্থাৎ ওই সুতোটা ধরে টান দিলেই ছিটকিনিটা উঠে পড়বে, আর দরজাটা অনায়াসে খুলে যাবে। তারপর বাইরের লোক ঢুকুক মনের আনন্দে।

'তার মানে এই কৌশল আগে থেকেই খাটানো হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। যখন ওই ব্যাগ হারানোর ছুতোয় জমাদারের গলি পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি তখন!'

'পলু রে।'

'থামো মামা। কে আবার শুনতে পাবে?'

'দূর। এই অচ্ছ্যুৎ জায়গায় কে আসছে? বরং বামুনঠাকুর, মানদা, সরকারমশাই বলেছে, 'ওই নোংরা দিকে যাচ্ছেন কী জন্যে? ওদিকে কী আছে? ওখানে গেলে আবার চান করতে হবে'।'

'হুঁ! তুমি তো আবার তখন বুদ্ধি করে বললে, আমরা এখনো চান করে আসিনি!'

হ্যাঁ, এইসব কথাবার্তার পর মামা-ভাগ্নে বললেন, 'সরকারমশাই, আমরা তাহলে এখনকার মতো চললাম। ওবেলা আবার আপনাদের বড়দাবাবু ফিরলে আসা যাবে।'

ঠিক এই সময় গেটের ধারে একটা তুমুল চিৎকার, হৈহল্ল!

কী ব্যাপার? না 'নীলুবাবু' ফিরেছে মামা বাড়ি থেকে। আর এসেই এই ভয়ংকর দুঃসংবাদ শুনে বুক চাপড়ে মাথা চাপড়ে রাক্ষসের মতো চেঁচাচ্ছে, 'ওরে বাবারে, কোন নিষ্ঠুর এমন কাজ করল রে—কার ভেতরে এত শয়তানি ছিল রে?'

প্রভাংশু তাকিয়ে দেখলেন কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছেলেটার কপালে কালশিটে পড়ে যাবার যোগাড়। আর তাকিয়ে দেখলেন গেটের বাইরে আরও একটি 'কালপ্রিট' যেন গুটি গুটি আসছে।... গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'সরকারমশাই, আমি একবার ফোনটা ব্যাভার করতে পাবি?'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়। সে কী কথা? যত ইচ্ছে—'

অতএব চললেন ফোনের কাছে। ডাক দিলেন, 'গোবিন্দ! বড়ো রুই জালে পড়েছে, চটপট চলে আয়, আরও এক জোড়া হাতকড়াও নিয়ে আয়।'

এই সময় নীলু কাতর আর্তনাদ করে উঠল, 'একটু জল।'

তা জল সে চাইতে পারে।

একেই তো সারারাত ট্রেনে এসেছে, তার ওপর এসেই ওই রাক্ষুসে দাপাদাপি আর চিৎকার চেঁচামেচি। তার সঙ্গে জুন মাসের ভর দুপুরের গরম আর রোদের যোগটিও তো আছেই।

তা এল তার জন্যে জল। ঠান্ডা ফ্রিজের জলই নিয়ে এল মানদামাসি বড় এক গ্লাস।

ঢকঢক করে সেটি খেয়ে কাতরভাবে বলল, 'আর একটু।'

আবারও এল এক গ্লাস।

সেই গ্লাসভর্তি জলটাও এক চুমুকে শেষ করে এদের 'ছোড়দাবাবু' বলে উঠল, 'বড়দাকে দেখছি না যে?'

এরা জানাল কলেজে গেছেন।

'অ্যাঁ? কলেজে? বাড়িতে এত বড়ো একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আর তিনি যথারীতি নিত্যকর্ম করে চলেছেন। বাঃ।'

সরকারমশাই গম্ভীরভাবে বললেন, 'তা তিনি বাড়িতে থেকেই-বা কী সুরাহা হবে?'

'কেন? খুনটা কে করেছে, তার সন্ধান নিতে হবে না? নাকি 'বুড়ি' গেছে বালাই গেছে!'

এই সময় গোবিন্দগোপালের আবির্ভাব। এসেই পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হাসি হেসে বলে উঠলেন, 'বালাই ষাট! তাই কি হয়? এই তো সন্ধান নেওয়া-নিয়ি হয়ে গেছে।'

বলেই কনস্টেবলদের দিকে চোখের ইশারা।

তারাও সঙ্গে সঙ্গে দু-জোড়া হাতকড়ার সদব্যবহার করে ফেলল গোবিন্দগোপালের সামনে।

'এর মানে? এর মানে? চেঁচিয়ে ওঠে নীলু।

'মানে এক্ষুনি বুঝতে পারবে চাঁদু।' গোবিন্দগোপাল বলে উঠলেন, 'তার আগে এই পাবলিকের কাছে প্রকাশ করা হোক, তুই ব্যাটা আসলে কে?'

'তুই'! 'ব্যাটা'।

কাকে বলা হল এ কথা?

এ-বাড়ির দোর্দণ্ডপ্রতাপ ছোড়দাবাবুকে?

যারা উপস্থিত ছিল তারা তো পাথর!

এমনকী প্রভাংশু এবং পলুও। তারা তো এহেন পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। তবে তারাও 'পাথরের' ভূমিকাতেই রইল। ভাবটা দেখা যাখ কী হয়।

কিন্তু আশ্চর্য! এহেন অপমানেও 'ছোটোবাবু' চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল না। বরং মুখে তালাচাবি। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েই রইলো মাথা' নীচু করে।

গোবিন্দগোপাল বললেন, 'আমাদের কিন্তু একটুক্ষণ বসতে হবে।'

'নিশ্চয়। নিশ্চয়।'

সরকারমশাই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বামুনঠাকুর!' তার সঙ্গে ইশারা।

বামুনঠাকুর নীচতলাতেই যে বসবার ঘরটা আছে, তার দরজা খুলে দিল। বসবার ঘর বলে এমন কিছু সাজানোগোছানো বৈঠকখানা বা ড্রইংরুম নয়। এ ঘর ওই 'কাজের লোক কোম্পানীরই' আড্ডাখানা। অথবা 'বিশ্রাম কক্ষ'!

তবে ঘরটা বেশ বড়োসড়ো। মাঝমদ্যিখানে একখানা মস্ত তক্তপোশ পাতা। তাতে শতরঞ্চি চাদর কিছুর বালাই নেই, শুধু কাঠ। তবে কাঠটার জাত ভালো, আর বেশ পালিশ চকচকে তেলাতেলা!

সেই তক্তপোশের ওপরই বসলো এজলাস।

বড়দাবাবু খবর পেয়ে চলে এসেছেন। সবই তিনি শুনলেন। হাতকড়া আসামিযুগল একধারে। গোয়েন্দাযুগল একধারে, আর সবাই কেউ কেউ তার ওপর ধারে ধারে। কেউ মাটিতেও!

মাঝখানে বড়দাবাবু ও গোবিন্দগোপাল। গোবিন্দগোপাল বলে উঠলেন, 'অ্যাই ব্যাটা! যা জিজ্ঞেস করব সত্যি উত্তর দিবি তো?'

'অ্যা অ্যা—'

'যাক আঁ-আঁয় কাজ নেই, বল আসলে তুই কে?'

প্রভাংশু নীচুগলায় বললেন, 'শুধু ধমকে কী হবে? একটু আধটু 'থার্ড ডিগ্রি' প্রয়োগ না করলে 'সত্যি' কথাটা বেরিয়ে আসবে? অন্তত একটু জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাঁকা-ট্যাকা—'

'নাঃ, দরকার হবে না।'

গোবিন্দগোপাল বললেন, 'সঙ্গে 'লাই ডিটেক্টর' আছে।'

'তাই নাকি? একেবারে রণসজ্জায় সেজেই আসা হয়েছে?'

'রণসজ্জা-টজ্জা নয়। এসব তো এখন রাখতেই হয়। থার্ড ডিগ্রি তো বেআইনি হয়ে গেছে' বলে আবার মুচকি হাসেন, 'অবশ্য থানায় যে আইন-টাইন ঠিক মানা হয়, এমন গ্যারান্টি দিতে পারি না। তবে লোকসমাজে—'

বলে সেই 'লাই ডিটেক্টর'টি বা 'মিথ্যাবাদী শনাক্তকরণ' যন্ত্রটি পকেট থেকে বার করলেন, আর প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—

'অ্যাই! বললি না, আসলে তুই কে?'

'আসলে? আজ্ঞে আমি কাঙালীচরণ দাস!'

কাঙালীচরণ! কাঙালীচরণ দাস!!

ঘরের মধ্যে যেন বোমা পড়ল একখানা!

কী বলছে ছোড়দাবাবু!!!

কী আর বলছে? গোবিন্দ যা বলাচ্ছেন।

'দেশ কোথায় তোর?'

'আজ্ঞে, মেদিনীপুর জেলা, খণ্ডখোলা গ্রামে!'

'কে আছে সেখানে?'

'আজ্ঞে মা।'

'আর কেউ নেই? মা একা থাকে? দেখে কে?'

'আশপাশে জ্ঞাতিগুষ্টি থাকে, তারাই দেখে।'

'মায়ের খাওয়া-পরা চলে কী করে?'

'আজ্ঞে আমি মাস মাস একশত টাকা করে মনি-অর্ডার করে পাঠাই, তাতেই চলে।'

'ও টাকা কোথায় পাস তুই?'

'আজ্ঞে এখানকার গিন্নিমা আমারে 'নীলকমল' বলে আদর করে ওই টাকাটা হাতখরচা করতে দিত—'

'হুম্, টাকাটা সই করে নিত কে?'

'সই আর কে করবে? মা তো আর সাক্ষর নয়। টিপছাপ দিয়ে নিত। পিওনই নামটা লিখে নিতো 'খুকুবালা দাসী'!'

'তা গিন্নিমা তোকে এত ভালবাসত তবু তাঁকে খুন করলি কী বলে?'

'আঁ—আঁ—আঁ। আমি তো খুন করি নাই। করেছে এই নেপু।'

'হ্যাঁ, হাতে হাতে নেপুই করেছে বটে। গলাটা টিপে ধরেছিল ওই নেপুই। তোর প্রাণের বন্ধু। কিন্তু প্ররোচনা দিয়েছিল কে? বল! বল বদমাশ।'

'আ—আ—আমিই!'

'কেন?'

'লোভে পড়ে, আর কেন? পিসি— ইয়ে গিন্নিমা বলেছিল, 'আমি মরে গেলে আমার এই ঘরবাড়ি বিষয়-সম্পত্তি ব্যাঙ্কের টাকা সব তোর আর দেবুর নামে সমান ভাগে ভাগ করে উইল লিখে রেখেছি'। কিন্তু—'

'দেবু কে?'

'ওই তো বড়দা। দেবনাথ ব্যানার্জি। কর্তাবাবুর ভাইপো। কলেজে পড়ায়—'

'হুঁ। বুঝেছি। তো উইলই যদি করে রেখেছেন বললেন তাহলে খুন করতে গেলি কোন দরকারে? এখানে তো নাম ভাঁড়িয়ে 'নীলু' সেজে দিব্যি চর্ব্যচোষ্য খাচ্ছিলি-দাচ্ছিলি, ভালো ভালো পোশাক পরছিলি—'

''আজ্ঞে 'বে' করার মন হলো। তো ভাবলুম 'পিসি' ইয়ে গিন্নিমা তো বে'র কথা উচ্চবাচ্য করে না। অথচ— আমারও বয়েস গড়াচ্ছে। পিসির মরার অপেক্ষায় থাকলে তো বুড়ো হয়ে যাবো। সবে তো ষাটি-বাষট্টি বয়েস ওনার, বাঁচলে আরও কেননা পঁচিশ-তিরিশ বছর বাঁচতে পারেন। তাহলে?'

'ও। তাই তুমি পিসিকে 'শেষ' করে বে' করে সংসার করতে সাধ করলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। পি-পিসিকে বলেছিলুম দু-একবার। তো বলেছিল, 'তোর মতো মুখ্যু গেঁয়োরকে কে মেয়ে দেবে?' রাগ এসেছিল প্রাণে। তাই ভাবলুম দেখাই যাক কেউ দেয় কিনা। তবে—ইয়ে দেখানো আর হল কই? তবে জেনে গেছল— এই নেপুই তার বোনের সাথে আমার বে দিতে রাজি। শুধু রাজি হল 'বিনি পয়সায়' বোনকে পার করতে' পারবে বলে।'

'সেই আহ্লাদে একটা বুড়ি মেরে খুনের দায়ে পড়তেও রাজি হলো ওই বদমাশটা?'

'আজ্ঞে সেও ওই লোভে পড়ে। কথাতেই তো আছে 'লোভে পাপ, পাপে মিত্যু'।'

'তো মিত্যু টা ওর হবে কেন? তোরই হবে।'

'কখনও না। আইন জানি না নাকি? যে হাতে করে মারে তারই ফাঁসি হয়। প্ররোচনাদাতার বড়োজোর দু-পাঁচ বছর জেল হয়।'

'ও! আইন-টাইন সব জানা হয়ে গেছে!'

'মামা বলেছিল, আসলে মামার প্ররোচনাতেই তো সব। মামাই তো নাটের গুরু। সে-ই তো এই হতভাগা কাঙালীচরণকে 'নীলেন্দু মুখুজ্জে' সাজিয়ে এখানে পাঠিয়েছিল।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি?'

'তাই তো! আসল নীলেন্দু তো কোনকালে সেই মাধ্যমিকে ফেল করে মনের দুঃখে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। মামা মানে আসল নীলেন্দুর মামা ভাবল এই মওকা। তাই শৈশবে মা-মরা নীলেন্দুকে মানুষ করা চাকরানি কাঙালির মায়ের ছেলে কাঙালিকে নীলেন্দু সাজিয়ে এখানে চালান করল।'

'চালান করল? কেউ ধরতে পারল না?'

'কী করে পারবে? কেউ দেখেছিলো তাকে? এই গিন্নিমায়ের ভাই-ভাজ তো সেই ছ-মাসের খোকাটাকে রেখে মরেছিল। ইনি তখন কর্তার সঙ্গে এখান-সেখান। কখন দিল্লি কখনও কলকাতা। চিঠি-পত্তরে জানল দাদা-বউদি মরেছে— ছেলেটাকে তার মামা-মামি মানুষ করতে নিয়ে গেছে।'

'ওঃ! 'মানুষ' করতেই বটে। বল 'বাঁদর' করতে।'

'তা যা বলেন! তো এখানেও পি-পিসিও আদর দেয় নাই। ডবল বাঁদর করে তুলেছিল। তার এই প্রতিফল।'

প্রভাংশু মৃদুস্বরে বলেন, 'ওঃ! একেবারে দিব্যজ্ঞান?'

পলু বলল, 'যা বলেছো মামা! শুনে শুনে আমারও 'দিব্যজ্ঞান' জন্মাচ্ছে।'

এই সময় প্রভাংশু সকলের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, 'আর সময় নষ্টয় কাজ নেই, আমার কাজটা হয়ে যাক।'

'আপনার কাজ?'

'বাঃ। মালতী মণ্ডলের জবানবন্দিটা সকলকে শুনিয়ে দিতে হবে না?' বলে কাঁধের ঝোলা থেকে সেই টেপটা বার করলে, এবং চালিয়ে দিলেন!

প্রশ্ন আর উত্তর। গড়াগড়িয়ে হয়ে যাচ্ছে। সবাই শুনছে আর মাঝে মাঝে শিউরে শিউরে উঠছে। উঃ! এইরকম পিশাচ ওই ছেলেটা? এতদিন যাকে 'ছোড়দাবাবু' ভেবে এসেছে সবাই, এখন খোলস খুলে 'কাঙালীচরণ' হয়ে গেছে।

তো সেই কাঙালীচরণ? একেবারে চুপ। কোনো বাদ-প্রতিবাদ নেই। যখন 'বাথরুমের দরজার ফুটো দিয়ে' দেখার কথাটা হচ্ছে তখনই যেন ছিটফিটিয়ে উঠছে। কী আর করবে? হাতে হাতকড়া! না থাকলে হয়তো হাত-পা ছুঁড়ত।

সবাই তো মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিঃশব্দে শুনে গেল। তারপর দু'একজন বলে উঠল, 'আশ্চর্য! আমাদের কাছে কিন্তু একদিনও কিছু বলেনি তো।'

প্রভাংশু বলেন, 'বুঝতেই পারছ বলেনি ভয়ে। বললে কি আর ইনি তাকে আস্ত রাখতেন?'

তারপর সবাইকে শোনালেন নিজেদের 'তদন্তফল'। নেপুবাবুর সেই ব্যাগ হারানোর অভিনয়, এবং গিন্নীমার ঘরের অ্যাটাচড্ ব্যথরুমের জমাদার আসবার দরজায় কালো সুতোর রহস্য, সিঁড়ি থেকে ঘর পর্যন্ত কাদামাখা জুতোর ছাপ ইত্যাদি সব কিছু! গোবিন্দ-গোপালও হ্যাঁ। বলেন, 'অ্যাঁ, আমি ওনার ঘরের দরজায় তালা মেরে গেলাম আর তোমরা চোরা দরজা দিয়ে সে-ঘরে ঢুকে খুনির জুতোর ছাপ দেখে এলে?'

'তা অবস্থা বিশেষে বেআইনি কাজও করতে হয়।'

'তাহলে আসল খুনি কে?'

পলু বলে ওঠে, 'বলতে গেলে দু'জন 'আসল' যদি বলতে হয় তো সে এই কাঙালীচরণ বা গিন্নিমার ভাইপো নীলুবাবু আর তার সঙ্গে এই নেপুবাবু! কারণ, যদিও প্ররোচনা দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু নীলুবাবু, তবে বৃদ্ধা মহিলার গলাটা টিপে ধরেছিলো, ওরই সাঁড়াশির মতো হাত দু'খানি।'

কারুর মুখে কথা নেই!

গোবিন্দগোপাল বলে উঠলেন, 'চলো দেখে আসি সেই দাগগুলো এনাকে সঙ্গে নিয়ে। দেখা যাক এনার জুতোর সঙ্গে ছাপটা মেলে কিনা।'

প্রভাংশু বলে ওঠেন, 'তুই কি ক্ষেপেছিস গোবিন্দ? সেই কাদামাখা জুতো পরে আসবে আজও? এ তো দেখছি পায়ে একজোড়া সস্তা মার্কা হাওয়াই চটি। আর ওটা মনে হচ্ছে ফিতে বাঁধা কেডসের ছাপ। মানে সরু লোহার সিঁড়িতে উঠতে, চটি-পরা পা যদি স্লিপ করে বসে, তাই সাবধানতা। কীহে নেপুবাবু, আপনার বাড়ি গিয়ে সার্চ করলে একজোড়া কেডস পাওয়া যাবে না? অবশ্য ধোয়ামোছা সাফ করা।'

সবাই নেপুর মুখে দিকে তাকায়।

নেপু চুপ, ঘাড় গোঁজা।

আর সন্দেহ থাকে না কার।

তথাপি গোবিন্দ সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত না করে আসতে ছাড়লেন না। এবং সকলেই জানতে পারল সেই নিষ্ঠুর কাজটা ওই নেপুই করেছিল।

কেন? কীসের জন্যে?

কীসের জন্যে আবার? লোভে পড়ে। বিনা খরচে কালো-কোলো ধাড়ি আইবুড়ো বোনটাকে পার করার লোভ, আর সেই বোন এসে রাজরানি হয়ে বসে দাদাকে সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখবে এই লোভ।

'কিন্তু এত প্যাঁচও তোর মাথায় এসেছিল কাঙালীচরণ?'

এখন কাঙালিচরণেরা মুখ ফোটে, বলে ওঠে, 'আমার মাথায়? সব ওই মালদার মামাবাবুর। আমি ওনার বাড়ির চাকরানির ছেলে বটে, তবে ওনার আসল ভাগনের মতোন মামাবাবুই ডাকতুম।'

'তুমি ওনার বাড়ির চাকরানির ছেলে?'

'তা 'চাকরানি' বই আর কী? জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই তো করত মা ওখানে। সেই যে ছ'মাসের মা-বাপ-মরা বাচ্চাটাকে মানুষ করতে মামা-মামি নিয়ে গেছল, সেই থেকে আমার মা-ই তো তাকে দেখভাল করেছে। তার সঙ্গে আমাকেও। আমি অবিশ্যি তখন একটু বড়ো, কথা কইতে শিখেছি, হেঁটে বেড়াই। ওই খোকাটার সঙ্গেই দুধ খেয়েছি, ফলের রস খেয়েছি, ক্রমশ ও বড়ো হতে হতে সব। তো সে তো এগজামিনে ফেল করে হারিয়ে গেল। শুনলেন তো সব। তদবধি মামাবাবু আমায় যন্ত্রণা দিয়ে আসছে, 'বুড়িকে শেষ করে ফেলে কার্য সমাধা করে ফেল'।'

'তো তিনি থাকেন মালদায়, তুই এখানে, যোগাযোগটা হতো কী করে? চিঠি লিখে?'

'চিঠি? না না! মামাবাবু বলত 'শতং বদ মা লিখ।' যোগাযোগ হত মাঝে মধ্যে দেখাসাক্ষাতেই। ওই যে বলতুম বন্ধুদের সঙ্গে পুরী যাচ্ছি, দিঘা যাচ্ছি, ওটা ছল। যেতুম মালদাতেই!'

'ওঃ! একেবারে ছলনার জাল বোনা চলেছিল?'

'তা আজ্ঞে, সমগ্র পৃথিবীখানাই তো ছলনার জালে ঘেরা।'

'ওঃ, সাধে বলছি দিব্যজ্ঞান!' পলু মৃদু গলায় বলে।

প্রভাংশু বলেন, 'আচ্ছা তুমি তো নিজে মুখেই বললে, গিন্নিমা তোমায়

জানিয়েছিলেন তোমায় বিষয়-সম্পত্তির পুরো অর্ধেক ভাগ দেবেন দেবুবাবুর সঙ্গে, তবুও—'

'আহা সবই তো বললুম। ধৈর্য ধরলে না! উনি কবে মরবেন, তার হিসেব ছিল? তবে অবাক হয়ে যাচ্ছি ওই মালতীর কথায়। দেখলে মনে হত হাবাগোবা ভালোমানুষ, অথচ ভেতরে ভেতরে এত শয়তানি! সব দেখেছে, শুনেছে, আর মনে গেঁথে রেখে দিয়েছে?'

'হুঁ। সবাই সবাইকে হাবাগোবা ভাবে। তোমাকেও ভাবে উদোমাদা রগচটা। ভেতরে এত প্যাঁচ লুকিয়ে রেখেছিলেও তো?'

ব্যস আবার চুপ!

গোবিন্দ বলে ওঠেন, 'ব্যস তবে চলো শ্রীঘর। দুই বন্ধুতে একই শ্বশুরবাড়িতে।'

আর শোনামাত্রই সে কিনা বলে উঠল 'ওঃ বাবারে! পেটের মধ্যে যেন ইঞ্জিন চলছে, ছুঁচোয় ডনবৈঠক করছে, খ্যাঁ খ্যাঁ করে আগুন জ্বলছে। সেই কোন সন্ধেবেলা দু-খানা রুটি গিলে ট্রেনে চেপেছিলুম—'

সঙ্গে সঙ্গে মানদামাসি বলে ওঠে, 'আহা, বাছা রে! ও যে আবার একেবারে খিদে সইতে পারে না। ওকে দুটো খেয়ে যেতে দিন।'

'খেয়ে যেতে দেব? মামাদোবাজি? হাতে হাতকড়া, খাবে কী করে?... খাবে একেবারে শ্বশুরবানি গিয়ে!'

এই সময় বামুনঠাকুর এসে বলে ওঠে, 'এখানে যে খেতে বলছ মানোদাদিদি, ভাত রান্না হয়েছে এখনও? সেই তো সক্কালবেলা বড়দাবাবুর কাঁচকলা সেদ্ধ আতপচালের ভাত। ব্যস।'

ও, তাও তো বটে।

মানদা তবু নাছোড়। বলে কিনা, 'ওই ছোড়দাবাবুর জন্যে আর দুটো ভাত চাপাও না বামুনদাদা! আর ওনার বন্ধুটার জন্যেও।'

'অ্যাঁ, এখন ভাত চাপিয়ে, আমরা বসে থাকব?' গোবিন্দগোপাল শিউরে ওঠেন।

সেইসময় কী ভেবে বড়দাবাবু অর্থাৎ দেবু বলে ওঠেন, 'কিন্তু আপনারাও তো এত বেলা অবধি উপোসি আছেন, একটু জল-টল না খাইয়েই-বা ছাড়া যায় কী করে?'

'আহা-হা, আমাদের জন্যে ভাবতে হবে না?'

'ভাবতে হবে না বললে হয়? কাকিমা থাকলে এমন হতে পারতো? বামুনঠাকুর, মিষ্টি-টিষ্টি নিয়ে এসো কিছু।'

বলামাত্রই বামুনঠাকুর একপায়ে খাড়া। সঙ্গে সঙ্গে টাকা পয়সা দিতে হয় না। সে তার কাছে মজুতই থাকে। এ বাড়ির ওটাই প্রথা। মাসের মাইনের সঙ্গে তার হাতে কিছু মোটা টাকা দিয়ে রাখা হয়, নিত্য বাজার, দোকান এবং অতিথি-টতিথি এলে আপ্যায়নের মিষ্টি আনতে।

চলে গেল ছুটে। তবে মানদা আর তার বোনঝি তরুবালাকে কী যেন বলে গেলো গুজগুজ করে।

কী বলে গেল, তা বোঝা গেল খানিক পরে।

এরা যখন বিদায় নিতে উন্মুখ...

বামুনঠাকুর মিষ্টির বাক্স আনার সঙ্গে সঙ্গেই ভাঁড়ার ঘর থেকে এসে হাজির হল মস্ত একখানা থালায় করে কাটা ফলের গাদা। আম কলা শশা তরমুজ কালোজাম।

ফল কোথা থেকে এল?

কোথা থেকে আবার? বাজার থেকেই। বড়দাবাবু এখন রাতে ফল খেয়ে যাচ্ছে না? তার জন্যে এনে রাখতে হচ্ছে না? এখন খরচা হোক, আবার আনলেই হবে। আর খায়ও কি বেশি? কতক সরকারমশাইকে দেওয়া হয়, কতক এ-ও-সে খায়! এখন এনারা যদি খান সার্থক। হাতটা মুখটা ধুয়ে তা এনারা খেলেনও। গোবিন্দগোপাল, প্রভাংশু, পলু, সরকারমশাইও।

খেতে অবশ্য খানিক সময়ও লাগলো। ফলের পর সন্দেশ রসগোল্লা পান্তুয়া। ঠান্ডা জল। আর ততক্ষণে রান্নাঘর থেকে বাতাসে ভেসে এসে হাজির হচ্ছে অতি পরিচিত একটি সৌরভ। গোবিন্দভোগ চালের আর ভাজা সোনা মুগ ডালের ফুটে ওঠার মিশ্রিত সুরভি!

তার মানে নীলু আর নেপুর জন্যে খিচুড়ি ফুটছে!

এও সম্ভব?

তা হল সম্ভব!

এঁরা যখন বিদায় নিতে উন্মুখ, মানদামাসি একটা ইয়া লম্বা টিফিন কেরিয়ার নিয়ে এসে হাজির। 'একটু দাঁড়ান বাবা আপনারা। আহা ছেলে দুটো উপোসি রয়েছে। বামুনঠাকুর চটপট দুটো চালেডালে ফুটিয়ে দিয়েছে।... নিচের বড়ো কৌটোটায় তাই রইল দুজনার মতো। মাঝখানে বাটিটায় দু-খানা ভাজাভুজি, আর ওপরকার বাটিতে একটু ফল মিষ্টি।... ওখেনে নিয়ে গিয়ে হাতখানা খুলে দেবেন বাবু দয়া করে, ছেলেদুটো একটু খেয়ে বাঁচবে!'

মানদার এই কাতর অনুনয়ে পরিস্থিতিটা যেন কেমন থমথমে হয়ে

যায়।... কাঙালিচরণের চোখ দিয়ে যে টপটপ করে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ে। বড়দাবাবুও যেন ঘাড়টা ফিরিয়ে কাঁধে চোখটা মোছেন।

গোবিন্দগোপাল ঈষৎ কোমল স্বরে বলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। হাত খুলে দেওয়া হবে। উঃ, ব্যাটা এই বাড়িতে তুই বেইমানিটা করেছিস? আচ্ছা—চলি।' বলে গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। আসামিদের এবং তাদের পাহারাদের নিয়ে।

প্রভাংশু বলেন, 'আচ্ছা দেবুবাবু, আমরাও তাহলে এবার কাট মারি। খাওয়াটা তো বেশ ভালই হল। গিয়ে শুয়ে পড়া যাবে।'

'আঃ, কী যেন বলেন! লাঞ্চের সময় দুটো ফল মিষ্টি! যাই হোক, বেরিয়ে পড়ুন। বাড়ি ফিরে স্নানাহার করুন গে। তবে 'কাইন্ডলি' বলে যান আপনাদের দক্ষিণাটা কীরকম দেবো? মানে আপনারা যা বলেবেন!'

'যা বলবো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়! যা বাহাদুরি দেখিয়েছেন আপনারা! কে ভেবেছিল অদৃশ্য খুনি এভাবে ধরা পড়বে। ভাবা তো হচ্ছিল ভৌতিক ব্যাপার। বলুন—দশ পনেরো কুড়ি কতো হাজারের মতো চেক কাটা হবে? ইয়ে করবেন না। টাকাটা আমারও নয়, সরকারমশাইয়েরও নয়। টাকা তো সেই পরলোকগতার। এ-টাকা আর তো তাঁর কোনো কাজে লাগবে না। তা ছাড়া তিনি চলে গেলেন। সংসারের খরচই রইল কী? না না, আপনি দ্বিধা করবেন না।'

পলু মামার দ্বিধান্বিত ভাব দেখে আর প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে পারে না। মুখের তালাচাবি খুলে বলে ওঠে, 'সত্যি স্যার, এঁদের যখন এত অঢেল টাকা, আপনি 'কিন্তু' করছেন কেন? আমার তো মনে হচ্ছে বিশ-পনেরো দিলে এঁদের কিছুই এসে যাবে না।'

প্রভাংশু একটু রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকান। কিন্তু বলতে তো পারেন না কিছু। দেবু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। সরকারমশাই চেকটা তাহলে এই কুড়িই কাটুন। এঁরা যখন দুজনে রয়েছেন। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার! ধন্যবাদ। ও. কে.! টা টা।'

প্রভাংশুরা এঁদেরই গাড়িতে ফেরেন। গাড়িখানা কর্তার আমলের, দুই দাদাবাবুই ব্যবহার করছিলো।

বাড়ি ফিরে গুছিয়ে বসে প্রভাংশু বলেন, 'ওরে পলু! তুই তো আচ্ছা বেহায়া! একবারে কুড়িই হেঁকে বসলি? হলেও ওদের অনেক টাকা তবু আমাদের তো একটু চক্ষুলজ্জা দেখানো উচিত ছিল।'

'থামো মামা। চক্ষুলজ্জা! ওদের বলে দুধেই হাত পড়ছে না! ওদের টাকায় ছাতা পড়ছে।'

'তাহলেও—তোর তো পনেরো হাজার হলেও চলত। একটা 'ওয়াশিং মেশিন' বলে হেদোচ্ছিলি, হতো না ওতে?'

'ওয়াশিং মেশিন? খুব হতো ওতে। তবে সেই বাজে জিনিসটা কে কিনতে যাচ্ছে? পাড়ায় লন্ড্রির অভাব? আমি তো ভাবছি— আমরাও যদি ওই টাকাগুলো ডিম ফুটো ছানা জন্মালে হয়তো একখানা সেকেন্ড হ্যান্ড 'অ্যামবাসাডার' হলেও হতে পারে।'

'সেকেন্ড হ্যান্ড! আরে ছিঃ! হ্যাঁরে পলু, এই তোর অ্যাম্বিশান? স্বপ্নেই যদি খাবি তো মুড়ি খাবি কেন? রাজভোগ খাবি।'

'নাঃ মামা! ভেবে দেখছি অতটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভালো নয়। তোমরাই তো বলো 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু'।'

'হুঁ! তাহলে সত্যিই দিব্যজ্ঞান হয়েছে।'

'তা হয়েছে। আচ্ছা মামা, ওদের দুজনারই ফাঁসি হতে পারে?'

'দূর। কারুরই হবে না। আজকাল ফাঁসি অতো সস্তা নয়। তা ছাড়া 'ব্র্যাকেটে ফাঁসি'? নাঃ। ওই দশ-বিশ বছর ঘানি টানতে হবে আর কী। দুজনায় এক শ্বশুরবাড়ির ভাত খেয়ে প্রতিপালিত হতে থাকবে যাবজ্জীবন।'

নিজের ঘরে চুরি

শরৎকালের সকাল।

যদিও শহরটা প্রায় পুরোপুরিই ইট-কাঠ-কংক্রিটের তবু কোথাও না কোথাও এক-আধটা শিউলি গাছ শিকড় গেড়ে বসে থেকে, যথাসময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে অজস্র ফুল ঝরাচ্ছে। শিউলির দান, যেন অকৃপণ হাতে।

প্রভাংশুর ঘরে বাতাসে ভেসে আসছে সেই 'শিউলি গন্ধ'।

'শিউলি গন্ধ'! মন উন্মনা-করা, যেন শৈশব-বাল্যের স্মৃতিবাহী!

আচ্ছা! জগতে এত ভালো ভালো ফুল আছে, আছে গোলাপ, গন্ধরাজ, স্বর্ণচাঁপা, বেল, মল্লিকা, যুঁই। কিন্তু কই তারা তো ফুটে উঠলেই, এমন মন উন্মনা-করা স্মৃতি বয়ে নিয়ে আসে না?

'আশ্চর্য! শিউলি গন্ধটা যেন আছড়ে নিয়ে গিয়ে অতীতের ভূমিতে ফেলে দেয়!'... ভাবলেন শখের গোয়েন্দা প্রভাংশু গুহ! আর ভাবলেন, এ-কথাটা শুধু যে আমিই বলি, তা নয়। অনেকেই বলে। যে যার নিজের ভাষায় বলে বটে, তবে বক্তব্যটা একই। শিউলি ফুটলেই যেন ছেলেবেলাটা এসে হাজির হয়।

আর তার সঙ্গে ঢাকের বাদ্যি, কাশফুলের লুটোপুটি, মা দুর্গার চালচিত্তিরের

ছবি, আর নতুন জামা-জুতোর গন্ধ। বাঙালি জীবনে ছয় ঋতুর মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ ঋতু এই শরৎকাল! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, সবকিছু বাহী।

আছেই কোথাও কাছাকাছি, না হলে এতখানি সৌরভ বয়ে আনত না। প্রভাংশু নিশ্বাসটা জোরে টেনে যেন বুকভরে সেই সৌরভটুকু পান করে ফেলে, আস্তে ডাকলেন, 'পিলু।'

সঙ্গে সঙ্গেই পিছনের দরজা দিয়ে ভিতর ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি ছেলে। বয়েস বোধ হয় বছর কুড়ি, তবে আরও কম দেখায়। তার হাতে একটা মোটা চিরুনি ঘন চুলের মধ্যে জোরে জোরে চালাতে চালাতেই এসে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, 'কী মামা? কিছু বলছ?'

'বলছি নয়, 'বলব' বলেই ডাকছি। তবে তার আগেই আর একটি কথা বলে নিতে চাই, তোমার এই 'মামা' ডাকটি ছাড়তে পারবে, কি, পারবে না? কিছুতেই মনে রাখতে পারবে না, তুমি আমার ভাগনে নও? এমনকী কোনো আত্মীয়ই নয়। স্রেফ আমার অ্যাসিসস্ট্যান্ট 'প্রলয় সমাদ্দার'।'

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা চিরুনির শেষ টানটা দিয়ে সপ্রতিভভাবে বলে ওঠে, 'নিশ্চয় রাখব, তুমি—ইয়ে 'আপনি' আমায় 'প্রলয়' বলে ভাবলেই মনে রাখব।'

ছেলেটার এই চটপটে জবাবে খুশি হন প্রভাংশু। চলনে-বলনে চেহারায়-চরিত্রে ছেলেটা এত স্মার্ট এমনটি তাঁর ভাগনেগুষ্টির কারও মধ্যেই দেখতে পান না। তিন-চার বোন অর্থাৎ ভগ্নী থাকার দৌলতে, ভাগনের সংখ্যা তো তংার কম নয়। 'বড়দি মেজদি সেজদি ছোড়দি' এই চারজনের 'ইসু' তো নেহাত ফেলনা নয়। তবে এই ছেলেটা, এই প্রলয় বা পিলুর মতো তারা প্রভাংশুর গৃহপোষ্য নয়। তারা নিজ নিজ গৃহের বাসিন্দা। মা-বাপ ভাই-বোন ঠাকুমা-পিসির স্নেহছায়ার মধ্যে। একমাত্র এই ছেলেটাই মানে অকালমৃত্যু 'ছোড়দি'র ছেলেটাই প্রভাংশুর কাছে লালিতপালিত হয়েছে। বাপ হতভাগাটা আবার বিয়ে করেছেন এবং সেই দ্বিতীয়াটি এবং তার পুত্রকন্যা ইত্যাদি নিয়ে সুখে দিনযাপন করছেন। থাকেনও কলকাতার বাইরে দুর্গাপুরে না আসানসোলে কোথায় যেন। প্রথম পক্ষের এই সন্তানটির নামও তাঁর মনে আছে কিনা সন্দেহ!

প্রভাংশুই একাধারে ছেলেটার মা-বাপ ভাই-বন্ধু সব! ছেলেটাও তাঁর পক্ষে তাই। কারণ ওই দিদি ক-টা ছাড়া তাঁর তিন কুলে আর কেউ আছে বলে মনে হয় না। কিংবা থেকেও নেই। তা ওই দিদি ক-টার ইতিহাস তো আগেই বলা হয়েছে, যদি বা কেউ কলকাতায় থাকেও, আসা-যাওয়া নেই, বাকিরা কলকাতার বাইরে।

প্রভাংশু বলে উঠলেন, 'পিলু, আজ সকালে বাতাসে কী চমৎকার শিউলি ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে দেখেছিস?'

পিলু শান্ত গলায় বলল, 'গন্ধ জিনিসটা দেখবার নয় মামা, শোঁকবার। যা হোক শুঁকেছি। গাছটা খুব কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু তুমি কী এই কথাটা বলতেই ডাকলে আমায়?'

'আরে না না। মানে বলছিলাম, খবরের কাগজগুলো এসেছে কিনা দেখতে।'

'এলে তো তোমাকেই আগে দিয়ে যাবে। তুমি রাস্তার ধারে ঘরের দরজা হাট করে বসে রয়েছ।'

কথাটা সত্যি। একতলার এই ঘরখানা একেবারে রাস্তার ওপর। এটাই সদর। বাড়িটা আসলে তিনতলা। বেশ শাঁসালো বাড়িওয়ালার বাড়ি। তিনি সপরিবার পুরো বাড়িটা দখল করেই বাস করেন। কেবলমাত্র একতলার এই দু-খানা ঘর আর বাথরুম ইত্যাদিসহ ভাড়া দিয়ে রেখেছেন। কেন? আর্থিক সাচ্ছল্যের জন্যে?

মোটেই তা নয়। দু-খানা ঘরের ভাড়াটের ভাড়াটা তাঁর কাছে নস্যি। রেখেছেন শুধু বাড়িটার নিরাপত্তার জন্যে। সামনের ঘর দু-খানায় ভাড়াটে থাকলে, বাড়িতে দারোয়ান পোষবার দরকার হবে না। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, 'ভাড়াটে চাই'। তার সঙ্গে বাড়ির বিবরণ। তা যেদিন সকালবেলা বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল, সেইদিনই দুপুর থেকে রাত্তির পর্যন্ত 'ভাড়াটে' আসার জ্বালায় অস্থির হয়ে ভাবছেন কালই আর একটা বিজ্ঞাপন দেবেন 'ভাড়াটে চাই না' বলে তখন রাত প্রায় সওয়া দশটায় এই প্রভাংশু গুহর আবির্ভাবের সঙ্গে একটা সদ্যতরুণ ছেলে। ছেলেটাকে দেখলেই ভালো লাগে। 'দুর ছাই' করতে ইচ্ছে হল না। ঘরে এনে বসিয়ে কথা বললেন। এবং বলে, সব তথ্য জেনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। ঠিক ঠিক এইরকমই যেন চাইছিলেন তিনি অর্থাৎ আবছাভাবে এইরকম একটা ধারণা ছিল। নির্ঝঞ্ঝাট লোক, মেলা ছেলেপুলে থাকবে না, ভাড়া বাকি রাখবে না, ইত্যাদি।

যখন জানলেন, ব্যাচিলার লোক, পোষ্য বলতে মাত্র ওই মা-মরা ছেলেটা আর একটি 'পুরাতন ভৃত্য', তা হাতে স্বর্গ পাবেন না? ভাড়াটের সংসারে 'মেয়েছেলে ইয়ে স্ত্রীলোক না-থাকা কী কম সুখের! থাকলেই ফাঁকে নিজের এলাকা ছাড়িয়ে গুটি গুটি দোতলা তিনতলায় উঠে গিয়ে ভাব জমাতো। এবং তার ফলে—

নাঃ, তার ফলে কী কী ঘটতে পারে সেটা বানিওয়ালা মনের মধ্যে ঢেউ খেলতে থাকলেও লিপিবদ্ধকরা সম্ভব নয়।

একমাত্র চিন্তা, ভাড়াটা ঠিকমতো পাওয়া যাবে কিনা কারণ স্থায়ী কোনো চাকরি-বাকরি নাকি করেন না ভদ্রলোক 'পেশা'? প্রশ্ন করতেই বলে উঠলেন, 'পেশা হচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরানো।'

‘তাহলে?’

‘তাহলে আর কী? ভাড়া সম্পর্কে ভাবছেন? আপাতত তো একটা বছরের মতো নিশ্চিন্দি থাকুন। এই আগাম এক বছরের মতো ভাড়া নিয়েই এসেছি। মাসে তিন টাকা তো? ক্যাশই নিয়ে এসেছি মশাই। চেক-এ নানা ঝামেলা।’

বাড়িওয়ালা গৌরাঙ্গ ভট্চায মহোৎসাহে বলে ওঠেন ‘নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমিও মশাই ক্যাশই ভালোবাসি। কোনো প্রবলেম থাকে না।’

হাস্য বদনে টিপেটিপে সেই নোটের গোছাটি গুনে নিয়ে গৌরাঙ্গ ভট্টচার্য বলেন, ‘তাহলে কাল সকাল থেকেই থাকছেন তো?’

‘অবশ্যই। কাল মর্নিংয়েই জিনিসপত্র নিয়ে এসে হাজির হচ্ছি।’

‘ঠিক আছে। বাড়ি আমার সাফসুরো করাই থাকে, তাই আছে। থাকবেও।’

‘আচ্ছা নমস্কার।’

‘আচ্ছা নমস্কার।’

‘আচ্ছা—ইয়ে—এর আগে থাকতেন কোথায় সেটা তো জানা হল না!’

‘সেটা জানার কি খুব বেশি দরকার? তাহলে আমার এই বত্রিশ বছর জীবনের বায়োডাটা আওড়াতে বসতে হয়। তবে এইটুকু বলতে পারি, গত ছ-মাস একটা হোটেলে থেকেছি। না না, পাঁচতারা হোটেলে নয়। নেহাতই গেরস্থ-পোষা হোটেল। তাও মামা-ভাগনে একখানা ঘরে। ‘ডবল-বেড’ ঘর চাই বলে যখন ভাগনেকে নিয়ে এসে ঢুকলাম, হোটেল মালিক তো বলে, ‘তবে যে বললেন ডবল-বেডরুম চাই।’ বললাম... তাতে কী হল? এই ছেলেটা কি মামার বিছানার একাংশে শুতে পারে না? আপনাদের হোটেলে সে-আইন নেই? তো মালিক ভদ্রলোক অবশ্য ‘না-না’ করে উঠে জানালেন, ‘সেসব কিছু না। তবে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীই আসেন কিনা।’ আমি বললাম, ‘জগতে কিছু কিছু অসাধারণও তো থাকেই।’...

‘তা ছিলাম মন্দ নয়। তবে ঘর যে পোষাচ্ছিল না। দৈনিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দিয়ে থাকা—’

ব্যাস! সেই গৌরাঙ্গ ভট্চাযের বাড়িতে এসে ওঠা!

ভাগনের সঙ্গে কথা বলবার সময়ই কানাই একটা ট্রে করে চা, অর্থাৎ প্রভু ও তস্য পোষ্যটির প্রাতরাশ নিয়ে এসে ঢুকল।... বগলে খান দুই খবরের কাগজ। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে দেবার আগেই, কৌশলে একটু হাতঝাড়া দিয়ে কাগজ দু-খানা মাটিতে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গেই পিলু প্রায় চিলের মতো ছোঁ মেরে কুড়িয়ে নিয়ে একখানা মামার কোলে ফেলে দিয়ে আর একখানা নিজের কোলে নিয়ে গুটিয়ে বসল!

সঙ্গে সঙ্গে প্রভাংশু কাগজের পাট খুলে হেডিংগুলোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতেই বলে উঠলেন, 'কানাইবাবু, আজ চায়ের সঙ্গে 'টা'টা কী?'

'আজ্ঞে বাবুমশায়রা একবার চোখ মেললেই দেখতে পাবেন।'

তা তাঁরা চোখ মেলে দেখেই পরম সন্তোষে 'খবর' এবং খাবারে কামড় দিয়ে—অর্থাৎ স্বাদ গ্রহণ করতে করতে বলেন, 'গুড'।

দেখা গেল চা টোস্ট ডিমসেদ্ধর সঙ্গে খানকয়েক আলুর চপ। একটি কামড় দিয়েই প্রভাংশু বলে ওঠেন, 'মনে হচ্ছে বাইরে কেউ এল?'

'এখান থেকেই বাইরেটা দেখতে পেলে তুমি?' বলল পিলু।

সঙ্গে সঙ্গেই দরজার বাইরে একটি গম্ভীর শান্ত স্বর ভেসে এল, 'ভেতরে ঢুকতে পারি?'

প্রভাংশু ভাগনের দিকে একটি বিজয় গৌরবপূর্ণ দৃষ্টি হানলেন। অর্থাৎ 'দেখলি তো'!

তারপরই বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়। চলে আসুন।'

পরক্ষণেই এক ভদ্রলোক এসে ঢুকলেন রীতিমতো কেতা দুরস্ত। এসেই বলে উঠলেন, 'ইস্, আপনারা খাচ্ছিলেন? আর আমি—'

প্রভাংশু মৃদু হাস্যে বলেন, 'তাতে কী? খাওয়াটা তো কিছু অপরাধ নয় যে কেউ দেখে ফেললে ভয় খেতে হবে! বসুন।'

সামনের চেয়ারখানা ইশারায় দেখিয়ে দিলেন।

আগন্তুক ভদ্রলোক ধপ করে বসে পড়ে বলে ওঠেন, 'আচ্ছা আপনি খেয়ে নিন। তারপর আমার বক্তব্যটি বলছি।'

প্রভাংশু বাকি চপটায় কামড় দিয়ে নিয়ে বলেন, 'বক্তব্যটা যখন আপনার, চালিয়ে যেতে দোষ কী! আপনার তো আর মুখ চলছে না? আর আমারও কানটা ঠিকই সজাগ আছে।'

ভদ্রলোক একটু অস্বস্তির চোখে পিলুর দিকে তাকালেন।

প্রভাংশু বললেন, 'নো প্রবলেম। ও আমার অ্যাসিসট্যান্ট।'

ভদ্রলোক হঠাৎ পকেট থেকে একটা লম্বামতো কাগজ বার করে সেটার ওপর চোখ ফেলে মৃদুস্বরে বলে চলেন, '১ নম্বর, গত পরশু রাত্রে আমার স্ত্রীর একটি গহনার বাক্স আমাদের বেডরুমের আলমারি থেকেই খোওয়া গেছে।

'২ নম্বর, বাইরে থেকে কোনো চোর-ডাকাত আসার কোনো সম্ভাবনাই নেই। দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে বেমালুম হাওয়া!

'৩ নম্বর, পুলিশে খবর দিইনি কেন? জানেন তো মশাই পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।... তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

এই সময় প্রভাংশু মৃদুস্বরে প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু আমার কাছে কেন? আমায় আপনি জানেন?'

'আমি জানি না, মানে জানতাম না। আমার শ্যালিকা নমিতা সিংহরায় বললো, আপনার কাছে চলে আসতে। ঠিকানাটাও সেই দিলো।'

'নমিতা সিংহরায়!'

প্রভাংশু অবাক হলেন, 'আশ্চর্য তো! আমি তো এ নামের কাউকে—'

'আরে মশাই, আপনি কী আর হেঁজিপেঁজি সব্বাইকে চিনে রাখতে যাবেন? আপনাকেই সব্বাই—'

মৃদু হাস্যে প্রভাংশু বলেন, 'ঠিক আছে, এখন বলুন আপনি কী আমার সাহায্য চান?'

'বিলক্ষণ! না চাইলে এলাম কেন? কাউন্ডলি যদি এখন আমার সঙ্গে, মানে সঙ্গে গাড়ি রয়েছে—'

প্রভাংশু পিলুর দিকে তাকান। অর্থাৎ 'তোর কী মত? এখনই'?

পিলুর মৃদু কণ্ঠ, 'আমার মনে হয়, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর হলেই ভালো হয়। একটানা কিছুটা সময় পাওয়া যাবে।

ভদ্রলোককে আর আলাদাভবে বলতে হল না। তিনি বলে উঠলেন, 'ভেরি গুড। আমারও তাই মনে হচ্ছে এখন তাহলে ওই দুপুরেই। আপনাদের লাঞ্চটাইম কখন?'

প্রভাংশু হেসে বললেন, 'আমাদের আবার টাইম! সেসব আপনাদের মতো কেজো লোকেদের জন্যে।'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'ছি ছি, এ-কথা বলবেন না। আপনারা হচ্ছেন সত্যিকার কাজের লোক। তাহলে বেলা দুটো-আড়াইটা নাগাদ গাড়িটা পাঠিয়ে দিচ্ছি?'

'ঠিক আছে।'

প্রভাংশু ওঁর উঠে দাঁড়াবার মুহূর্তে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা আপনার পুরো নামটি কী তা তো জানলাম না। এই কার্ডটা দিলেন বটে। কিন্তু—'

ভদ্রলোক ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলেন, 'আমার নামটা মশাই ঠিক এ যুগের উপযুক্ত নয়। তাই সাধ্যপক্ষে— ইয়ে নাম হচ্ছে সত্যনারায়ণ মিত্র।'

প্রভাংশু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'বলেন কী? সাধ্যপক্ষে লোকের সামনে বলেন না? এ নামের কী এ যুগ সে যুগ আছে? নামের তিনটে শব্দই দেখুন, 'সত্য', 'নারায়ণ', 'মিত্র'। তিনটিই মহৎ শব্দ। যুগে যুগে অমর। এই যে আমাদের নাম, আমি হচ্ছি 'প্রভাংশু গুহ', আর এ ? 'প্রলয় সমাদ্দার'। এর মধ্যে কোথাও কোনো মহত্ত্বের ছিটেফোঁটা আছে? বলুন?'

অতএব উভয়পক্ষেই হাস্য বিনিময়।

ভদ্রলোক চলে যেতেই প্রলয় বলে ওঠে, 'লোকটাকে যে হঠাৎ খুব 'আপ করে দিলে মামা? দক্ষিণাটা কিছু মোটা পাবার আশা করছো নাকি?'

'দূর ব্যাটা! রাম না হতেই রামায়ণ? কাজ উদ্ধার না করতেই কি দক্ষিণা নিই আমি? ওর নাম নিয়ে লজ্জা দেখে এত হাসিপেয়ে গেছলো যে হাসি চাপতেই তাড়াতাড়ি—। আরে একটু কথার ফুলঝুরি ছড়াতে পারলেই লোককে একটু আকৃষ্ট করা যায়, বুঝলি?'

'বুঝলাম! তবে আসল জায়গায় গিয়ে দেখো—তিনি তো আবার 'সিংহরায়'। 'সিংহবিক্রম' রায়বাঘিনী!'

'আরে সে তো শালিটা। সেই তো সব নয়। গহনা হারিয়েছে তো এনার গিন্নির—তাঁর নামটা যেন কী?'

'এখনও জানা যায়নি। তবে কিছু মিত্তির হবেই। কর্তা যখন—'

অতঃপর আর কী? তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করা।

ঠিক বেলা আড়াইটে বাজতেই বাইরে গাড়ির হর্ন বেজে উঠল।

পৌঁছতেও বেশি দেরি হল না। গাড়ির দূরত্বে খুব কাছাকাছি বলতে হয়।

গাড়ি গেটে ঢুকতেই তাকিয়ে দেখলেন দুই মামা ভাগনে। বিরাট ফ্ল্যাটবাড়ি। বলতে গেলে 'আকাশছোঁয়া'! ছবির মতো চেহারা। গেটে একজন দারোয়ান। গাড়িটাকে দেখেই গেট খুলে ধরলো!

গাড়ির ড্রাইভারও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ে 'স্যালুট' করে 'আসুন স্যার' বলে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো।

তারপর ঈষৎ এগিয়ে দিয়েই দেখিয়ে দিল—'নিকটের' দরজা!

'সোজা উঠে যান।'

' সোজা উঠে যা! কোন তলায়?'

'সাহেব লিফটের দরজাতেই অপেক্ষা করছেন।'

সত্যিই রটে।

লিফটে পা দেবার আগেই দেখা গেল স্বয়ং সত্যনারায়ণ মিত্র হাস্যবদনে দণ্ডায়মান।

ধড়ে প্রাণ এল।

তারপরই তো সাঁ করে ঊর্ধ্বমুখে।

কত তলায়? ঠিক বোঝা গেল না।

এসে নামতেই সত্যনারায়ণ বললেন, 'আমার ফ্ল্যাটটা পাঁচতলায়।'

'তবু ভালো! হঠাৎ বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটলে তো মরণবাঁচন অবস্থা!'

প্রভাংশু মৃদুস্বরে বললেন, ‘পিলু, তোর ফোঁড়নকাটা স্বভাবটা ছাড়বি?’

‘এই মুখে তালাচাবি!’

ফ্ল্যাটের দরজায় এসে বেল বাজাতে হলো না সত্যনারায়ণকে। খোলা দরজার সামনেই উদবিগ্ন-মুক এক মহিলা। কিছুটা বয়স্কা এবং একটু স্থূলাঙ্গী!

ফ্ল্যাটের মধ্যে ঢুকে এসে গুছিয়ে বসে প্রভাংশু বলে উঠলেন, ‘আমি কিন্তু প্রথমেই মিসেস মিত্রকেই জেরা করব। কারণ খোওয়া তো গেছে ওঁর জিনিসই।’

‘জেরা!’

অস্ফুট এই শব্দটি উচ্চারিত হল মিসেস মিত্রর কণ্ঠ থেকে। যাঁর নাম হচ্ছে ‘বিনতা’।

প্রভাংশু সকৌতুকে বলে ওঠেন, ‘তা জেরা বইকি। গোয়েন্দার জেরা পুলিশি জেরার ঠাকুরদা! তবে ভয় খাবেন না। ধীরে ধীরে জেরা করবে। এবং অবশ্যই পুলিশের মতো ধমক-চমক দিয়ে নয়।’

‘ঠিক আছে। করুন। তবে তার আগে একটু কোল্ডড্রিঙ্ক বা—’

‘না, না, ওসব কিছু দরকার নেই। অযথা সময় নষ্ট। এখন প্রশ্ন করে যাই, বলুন আস্তে আস্তে।’

এই সময় প্রভাংশু প্রলয়ের দিকে তাকান, মৃদু গলায় বলেন, ‘প্রলয়, তোমার পকেটের জিনিসটা ঠিকঠাক আছে?’

‘আছে।’

মিসেস মিত্র একবার ভাবলেন, ‘পকেটের জিনিস আবার কী রে বাবা!’

কিন্তু জিগ্যেস করতে তো পারেন না। তবে এখন নিজে প্রশ্ন করেন, ‘আচ্ছা আপনার হাতে তো নোট করে নেবার জন্যে কাগজ পেনসিল কিছু দেখছি না?’

‘লাগবে না! কী আর এত প্রশ্ন? মনে থাকবে।’

‘মনে থাকবে? বলেন কী?’

‘রাখতেই হবে। বারেবারেই তো দরকার হবে। কেন, আপনি স্কুলজীবনে ইতিহাস-ভূগোল মুখস্থ করেননি ঝাড়া দু'চার পাতা? আর আবৃত্তির জন্যে কবিতা?’

মিসেস মিত্র একটু হাসেন, ‘তা সত্যি।’

‘আচ্ছা—তাহলে প্রথম প্রশ্ন আপনি আগেই বলেছেন, মানে মিস্টার মিত্রর মাধ্যমে, শনিবার রাত্রে আপনি গহনাগুলি পরে একটা বিয়েবাড়িতে নেমন্তন্ন গিয়েছিলেন। কেমন?’

‘হুঁ।’

'ফিরেছিলেন অনেক রাতে, কারণ বড়োলোকের বাড়ির বিয়ে, দেদার লোক, হাজার-দু'হাজারের ধাক্কা। আর যেহেতু আপনি বন্ধু মানুষ তাই ফার্স্ট ব্যাচে খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসা ভালো দেখায় না। বিয়েটা দেখা উচিত বলে শেষ পর্যন্ত লাস্ট ব্যাচ।'

'বাঃ, ঠিক ধরেছেন তো! ঠিক তাই।'

'হতেই হবে, মহিলাদের সৌজন্যবোধের ব্যাপার তো যাই হোক, ফিরেছিলেন রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায়, কেমন?'

'ঠিক দেখিনি। তবে তাই হবে। খানিক আগে, গাড়িতে ওঠবার আগে ওদের ঘড়িতে এগারোটা বাজতে শুনেছিলাম।'

'ফিরে দেখলেন আপনার স্বামী তাঁর ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং আপনার ছোটোবোন মিসেস সিংহরায়ও পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দৈবক্রমে হঠাৎ সেই রাত্রেই আপনার বাড়িতে রাত্রিবাস করতে এসেছিলেন তিনি। তাই তো?'

'হ্যাঁ। ও সন্ধেবেলা হঠাৎ এসে পড়ে বলল, ওর বর ইয়ে— শোভন সিংহরায় সেদিন কোথায় যেন বাইরে যাচ্ছে, বোধহয় বাগাননে না কোথায়—বাগনানে নয় বেলুড়ে। সে যাক। সেইজন্যেই সে ভেবেছিল একা বাড়িতে ভালো লাগবে না, দিদির কাছে চলে আসি। রাতের খাওয়া সেরে রাতটা ঘুমিয়ে সকালে ফিরে যাবে। ততক্ষণে বর ফিরে আসবে, কিন্তু—'

'কিন্তুটা কী?'

'কিন্তুটা হচ্ছে সকালে বর ফেরেনি। নাকি কাকে দিয়ে জানিয়েছিল আজ তো রবিবার। ফেবার তাড়া নেই। এখানে একজনদের পুকুরে মাছ ধরবার জন্যে নেমন্তন্ন পেয়েছি, কাজেই ফেরাটা অনিশ্চিত।'

'মাছ ধরার শখ আছে বুঝি!'

'তা আছে। তবে ওই শখই আছে, ধরবার মুরোদ তো নেই। ফেরে তো খালি হাতে।'

'যা হয় আর কি! তা যাই হোক, তার মানে আপনার বোন রবিবারটাও রয়ে গেলেন?'

'হুঁ!'

'আদৌ ফিরলেন না?'

'না না, সে কী? বিকেলের দিকে চা-টা খেয়ে চলে গেল।'

'আচ্ছা আপনার ভগ্নীপতি ওই সিংহরায় না কী, উনি যদি ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরতেন, কী হতো?'

'কী হতো?'

'মানে দরজা খোলা পেতেন কী করে? ওঁর বাড়িতে তো কেউ নেই বলছেন?'

মিসেস মিত্র, অর্থাৎ বিনতা বলে ওঠেন, 'সে আর বলবেন না। কেউ নেই, আবার আছেও। সেকেলে সাবেকি বাড়ি, জ্ঞাতিগোত্তর ঢের। পার্টিশান দিয়ে দিয়ে বসবাস। সদর দরজা এক।'

'আচ্ছা, ওনার বাচ্চাটাচ্চা?'

'নাঃ, নেই। তাই তো যখনতখন ছুটে ছুটে আমার কাছে চলে আসে। অথচ আমারই-বা কী? একটা ছেলে। সেও তো এখানে থাকে না। দার্জিলিঙে পড়ে।'

'সে কী? একটিমাত্র ছেলে, তাকে—অবশ্য এটা আপনাদের পার্সোনাল ব্যাপার, জিগ্যেস করা অন্যায়, তবু, মানে—'

'না, না, অন্যায়ের কী আছে? আত্মীয়স্বজন সকলেই ওই কথা বলে। আসলে কী জানেন? এই 'সাততলা' ফ্ল্যাটবাড়িটায় পরিবেশ তেমন সুবিধের নয়। ঠিক আমাদের ঘরের সঙ্গে খাপ খায় না। তা ছাড়া পড়াশুনোয়ও মন বসে না—'

'ঠিক আছে। বুঝেছি, বুঝেছি। তো তাহলে বোন রবিবার বিকেলেই চলে গেলেন। তবে দুপুরটা মিস্টার মিত্র ও আপনি এবং বোন খুব মজলিশ করে কাটালেন?'

মিস্টার মিত্র? হায় কপাল! ওনার 'সানডে ক্লাব' নেই? সেখানে সবাই জোড়া জোড়া তাস নিয়ে ওনার পথ চেয়ে বসে থাকে না? উনি বিহনে নাকি অন্ধকার। আর আমার বোন? সে তো সারাক্ষণ গাদা গাদা উলের গোলা আর ওর সেই প্রাণতুল্য দুটো কাঠি নিয়েই কাটিয়ে গেল। তাই নিয়েই বেড়াতে এসেছিল। যখন যেখানে যাবে, সঙ্গে ওই উলের গোলা আর দুটো কাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে বুনছে, চলতে ফিরতে, কথা বলতে বলতে বুনেই চলেছে। আমি একাই ঘুমিয়ে মলাম। তারপর চায়ের সময় উঠে—'

'এত বোনেন কার জন্যে?'

'কার জন্যে নয়?' অথবা কারুর জন্যেই নয়। আসলে নেশা। বলে, 'না বুনে থাকতে পারি না।' তবে বুনে সারাবছর ধরে নানা ব্যাপারে একে ওকে উপহার দিতে-টিতে কাজে লাগে। ওটা কিছু না। আসলে নেশা।'

'তা বটে। আচ্ছা ওঁর ওই উলের গোলার ঝোলার মধ্যে আপনার বাড়ির কিছু ভুলে চলে যায়নি তো?'

'আমার বাড়ির? কী যাবে?'

'মানে ধরুন সেই গহনার প্যাকেটটা—'

'ওঃ। কী অ্যাবসার্ড কথা!'

বলে মিসেস মিত্র একদম ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে মুখে সোফার পিঠে গা হেলান দেন।

'কী হলো?'

মিস্টার মিত্রও তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'কী হলো?'

'নাঃ, কিছু না। হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে গেলো।'

'এরকম হয় নাকি?'

'কই না তো, কখনও তো কই—'

'তাহলে হয়তো লাঞ্চের পরই একটু বিশ্রাম না করে এভাবে বসে থেকে—আচ্ছা ওনাকে ছুটি দিচ্ছি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই— আচ্ছা যে-সোনাটা খোয়া গেল কতো ভরি আন্দাজ?'

'কত ভরি?'

মিস্টার বলেন, 'আমি তো ঠিক জানি না, হ্যাঁগো, কত ভরি?'

মিসেস প্রায় নিমীলিত নয়নে আস্তে বলেন, 'ভরি পনেরো-ষোলো। আসলে যতো সব পরে গিয়েছিলাম সবই তো আসল নয়! বেশ কিছু ভেজালও ছিল তার সঙ্গে।'

'ওঃ। তাহলে বলছেন গহনাগুলোয় দু'রকম মিশেল ছিলো? তা গুলিয়ে ফেলেন না?'

'কী যে বলেন? একসঙ্গে রাখি নাকি? নকলগুলো একটা সিল্কের রুমালে-টুমালে জড়িয়ে খোলা ড্রয়ারের মধ্যে ফেলে রাখি। সিল্কের মধ্যে রাখলে ভালো থাকে।'

'আচ্ছা, ইয়ে—তাহলে আপনার বোনের বাড়িটায় একবারের জন্যে যেতে পারি? মানে তিনিও যখন শনিবার রাত্রে ছিলেন এখানে, তাতে প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট একটা মিলতো!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, যান না। এই তো গাড়ি মজুতই আছে।'

বলেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন মিসেস মিত্র। বোঝা যাচ্ছে, শুয়ে পড়ার জন্যে মন আনচান করছে।

অতঃপর আর কী। মামা-ভাগনেয় সাঁ করে লিফটে নেমে, গাড়ি চড়ে বোঁ করে মিসেস সিংহরায়ের বাড়িতে।

তখন মিসেস কী যেন করছিলেন, কাঁধে একটা ঝোলা, হাতে দুটো বোনার কাঠি। তাড়াতাড়ি কাঠি দুটো ঝোলায় ফেলে বললেন, 'আপনারা?'

প্রভাংশু তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নিজের কার্ডখানা এগিয়ে দেন। আর বলেন, 'আপনার দিদি ফোনে জানাননি?'

'ফোনে? না, ইয়ে ফোনটা আজ কাজ করছে না! তো আপনারা, কী চান?'

'তেমন কিছু না। আপনার বাড়িটা একটু সার্চ করতে চাই।'

'আমার বাড়ি? সার্চ? আপনাদের কী ধারণা দিদির গহনাগুলো আমি চুরি করে

নিয়ে পালিয়ে এসেছি?'

'দেখুন কিছু মনে করবেন না। গোয়েন্দাদের ধারণার ধরনটা একটু অদ্ভুত।'

মিসেস সিংহরায়ের লালচে মুখটার দিকে তাকিয়ে প্রভাংশু বলেন, 'আপনি এটাকে অপমান বলে গণ্য করবেন না। এটাই আমাদের পেশার নিয়ম। প্রথমে সকলকেই সন্দেহ করতে হয়। এমনকী আপনার দিদিকেও সন্দেহ করেছি—'

'কী? দিদিই নিজের গহনাগুলো চুরি করে সরিয়ে ফেলে হুল্লোড় তুলেছে 'চুরি গেছে' বলে, বাঃ। চমৎকার।'

'যা বলেছেন। চমৎকারই। নিজেই নিজেকে বাহবা দিই। আচ্ছা সারাক্ষণ ওই দুটো কাঠি নিয়ে যে আপনি কী করেন! দেখি তো। কাইন্ডলি কিছু মনে করবেন না। একটু কৌতূহল হচ্ছে, এমন কী ব্যাপার।'

'ব্যাপার কিছুই না, প্রায় সব মেয়েরাই করে। আপনার বাড়িতে বুঝি—'

'নাঃ, ও গুড়ে বালি। 'আমার বাড়ি' বলতে শুধু আমি আর ওই ছেলেটা।'

ততক্ষণে মিসেস সিংহরায় অর্থাৎ নমিতা, তার ঝোলা খুলে টেনে বার করে ফেলেছে দুটো কাঠিগোঁজা একটা আধবোনা পুলোভার। তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে একখানা গোলাপি রঙের সিল্কের রুমাল। বেশ বড়োসড়ো।

'এটা?'

নমিতা তাড়াতাড়ি বলে, 'ওটা কিছু না। আসলে আমার একটু কাশির ধাত বলে রাতবিরেতে বেরোতে হলেই গলায় একখানা রুমাল জড়াই। সর্বদাই সঙ্গে রাখি। কিন্তু—'

হঠাৎ যেন স্বগতোক্তি করে, 'এটা কী হলো? আমারটা কী হল!'

'কিছু বলছেন?'

'নাঃ, আপনাকে কিছু বলছি না—'

বলে নমিতা রুমালখানা একবার সবটা টেনে বার করে ঝড়ে। তারপর আবার ঝোলায় ভরে রেখে বলে, 'ও কিছু না। তা আপনারা চলে যাচ্ছেন? সার্চ না কী করবেন বললেন?'

প্রভাংশু তাড়াতাড়ি বলেন, 'মাপ করবেন, ওটা এখন থাক, মিস্টার বাড়ি নেই, আমাদের ঢুকে পড়াটা 'অনধিকার প্রবেশের' পর্যায়ে পড়বে। পরে হবে একদিন।'

'কিন্তু বাড়িতে এলেন। অন্তত এক কাপ চা—'

'ওটাও থাক। সেইদিনই হবে। মিস্টার সিংহরায়ের সঙ্গে জমিয়ে বসে। আচ্ছা—'

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ে প্রলয় যেন পা-টা ঘষটে ঘষটে দরজার দিকে এগোচ্ছে।

নমিতা বলে, 'আপনার ওই অ্যাসিসট্যান্টটির পায়ে কী হল বলুন তো? কিছু ফুটে-টুটে গেল না তো?'

পিলু ততক্ষণে দরজার বার। বলে ওঠে, 'না, ফোটেনি কিছু। মানে—'

প্রভাংশু বলে ওঠেন, 'ওঃ, তোর সেই চিরকেলে ব্যাপার? পায়ের শির টেনে ধরা। কিছু না মিসেস সিংহরায়, বেশিক্ষণ ফিতে-বাঁধা জুতো পরে থাকলেই ওর ওইরকম হয়। অথচ বাইরে তো আর চটি পরে—যাকগে, গাড়িতে উঠে পড়ে জুতোটা খুললেই ঠিক হয়ে যাবে—'

বলে চটপট পিলুকে প্রায় ঠেলেই নিয়ে গিয়ে দু-জনে গাড়িতে উঠে পড়েন।

গাড়িতে নীরবতা।

স্টিয়ারিং হাতে মিস্টার মিত্রর ড্রাইভার।

অতঃপর আবার নিজের বাড়ির দরজায়। আদবকায়দা জানা ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দরজা খুলে ধরে আরোহীদের ধীরেসুস্থে নামতে দেয় এবং তারা বাড়ির দরজার মধ্যে ঢুকে পড়লে সেলাম জানিয়ে বিদায় নেয়।

প্রভাংশু ঘরে ঢুকে পড়েই দরজাটায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে সোফায় বসে পড়ে পিলুর পিঠটা ঠুকে দিয়ে বলে ওঠে, 'জীতা রহো বেটা। সাব্বাস! ওঃ। পায়ের শির টেনে ধরার অ্যাকটিংটা যা করলি! সিনেমাস্টারেরা কোথায় লাগে। তা দেখি তার বদলে পেলিটা কী?'

'তা জানি না মামা! হয়তো কিছুই পাইনি। সবটাই ফোক্কা। হয়তো শুধু 'আশার ছলনে ভুলি—' এই যে দ্যাখো।' বলে হাতের মুঠো থেকে একটুকরো চিরকুট বার করে মামার হাতে দেয়।

মামা এস্তেব্যস্তে সেটি খোলেন। এবং একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই ভুরুটা কুঁচকে একবার দু'বার তিনবার বারবার পড়তে থাকেন। আর ক্রমেই মুখটা আলোয় ভরে ওঠে!

'কী দেখলে মামা?'

'দেখলাম? আসামীর নাম-ধাম সব।'

'আসামির নাম-ধাম লেখা রয়েছে ওতে?'

'স্পষ্ট পরিষ্কার। নাম শ্রীমতী বিনতা মিত্র—'

'আসামি শ্রীমতী মিত্র?'

'নির্ঘাত। এই দেখ কী লেখা রয়েছে এতে?'

প্রলয় ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখে। দেখে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রয়েছে, 'মিতা, এতদিনে জানলাম তোর বর ছাঁটাইয়ের কাঁচিতে পড়ে আজ তিন মাস বেকার। আর লোকসমাজে মুখ রাখতে, টাইমমাফিক ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে 'অফিস যাচ্ছি, অফিস যাচ্ছি' খেলা করে সারাদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছে! তাও বন্ধুবান্ধব বা চেনা লোকের ধারেকাছে নয়। হয়তো বেলুড় মঠে, নয়তো দক্ষিণেশ্বরে, কী বোটানিকালে। আহা,তুই কী? আমি তোর

দিদি নয়? আমায় একবার জানাবি তো চুপিচুপি! কী তাহলে তোর বরের মানের হানি হবে? তোর মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে দিলাম। এই সিল্কের রুমালটায় বেঁধে তোর বরের জন্যে চারটি 'ঝুরিভাজা' পাঠালাম, এখুনি খুলে দেখবি। এবং শোভনকে দেখাবি। ঝুরিভাজার ওজনটা বোধ হয় পনেরো-ষোলো ভরি হবে। দাম এ বাজারে কোনো না— ষাট-পঁয়ষট্টি হাজার! সেটাই মূলধন করে তোর বরকে বলিস একটা যা হোক তা হোক বিজনেসে নেমে পড়তে। এ বাজারে আর ওই বয়সে আবার চাকরি কোথায় পাবে? দিচ্ছেই বা কে? তোর উলের গোলার থলির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলাম। ঝুরিভাজাগুলো, দেখিস যেন আবার ঝেড়ে ফেলে দিস না। খবরদার, অন্যথা করবি না। দিদি।'

'মামা! ঝুরিভাজা!!'

'হ্যাঁ, 'চুড়িবালা মানতাসা' নাকি সব হ্যানোত্যানো—'

'এইভাবে নিজের জিনিস নিজে চুরি করে পাচার?'

'সেই তো! অন্ধ স্নেহের বশে আর কি!'

'তাহলে? কী করবে এখন!'

'কী আর করব! নিজেরাই সন্ধে নাগাদ একখানা অটোয় চেপে অভিযানে বেরোব। মিস্টার মিত্রকে বলব, আসামি আপনার বাড়িতেই হাজির। ইচ্ছে করলে থানা-পুলিশ করতে পারেন, সে-ইচ্ছে না করলে বেকসুর খালাস দিয়ে দেবেন। মনে হয় শেষটাই বেছে নেবেন!'

অতএব অভিযানে বেরোনো এবং যথারীতি অভিনয়।

মিস্টার মিত্র বিহ্বলভাবে একবার গোয়েন্দা গুহর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'কী হবে?'

'কী আর হবে? বললাম তো, শাস্তিটা আপনার হাতে।'

'শাস্তি দেওয়া সম্ভব?'

'অসম্ভব হলে তো পড়েই আছে। বেকসুর খালাস।'

মিস্টার মিত্র মিসেসের মুখের দিকে তাকান। দেখেন সে মুখে যেন রক্তের ছিটে মাত্র নেই, বাসি ফুলের মতো ফ্যাকাসে।

ধীরে বলেন, 'আমায় একটু জানাওনি কেন? অকারণ 'চুরি গেছে, চুরি গেছে' বলে ঢেউ তুলে কেন এই লোক-হাসানো?'

মিসেস মিত্রের মাথাটা ঝুঁকে পড়ে, ক্ষীণস্বরে উচ্চারিত হয়, 'লোকলজ্জায়।'

'বোকামি! ধুয়োটা না তুললে তো লজ্জার প্রশ্নই উঠতো না।'

মিসেসের মাথাটা আরো ঝুঁকে পড়ে, 'তাহলে ব্যাঙ্ক লকারে কী রাখতে পাঠাতাম? তুমি তো তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিলে—'

মিস্টার মিত্র ম্লানভাবে বলেন 'আমায় খুলে বললে কিছুই হতো না। আসলে

লজ্জা ঢাকতে গিয়ে লজ্জার একশেষ। যাক, মিস্টার গুহ, আপনার কাছে তো সবই ধরা পড়ে গেছে, এখন কী করবো?'

'কী আর করবেন? আমায় বিদায় দিন।'

'বিদায় দেবো? আপনার দক্ষিণাটা?'

'ওঃ, সেই একটা কথা হয়ে আছে বটে, তাই না? আসামিকে ধরে দিতে পারলে দক্ষিণা নেবো। বেশ দিন যা ইচ্ছে।'

মিস্টার মিত্র উঠে গিয়ে ব্যাঙ্কের চেক বইটা নিয়ে আসেন। একটা ব্ল্যাঙ্ক চেক কেটে প্রভাংশুর দিকে এগিয়ে ধরে বলেন, 'যা ইচ্ছে আপনিই বসিয়ে দিন।'

'মানে?'

'মানে আর কী? বললাম তো আপনার যা ইচ্ছে।'

'আর আমি যদি আপনাকে সর্বস্বান্ত করে দিই?'

'দিলে দেবেন।'

'তাহলে তাই দিই।' বলে প্রভাংশু একটি দু'হাজারের অঙ্ক বসাল।

'অ্যাঁ, মাত্র দু-হাজার? না না, ছি ছি, এ কী? এ হয় না।'

প্রভাংশু বলেন, 'এই ঠিক। দেখুন এই কেসটায় আমার তো একটি পয়সাও খরচ হয়নি, এমন কী একটু বেশি সময়ও নয়। বলতে গেলে দেবপ্রেরিত হয়ে সব হাতে এসে গেছে। সর্বদা আপনার মারুতি চেপে যাতায়াত। এবার ওই থাক। এর পরে আবার দেখা যাবে। এক মাঘে তো শীত যায় না।'

'তার মানে? বলছেন আবার চুরি হবে?'

'আহা, তা কেন? জোচ্চুরিও তো হতে পারে। আপনার কর্মস্থলে যাদের সব নিয়ে কাজ চালান, তারা সবাই নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠির নয়।'

'ওঃ, সে আর বলতে? সবাই ভাব দেখান যেন এক একখানি যুধিষ্ঠিরের অবতার। কী বলব মশাই, আমার তো অর্ডার সাপ্লাইয়ের বিজনেস, তো চোখের সামনে পুকুর চুরি হয়ে যাচ্ছে, চোখ বুজে থাকতে হচ্ছে। চোখ খুললেই সবাই একযোগে 'স্ট্রাইক' হাঁকবে।'

'হুঁ। তাই বলছি ওসব ক্ষেত্রেও কখনও কখনও শখের গোয়েন্দাদের দিয়ে মুশকিল আসান হতে পারে। ঠিকানাটা রাখবেন।'

আবার সেই মিত্রসাহেবের গাড়িতেই নিজের বাড়িতে। দরজায় নেমেই ড্রাইভারকে 'থ্যাঙ্কু' দিয়ে বিদায় দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েন প্রভাংশু।

আজ তো তিনি একাই গিয়েছিলেন। কারণ আজ টি.ভি.-তে তখন 'টেস্ট ম্যাচের' সরাসরি 'শো' ছিল। পিলুর পক্ষে টি.ভি.-র সামনে থেকে নড়া অসম্ভব

ছিলো তখন।

এখন সাময়িক বিরতির ক্ষণ। ঠিক সে সময়েই মামার আবির্ভাব। পিলু চিৎকার করে ওঠে, 'মামা, দারুণ সুখবর, ইন্ডিয়া জিতছে—'

মামা বলে ওঠেন, 'ওঃ। তাহলে তো তোর আজ একটা পরম প্রাপ্তির দিন। তো আমিও তোকে একটা সুখবর দিই। এই দ্যাখ তোর জীবনের প্রথম নিজের রোজগারের টাকা।'

বলে সেই চেকটা বাড়িয়ে ধরেন ভাগনের দিকে।

পিলু বিমূঢ়ভাবে বলে, 'আমার নিজের রোজগারের মানে?'

'বাঃ। তোর নয়? ওই মিত্রসাহেবের বাড়ির কেসটা তো আগাগোড়া তোর বুদ্ধিকৌশলে ফয়সালা হল। ওঃ, পায়ের শির টেনে ধরার যা একখানা পোজ দিয়েছিলি! একেবারে মারকাটারি।'

'তাই বলে আমি— মানে আমাকে—'

'হ্যাঁরে হ্যাঁ। নে হাতে করে একবার। শোন, এতে তোর পরম সাধের একটা 'রুম হিটার' হবে।'

'রুম হিটার? তা তো হতেই পারে! কিন্তু মামা, ওটার কি খুব বেশি দরকার?'

'আরে 'ভীষণ দরকার' বলে তো মরছিলি।'

'কিন্তু এখন ভাবছি শীত তো আর মাত্র ক-টা দিন। তারপর তো সে জিনিস তোলাই থাকবে। তার থেকে বরং ওই টাকাটা দিয়ে ভেবেচিন্তে সর্বদা কাজে লাগে এমন কোনো জিনিস যদি—'

'সে তোর যা ইচ্ছে। মোট কথা টাকাটা তোর। তুই ইচ্ছেমতো খরচা করবি। যাকগে, এখন তো মৌজ করে এক কাপ করে চা খাওয়া হোক। কী বলিস? রাজি?'

'খুব, খুব। ইয়ে—কানাইদা—'

'ওরে, সে আর বলতে হবে না, মনে হচ্ছে আমায় দেখেই চায়ের জল চাপানা হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা মামা, তাহলে সিংহরায়দের বাড়ি সার্চ করাটা বাতিল?'

'তাতে আর দরকার নেই। সার্চ করলে তো নিশ্চিত পাওয়া যেত। তবে ফরনাথিং ভদ্রমহিলাকে অপদস্থ করা। ও মহিলাটি তো কোনো দোষে দোষী নয়।'

'তা ঠিক, ভারি চমৎকার মহিলা ঐ মিসেস মিত্র।'

'দেখছিস তো মানুষের মধ্যে কত চমৎকার মানুষও থাকে।... কই হে কানাইবাবু? স্রেফ চা কিন্তু, 'টা-ফা' নয়।'

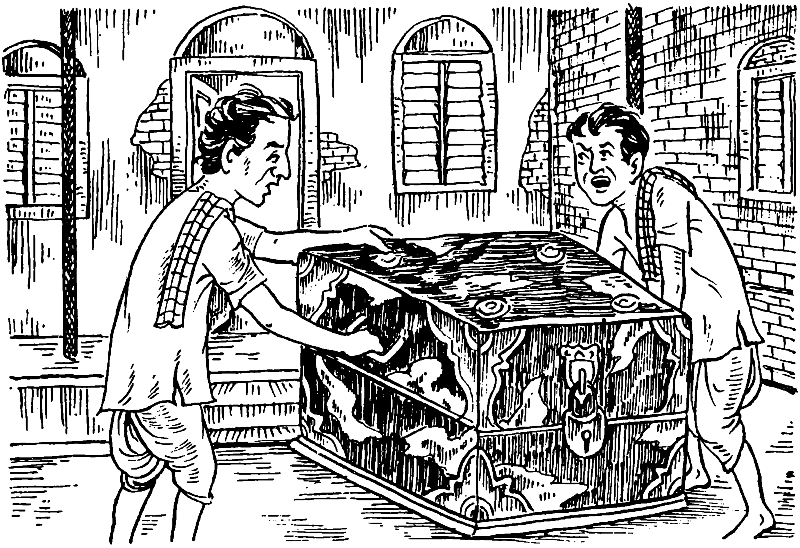

মার্ডার কেস

সেই কোন কাল থেকে ট্যাপার মনে একটি বাসনা— হাতে কিছু পয়সা হলে ট্যাপারা দুই বন্ধু নগদ এক-এক টাকার বাদামভাজার ঠোঙা কোলে করে একটি গদিদার রিকশায় চেপে বসে কলকাতা ভ্রমণ করবে।

ইচ্ছেমতন চারদিকে বাদামের খোলা ছুড়ে ছুড়ে ফেলবে, আর মধ্যে-মধ্যে রিকশা থামিয়ে থামিয়ে ফুচকা খাবে, চায়ের দোকান থেকে চা খাবে, ডাবওলা দেখতে পেলে রিকশা থামিয়ে ডাবের মুখ কাটিয়ে খড় দিয়ে চুষে চুষে ডাবের জলটুকু শুয়ে বার করে নেবে।

শহর কলকাতার মধ্যে তো আর সাইকেল-রিকশার চলন নেই, সবই মানুষ-টানা, কাজেই মাঝে মাঝে তো বদলাতেও হবে রিকশা। তখনই এক-একবার কিছু খেয়ে নেওয়া যাবে।

সাধটা প্রধানত ট্যাপার হলেও মদনাও অরাজি ছিল না এই পরিকল্পনায়। তা তখন তাদের কাছে এই পরিকল্পনাটি তো প্রায় পরির কল্পনা। তখন তো ট্যাপা-মদনাকে পঁচিশ পয়সার বাদামভাজা দু-জনায় ভাগ করে খেতে হতো। আর তাই হতো বলে, বাদামভাজাওলাটার কাছ থেকে দু-জনে আলাদা আলাদা

করে নুনলঙ্কার গুঁড়ো চেয়ে নিয়ে নিয়ে সংগ্রহ করত যাতে বাদাম ফুরিয়ে গেলে ওই 'ঝালনুন' নামের মনোহর জিনিসটি একটু একটু চেটে চেটে আরও কিছুক্ষণ জিভটা তাজা রাখা যাবে।

তা তখন আর এ ছাড়া কী হবে? তখন তো 'আয়'-এর মধ্যে গজ-উকিলের বাড়ির বিনিমাইনের চাকরিতে শুধু হাত-খরচা বাবদ দু-বন্ধুর মিলিয়ে দৈনিক চার আনা পয়সা। তাই দিয়ে যা করতে পারো করো।

গজ-উকিল বলেছিলেন, 'বে-খাটুনির চাকরি, দু-বেলা ক'ঘণ্টা বসে-বসে শুধু দাদা-খেলা দেখা। তার বদলে দু-বেলা আশ মিটিয়ে পেটপুরে চর্বচোষ্য খেতে পাচ্ছিস। মাইনে কী জন্যে? অ্যাঁ? মাইনে আবার কী? খাবার জন্যেই তো টাকার দরকার, তো খেতেই যখন পাচ্ছিস, তখন আর কী? তবে হ্যাঁ, 'কাঁচির কারবারটি আর নয়। নাকে-কানে খত দিয়ে ছেড়েছ, মনে আছে তো?'

কিন্তু ট্যাঁপা আর মদনা নামের দুটো মুখুসুখ্যু ছেলে হঠাৎ গজ-উকিলের প্যাঁচে পড়ে গেছিল কেন?

সে অনেক কথা। বিশদ বলতে বসলে মহাভারত।

ছেলে দুটো আচমকা একটা ফেরে পড়ে গিয়ে 'গজ-উকিলের হত্যা-রহস্য' ভেদ করে ফেলেই পড়ে গেল 'নিহত' গজ-উকিলের গাড্ডায়। তারপর...যাক গে বললাম তো সে অনেক কথা। মোট কথা গজ-উকিল বলেছিলেন, 'তোদের এমন ব্রেন, সেটাকে অপচয় করছিস লোকের পকেট কেটে বেড়িয়ে। ইস, এমন ব্রেন নিয়ে দাবা-খেলাটা শিখে ফেলতে পারলে, দেশের কল্যাণ, দশের মঙ্গল জগতের হিত। একটা ভালো দাবাড়ু পৃথিবীর সম্পদ। তো এ তো আবার একটা নয়, দু-দুটো। একেবারে জোড়ামানিক।'

কিন্তু বেচারি ছেলে দুটোর বে-খাটুনির চাকরি বজায় রাখতে রাখতে হাতে-পায়ে খিল, মনমেজাজ বোদা বিস্বাদ। মাথা ঝিম! অতএব একদিন চম্পট।

তারপর তো কত পাকচক্র। কত পট পরিবর্তন। ভাগ্যের কত খেল।

ভাগ্যে থাকলে কী না হয়? তা নইলে খবরের কাগজে ট্যাঁপা-মদনার নাম বেরোয়? ওদের ফোটো তোলানো হয়? এবং কাগজে সেই ছবিও ছাপা হয়? সেই যে সেবার 'সোনার ইঁট'-এর ব্যাপারে? তো, সেসব তো গত কথা।

তারপর?

তারপর থেকে তো কত কত অবিশ্বাস্য সব ঘটনা ঘটে গেল নেহাত হতভাগা দুটো ছেলের জীবনে। ট্যাঁপা বলত 'জেবন'। মদনা বকে বকে ছাড়িয়েছে, বলতে গেলে গাধা পিটিয়ে প্রায় ঘোড়া করে তুলেছে মদন।

কিন্তু মদনকে কে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া থেকে মানুষ করে তুলেছে?

সেও তো অনেক কথা। সেসব কথা যাক। আসল কথা এই, ইতিমধ্যে ট্যাঁপার ওই তুচ্ছ বাসনাটুকু মেটবার অবস্থা যে না হয়েছে, তা নয় অনেক দিনই হয়েছে। কিন্তু মেটানোটা আর হয়ে ওঠেনি।

হয়ে ওঠেনি, কতকটা ঘটনাপ্রবাহের স্রোতের ধাক্কায়, কতকটা-বা মদনার গাফিলতিতে। ট্যাঁপা যখনই তাড়া দিয়েছে, তখনই মদনা বলেছে, 'হবে, হবে! তাড়া কী?'

ট্যাঁপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে।

আর আজ?

আজ কিনা ট্যাঁপা 'আর কবে হবে রে মদনা' বলে যেই দীর্ঘশ্বাসটি ছেড়েছে, মদনা হেসে উঠেছ বলল কিনা, 'রিকশা চেপে তুই ক-দিনে কলকাতা ভ্রমণ সাঙ্গ করবি রে ট্যাঁপা-মানিক? তার থেকে আয় বরং একটা ট্যাক্সিকে ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া করে হোল ক্যালকাটাটা চক্কর মেরে আসা যাক।'

ট্যাঁপা ধিক্কারের গলায় বলল, 'এতকাল পরে এই কথা? হাওয়া-গাড়িতে চেপে 'হুশ' করে হাওয়ায় ভেসে ভেসে, বড়ো রাস্তায় বড়ো রাস্তায় চক্কর মারাটাকে 'ভ্রমণ' বলে? রেশকোয়...ইয়ে তো গে রিকশাগাড়ি চেপে চাদ্দিক দেখতে দেখতে যাব, মন হলে গলিঘুঁজিতেও সেঁদিয়ে যেতে পারব, মানুষজন দোকানপাট দেখতে দেখতে হয়তো কত জ্ঞান সঞ্চয় হবে, তার কাছে তোর টেসকি-গাড়ি... ইয়ে...ট্যাক্সিগাড়ি? দুর! তো ট্যাক্সি কেন, যেভাবে চড়চড়িয়ে উন্নতি হতে লেগেছে, দু'দিন বাদে তোর নিজের মটরগাড়ি চেপেই তো...'

'শুধু আমার?' মদন রাগের গলায় বলল, 'এ-কথা বললি যে?'

'আহা ওই আর কী! কথার কথা। তোর মানেই আমার! তার মানেই আমাদের। তো ভাগ্যে থাকলে হয়তো এরপর আমরা সেই তোর ফেলুদার মতন উড়োজাহাজে চেপে এবেলা-ওবেলা দিল্লি-বোম্বেও করতে পারি। কিন্তু চিরকালের এই বাসনাটি তো অপুন্নো থেকে যাবে? ক্রেমোশো তো আমরা আর ট্যাঁপা-মদনাও থাকছিনে। এখনই হতে হয়েছে টি.সি. পাল আর এম. দাস! তা হলে? বেচারি ট্যাঁপা হতভাগার জন্যে আমার মন কেমন করে রে মদনা! এত হচ্ছে, কিন্তু 'তুচ্ছু'...ইয়ে...তুচ্ছো একটু সাধ আর মিটল না অভাগার!'

'সেরেছে!' মদনা হো-হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, 'তবে নে বাবা, ডাক তোর একখানা রেশকো! দেখি ক'দিনে তোর কলকাতা ভ্রমণ হয়।'

এখন ট্যাঁপা রেগে বলে, 'আমার? আমি একা ঘুরব?'

'কী মুশকিল! তাই বলেছি নাকি! ও তো একটা কথার কথা! তবে ভাবনা হচ্ছে ওভাবে বাদামের খোলা ছড়াতে ছড়াতে আর ডাব, আইসক্রিম, রাস্তার দোকানের চা খেতে খেতে বেড়ালে, কেউ না আবার চিনে ফেলে।'

ট্যাঁপা আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। বলে, 'ওই তো, বিখ্যাত হবার জ্বালাই তো ওই! নিজের ইচ্ছেমতন কিছু করার যো নাই, সাধারণ মানুষের মতন রাস্তার দোকানে চা শরবত খাওয়া, ফুচকা খাওয়া, এসব দেখলে তো...'

'সেই তো ভাবনা।'

ট্যাঁপা রাগ-রাগ অথচ উদাস গলায় বলে, 'যত দিন যাবে, ভাবনা ততই বাড়বে। যতই তুই ভি. আই. পি. হবি, ততই অবোস্তা মার্ডার কেস হয়ে উঠবে।'

'মার্ডার কেস মানে?' মদনা ভুরু কোঁচকায়।

'তো মার্ডার কেস নয়ই বা কেন? বিখ্যাত হলে তুই আর মদনা থাকবি? তখন শুধু এম. দাস।'

'সে তো তুইও!' মদনা রাগের গলায় বলে, 'তুইও তখন শুধুই টি.সি. পাল।'

'তার মানে ট্যাঁপা আর মদনা নিহত!'

মদনা হতাশ গলায় বলে, 'তুই বলতে চাস কী বল তো? উন্নতি না হওয়াই মঙ্গল?'

'আহাহা...'ট্যাঁপা জিভ কাটে, 'তাই কি আর বলতেচি?'

'বলতেচি নয় ট্যাঁপা বলছি।'

'ওই হল। একই কথা! উন্নতি না হোক, এ-কথা বলছি না। বলছি, যত বিখ্যাত হবি তুই, ততই জ্বালা-দুর্দশা বাড়বে। সহজ মানুষের মতন যা ইচ্ছে করতে স্বাধীনতা পাবিনে। পয়সার অভাবে জন্মোভোর যা করতে পারিসনি, পয়সা হলে সে-সব করতে গেলেই দেখবি বিপত্তি। বাজার থেকে একজোড়া গঙ্গার ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে রাস্তায় নাবলে ভিড় জমে যাবে। চাদ্দিক থেকে ফটাফট ফটাফট ফোটো উঠে যাবে। সে-ফোটো ঝটাপট খপরের কাগজে বেরিয়েও যাবে। বল যাবে কি না? রেলগাড়ির থাড্ডো কেলাসে চেপে মাটির ভাঁড়ে চা, কিম্বা রেলগাড়ির ফেরিওলার ঝালমুড়ি, বুলবুলভাজা, কচি শশা, হজমি দানা খেতে খেতে নিশ্চিন্দি হয়ে চলতে পারবি? পারবিনে। সব্বোদা ভয়ে কাঁটা, ওই বুজি কে চিনে ফেলে। তবে? স্বস্তি আচে? মেয়েছেলেও নয় যে স্টারদিদিমণিদের মতন পাবলিকের আমলে বেরোতে ঘোমটা টেনে বেরোবি।'

মদনের ভুরু আরও কুঁচকে যায়, 'আমরা স্টার?'

'তা না হোস, একালে বিখ্যাত সক্কলেরই স্টারের জ্বালা। যেখানে যাবি, পাব্‌লিক চিনতে পারলেই ভিড় জমে যাবে। ফোটো উঠে যাবে।'

'এত কথা তুই শিখলি কোথা থেকে রে ট্যাঁপা?'

'দেখতে দেখতেই শেখা রে মদনা! কী থেকে কী হয়েছি আমরা, ভেবে

দ্যাখ! ছিলুম পকেটমার, হয়ে পড়লুম শখের গোয়েন্দা। আকাশ পাতাল। তো এই এতটা রাস্তা আসতে কম তো দেখছি না। ক্রেমোশো আরও দেখব! পেটে বোমা মারলে ক-অক্ষর বেরোত না, এখন বই-কাগজ পড়চি। এরপর যখন ফেলুদার মতন উড়োজাহাজ চেপে দিল্লি-বোম্বে করে মার্ডার কেস-এর ফয়সালা করতে যাব, তখন হয়তো ইনজিরি বই-কাগজও পড়তে পারব। তবেই বোঝ! এ-পৃথিবিতে চোখ-কান খুলে শুদু দেখে বেড়ালে অনেক শেখা হয়ে যায়।'

'বলেছিস ঠিক!' মদনা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তবে মার্ডার কেস আর আমাদের ভাগ্যে জুটেছে! দু-দু-বারই জুটেও স্রেফ বোকা বনলাম। গজ-উকিলই বল্ আর আমাদের চেম্বারের কাছের সেই ষড়যন্ত্রের কেসের 'অদৃশ্য' হয়ে যাওয়া লোকটাই বল। মার্ডার হল, অথচ নিহত হল না। তাই বলছি অভাগাদের ভাগ্যে সত্যিকার একটা খুনের কেস আর জুটেছে!'

এখন ট্যাঁপাই মদনার গায়ে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে বলে, 'হতাশ হোসনে মদনা! জুটবে, জুটবে। আমি বলচি, তোর কপালে অনেক খুনের কেস জুটবে।'

'আবার শুধু 'তোর কপালে' আমার একার কেস জুটবে?'

'আহা, না রে বাবা, না! হলে দুজনারই। তবে তোর বুদ্ধিবিদ্যে বেশি তো! তাই তোর কথাই বলি...'

'তোরও কিছু কম না। তুই যেভাবে অবলোকন করতে শিখেছিস!' হেসে ওঠে মদনা 'তোরও জয়জয়কার অবধারিত।'

'তা হয় না রে মদনা। এ যাবৎ যত গোয়েন্দা-গপ্পো শুনলুম আর পড়লুম, দেখলুম অ্যাসিস্টেন্টদের হতে হয় বোকা-বুদ্ধু আকাট ভক্ত-হনুমান। আমিও তাই হব। তবে তোর সাথে সাথেই তো কারবার! ভবিষ্যতে ভালো ভালো পোশাক পরে ফাস্টো কেলাস রেলে চেপে কি উড়োজাহাজেই চেপে ঘোরাঘুরি করব। দামি দামি সেইসব, কী যেন বলে, সাততারা দশতারা হোটেলে উঠব, কিন্তু এই আক্ষেপটি রয়েই যাবে, জীবনে একদিন পুরো একটাকার বাদামভাজার ঠোঙা কোলে নিয়ে রিকশো চেপে, কলকাতা দর্শন করা হল না।'

ট্যাঁপার করুণ করুণ মুখটা দেখে মায়া হল মদনার। বলে উঠল, 'তবে ডাক একখানা রিকশো। দরদস্তুর করে ঠিক করে নে ক'দিনে আমাদের কলকাতা ভ্রমণ করিয়ে দিতে পারবে। ব্যস। আস্ত দু-টাকার বাদামভাজা কিনে ফেলে ঠোঙাটা কোলে বসিয়ে, দু-দিকে তার খোলা ছড়াতে ছড়াতে আর তোর পিথিবিকে অবলোকন করতে করতে ঘুরে বেড়িয়ে জীবনের একটা বাসনা মেটানো হোক ...এই রিকশা...'

ট্যাঁপা বাধা দিল 'তোর আবার হয়তো হয়, নয়তো নয়। রোস, একটা শুভ কাজে উদ্‌বোধন না কী বলে, সেটার ব্যবস্থা করতে হবে না? কাল ভোর

সকালে চানটা সেরে নে। প্রথমেই কালীঘাটে মা-কালী দর্শন করে, ওখান থেকেই বাদামভাজা কিনে নিয়ে...'

'ওখানে পাওয়া যাবে?'

'কী বলিস মদনা। সাধে বলি শুদু দেখলেই হয় না, অবলোকনটি করতে হয়। মন্দির থেকে বেরিয়ে একমিনিটের রাস্তা, ফুটপাথে বসে দিনভোর বালিখোলা চাপিয়ে বাদাম ভেজে চলেছে একটা লোক। ধারেকাছে একটা বুড়ি শিলনোড়া নিয়ে বসে হরদম নুন আর কাঁচালঙ্কা এক করে পিষে চলেছে। আর ওধারে এক বুড়ি ওই ফুটপাথেই তোলা উনুনে গরম গরম বেগুনি, আলুর চপ ভাজছে। দেখিস নাই কখনও।'

মদনকে মানতেই হল, দ্যাখেনি। মানে 'দেখেছে' হয়তো, তবে 'অবলোকন' করেনি মনে হচ্ছে।

পরদিন ভোর-সকালে চান-টান সেরে অভিযানের মুখে ট্যাঁপা হঠাৎ বলে ওঠে 'একটা কাজ করলে মন্দ হয় না মদনা। ধর আমরা দু-জনে যদি এক-একটা ছদ্মবেশ ধারণ করি, তাহলে আর কারও চিনে ফেলার ভয় থাকে না। আর তার মানে আমার, মানে আমাদের কী বলে... প্রোফেশনেরও কোনোও ক্ষেতি হয় না।

'অ্যাঁ, কী বললি? ছদ্মবেশ ধারণ!' মদনা হঠাৎ ট্যাঁপাকে উঁচু করে তুলে ধরার চেষ্টা করে বলে ওঠে, 'ওরে আমার ট্যাঁপামানিক, তুই মরে গেলে তোর ব্রেনের একটু ঘিলু শিশিতে ভরে রাখতে হবে। মগজে এত বুদ্ধি? ফার্স্টক্লাস বলেছিস রে! তো বল কীরকম ছদ্মবেশ ধারণ করা যায়!'

'তুইই বল।'

মদনা একটু ভেবে বলে, 'প্রথমে তো কালী-মন্দিরেই যাচ্ছি, তো পরনে একটা রক্তবস্ত্র গায়ে মা-কালী লেখা নামাবলী, আর কপালে মোটা দাগে সিঁদুরের রেখা। মন্দিরে ঢোকা সহজ হবে।'

তা ভাবনায় পড়ার কিছু নেই। কিছু-কিছু ছদ্মবেশের জোগাড় তাদের আছে, কখন কী দরকার পড়বে বলে। যেমন ওই কালী-সাধকের সাজ, আবার বোষ্টম-ভিখিরির সাজ, মালা-ঝোলা, হরিনাম-লেখা নামাবলি। এ ছাড়া শৌখিনবাবুর ধুতি-পাঞ্জাবি, ফ্যাশনেবলবাবুর পলিয়েস্টার শার্ট-প্যান্ট, আবার লুঙ্গি, টুপি, ডোরাকাটা ফতুয়া, এবং সর্দারজির পাগড়ি, পায়জামা, ঢোলা কামিজও। পরচুল, পরদাড়ির সংগ্রহও আছে কিছু।

'যাত্রাপার্টির লোক' এই পরিচয় দিয়ে এসব কিনে-কিনে জোগাড় করেছে ট্যাঁপা-মদনা!

মদনের প্রস্তাবে ট্যাঁপা বলে উঠল, 'ও-সাজে মন্দিরে ঢোকা সহজ হবে, কিন্তু

বাদামভাজার ঠোঙা কোলে নিয়ে খোলা ছড়াতে-ছড়াতে বেড়ানো মানাবে?'

'আরে তাই তো! ওরে আমার জাদু! ঠিক বলেছিস। তা হলে ওই লুঙি-টুপি-ফতুয়া?'

ট্যাপা জজের রায়ের গলায় বলে, 'মন্দিরে ঢুকতে দেবে না!'

'তাহলে? সর্দারজি?'

'নাঃ! তাতে রিকশোওলার হয়তো অস্বস্তি হবে, তা ছাড়া মুখ বুজে তো আর বেড়াব না। কথা কইলেই ধরা পড়ে যেতে হবে।'

'তা হলে? হরিনামের মালার সঙ্গেও তো ওই চিনেবাদাম, ফুচকা, তেলেভাজা, এসব মানাবে না।'

'তা তো নয়ই। আমি বলি কি, ফতুয়াটা থাক, টুপিটা লুঙ্গিটা বাদ যাক, লুঙ্গির বদলে একখানা করে আধময়লা মোটা ধুতি। তার সঙ্গে একটা ছেঁড়া-ফাটা গামছা কাঁধে। পায়ে রবারের চটি। গাঁ থেকে কলকাতা দেখতে আসার মতো দেখতে লাগবে। মানিয়ে যাবে!'

মদন গম্ভীর গলায় বলল, 'শুধু মাথার ঘিলুই নয় রে ট্যাঁপা, তোর পায়ের ধুলোও একটু হোমিওপ্যাথি শিশিতে ভরে সংরক্ষিত করতে হবে। তুই আবার বলিস, তুই বুদ্ধু!'

'এতে কোনো বিদ্যে লাগেও না মদনা। শুধু ওই অবলোকন। যাক্, আর দেরি করা নয়। 'জয় মা কালী' বলে বেরিয়ে পড়া!'

২

খাটো ধুতি, ডোরাকাটা ফতুয়া, কাঁধে গামছা। ফতুয়ার পকেটে কিছু টাকাপয়সা, এবং ওই সাজের সঙ্গে মানান করে কোমরে বাঁধা গেঁজেয় বেশ কিছু টাকা।

সারাদিনের জন্যে বেরোনো, বাড়িতে বিশেষ টাকাপত্র না রেখে যাওয়াই ভালো। দিনকাল ভালো নয়। তা ছাড়া, ওদের 'চেম্বার' ঝাঁটপাট দেবার জন্যে সম্প্রতি যে-ছোকরাটাকে রেখেছে, তার মতিবুদ্ধি কেমন, তা এখনও জানা যায়নি।

শখের গোয়েন্দাদের নেমপ্লেট মেরে, 'চেম্বার' খুলে বসার পর অনেকদিন পর্যন্ত তো বাইরের দরজা বন্ধ করে নিজেরাই ঝাড়ামোছা করেছে। তবে এখন ভাগ্য একটু ফিরেছে বলেই লোক রাখা! যাক, টাকাপত্তর নিজেদের সঙ্গে নিয়ে

এলে আর ভাবনা কী! বরং কোমরের সঙ্গে নোটের গোছা বাঁধা থাকলে, কোমরে বেশ একটা বল থাকে।

মন্দির থেকে একটুখানি বেরিয়েই, ট্যাঁপা জিভে একটু চুকচুক শব্দ করে বলে উঠল, 'মদনা, দেখেছিস?'

এখন দেখল মদনা।

একটা বুড়ি এই অতি সকালেই ফুটপাথের লাগোয়া একটা কোনাচে-মতো জায়গায় গনগনে একটা উনুনের সামনে বসে ডাঁই করে বেগুনি আলুরচপ ভেজে ফেলেছে। আরও ভাজছে।

ভাজতে হবে না? যারা ঠাকুর দর্শনে মন্দিরে আসে, তারা তো উপোস করেই আসে। বেরিয়েই উপোস ভাঙতে অস্থির হয়ে উঠবে না?

ট্যাঁপা বলল, 'খালি পেটে বাদামভাজা খাওয়াটা ঠিক নয়, কী বলিস মদনা? আগে কিছু সেঁটে নেওয়া যাক!'

মদনেরও মনটা টলল বই কী। তা ছাড়া, দুটো গাইয়ামার্কা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে শালপাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে তেলেভাজা খাচ্ছে, এ এমন কিছু আশ্চর্যের দৃশ্য নয় যে, কেউ তাকিয়ে দেখবে।

কিন্তু আশ্চর্য দৃশ্য একখানি যে দেখিয়ে চলেছে ট্যাঁপা!

মদন অনেক আগেই হাতের ঠোঙা ফেলে দিয়ে তেল-হাতটা মাথায় মুছে ফেলে যাবার জন্যে রেডি। কিন্তু ট্যাঁপার ঠোঙা ফেলে দেবার নামটি নেই। এন্তার চালিয়েই যাচ্ছে।

মদন যতবার ইশারা করছে, এবার ছাড়, ট্যাঁপা ততবারই ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছে, আর একটু।

শেষ অবধি আর থাকতে পারে না মদনা, চোখ পাকিয়ে চাপা কড়া গলায় বলে, 'কী করে চলেছিস? এরপর আবার সেই পুরো টাকার চিনেবাদাম। আজই জীবনের শেষ দিন করতে চাস?'

একগাল হেসে হাতের দু-খানা চটপট মুখে পুরে ফেলে, ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরে বলে, 'দিদিমা, আর খানচারেক আলুর চপ!'

আশেপাশে ভিড় যথেষ্টই। তবে বেশির ভাগই কিনে নিয়ে যাবার খদ্দের। দু-চারজনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে নিচ্ছে।

'ট্যাঁপা, মরবি বলে দিচ্ছি।'

ট্যাঁপা আরও একগাল হেসে বলে, 'মরতে যাব কী দুঃখে? আমরা তো আর এখনও তেমন বড়োমানুষ হইনি মদনা। এখনও হজোম-শক্তি আছে। খেয়ে নিই এই বেলা আশ মিটিয়ে। তেমন বড়োলোক হলে তো আর সে-শক্তিটি থাকবে না। দেখছি তো চাদ্দিকে। পকেটে আর পেটে লড়ুয়ে বিরোধ। পকেটে পয়সা

হল কি তোর গিয়ে পেটের বারোটা বেজে গেল। ক্রেমোশো আর খিদে নাই, রুচি নাই, হজোম নাই অথচ পকেট যখন গড়ের মাঠ, পেটের মধ্যে তখন রাতদিন ছুঁচোয় ডন-বৈঠক মেরে চলবে।'

মদনা হেসে ফেলে, 'এসবও কি তুই অবলোকন করে থাকিস ট্যাঁপা?'

ট্যাঁপা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'এর আর অবলোকন কী? দেখতেই তো পাওয়া যায় চাদ্দিকে। ইয়া ইয়া বড়ো-বড়ো গাড়িওলা বড়োমানুষরা চিনি ছাড়া চা খাচ্ছে, আলু ছাড়া তরকারি খাচ্ছে, মাখন ছাড়া পাউরুটি খাচ্ছে, সন্দেশ রসগোল্লা মণ্ডা মেঠাইকে বিষতুল্য জ্ঞান করছে, আর দু-বেলাই হয়তো ভাতের বদলে দু-খানা শুকনো রুটি চিবোচ্ছে! তো আমাদেরও কি আর সে-দশা না হবে? তা এখন যখন 'দিন' রয়েছে, খেয়ে নিই', বলে তেলের হাত মাথায় মোছে ট্যাঁপা।

মদনা বলে, 'বাঁচা-মরা নিজের হাতে! তো হয়েছে এবার?'

'হয়েছে।'

ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা কুড়ি টাকার নোট বার করে বুড়ির সামনে ফেলে দিয়ে ট্যাঁপা বলে, 'নাও তো দিদিমা হিসেব করে!'

বুড়ি নোটখানা খপ করে তুলে নিয়ে বেজার গলায় বলে, 'এর আবার হিসেব কী বাবা? আপনি যে খেয়েছ এটা ছাপিয়ে দাম উটেচে বই কম নয়। যাকগে, ওই থাক!'

'যাক গে ওই থাক মানে?' ট্যাঁপা কড়া গলায় বলে, 'এ কি দয়া নাকি? হিসেব দাও। যা বাড়তি হয়েছে বলো চটপট।'

বুড়ি তখন অন্য খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত। বলে ওঠে, 'আপনি বাবু য্যাতো প্রাণ চায় খেয়ে গ্যাচো, আমি অত গুনি নাই!'

'বটে! ওঃ!' ট্যাঁপা পকেট থেকে আর-একখানা দশ টাকার নোট বার করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে, 'কী? এতে হবে? নাকি আরও খেয়েছি?'

বুড়ি এখন অপ্রতিভভাবে বলে, 'অনেয্য কথা বলব ক্যানো? এ থেকে আপনি এটা পাবে।' বলে খুঁজেপেতে একখানা ময়লা চিরকুট্টি দু-টাকার নোট বার করে বাড়িয়ে ধরে।

'দরকার নেই। তুমিই নাও।' বলে, গটগট করে চলে আসে ট্যাঁপা।

একটু এসে মদন হেসে বলে, 'বড়লোক হোসনি, কিন্তু বড়োলোকের মেজাজটি তো পেয়েছিস! ওই টাকা দুটোতেই আমাদের বাদাম হয়ে যেত!'

'যাকগে! তুই নিয়ে আয়' ট্যাঁপা এগিয়ে যায় কিছু দুরে দাঁড়ানো রিকশার সারির দিকে। কালীঘাটের মা-কালীর মন্দিরের ধারেকাছে, সব সুবিধেই হাতের কাছে।

দু-জনে একখানা গাড়িতে চেপে বসল, বাদামের ঠোঙা কোলে নিয়ে।

রিকশাওলা এদের ঠিক 'বাবু' পদবাচ্য না করে আলগা গলায় বলল, 'যাবেন কোথায়?'

ট্যাঁপা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তোমার যেদিকে ইচ্ছে। আমরা কলকেতা দেখতে বেরিয়েছি।'

মদনা ওকে একটা চিমটি কেটে জানান দিল, 'বোকার মতো কথা বলছিস কেন?'

ট্যাঁপাও একটা চিমটির দ্বারা জানিয়ে দিল, 'ইচ্ছে করে।'

আর একটা চিমটি। অর্থাৎ, 'কেন? কী দরকার?'

প্রত্যুত্তরের চিমটি বলল, 'আছে দরকার। বোকা সাজায় মজা আছে।'

লোকটা অবশ্য এসব চিমটি রহস্য বুঝল না। একটু মুচকি হেসে বলল, 'কোথা থেকে আসা হয়েছে? গাঁ-ঘর থেকে বুঝি?'

ট্যাঁপা একগাল হেসে বলল, 'ধরেছ তো ঠিক! খুব বুদ্ধি। কলকেতার জলের গুণ!'

মদনা এবার একটা জোর চিমটি কাটল। যার অর্থ হচ্ছে, 'থাক! যথেষ্ট হয়েছে! আর নয়।'

একটু পরেই ট্যাঁপা হৃষ্টচিত্তে বাদামের ঠোঙার মুখ খুলে একটা ছাড়িয়ে মদনের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'নে, প্রথমটা তুই খা।'

'কেন?'

'বাঃ! তুই আমার প্রাণের বন্ধু না!'

'ঠিক আছে। দে।'

'মদনা!'

'কী?'

'নিজেদেরকে বেশ রাজা রাজা লাগছে, না?'

মদনা হেসে ওঠে, 'সাজটা তো একেবারে রাজসই।'

'সাজেতে কী করে!'

ট্যাঁপা ইত্যবসরে গোটাকতক বাদাম ছাড়িয়ে ফেলে, তার খোলাগুলো মুঠো করে রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মনের ভাবটা ভাব। রাজা-রাজা না?'

মদনা বলল, 'মটরগাড়ি চড়লে এর থেকে বেশি হত।'

'তোর কেবল মটরগাড়ির বায়না, তোর মটরগাড়ি কোনো গলির... এই ভাই, রোকো, রোকো...'

যদিও রিকশাওলা পিওর বাঙালি, তবু ট্যাঁপা 'রোকো, রোকো'ই বলল।

জানে, গাড়ি চড়লেই চালককে ডিরেকশন দিতে হিন্দি বলতে হয়। ট্যাক্সি চড়লেও 'আভি ডাইনে', 'থোড়া বাঁয়ে', 'আউর থোড়া', 'আগে বাড়ো', এই সব বলাই রীতি। তা সে-ড্রাইভার খাস কলকাতার লোক হলেও।

রিকশাওলা রুখল!

'নামবেন?'

'না, না, শুধু ওই গলির মধ্যেটায় একবার ঢুকব। ওর মধ্যে তোমার গাড়ি পারতা হ্যায়?'

'না! ঘোরাবার জায়গা নেই।'

মদনা বলল, 'এখানে কী? '

'কী আবার! দেখব। আয়, নাব।'

'তুই যা! আমার ইচ্ছে করছে না।'

'মদনা। আমার সঙ্গে নন-কোঅপারেশন করছিস? গলিখুঁজি কানাগলির মধ্যেই যদি ঢুকে-ঢুকে না দেখলুম, তো হলটা কী? কলকেতা মানে তো আর শুধুই ভিক্টোরিয়ার চুড়ো, তোর গিয়ে মনুমেন্টের মাথা, হাইকোর্টের ঘড়িটাই নয় রে মদনা। আসল কলকেতা হচ্ছে গলি। শুনেছি, এক এক জায়গায় গলির গলি তস্য গলিতে গোলকধাঁধা! তাকেই বলে আসল কলকেতা! চল না, ভেতরে ঢুকি!'

'ট্যাঁপা রে! এই রেটে বেড়ালে ক-বছর লাগবে তোর কলকাতা দেখতে তা ভেবে দেখেছিস?'

কিন্তু ভেবে দেখবার আগেই তো নেমে পড়েছে ট্যাঁপা। কাজেই বাধ্য হয়ে মদনাকেও নামতে হয় গজগজ করতে করতে।

সরু গলি। ওদিকটা মুখ বন্ধ। অর্থাৎ কানাগলি। খানিকটা ঢুকেই দেখে, সেই কানা মুখ বোঝাই করে বিরাট এক জঞ্জালের পাহাড়! কোনমতে কোঁচার কাপড়ে নাক চাপা দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে মদনা, 'হয়েছে তো তোর আসল কলকেতা দেখা? তবু এ তো কিছুই না। আসল দেখতে চাস তো নর্থে যেতে হয়।'

ট্যাঁপা উৎসাহের গলায় বলে, 'তাই বলছিস?'

'বলছি তো! তো, এখনি যাবি? এই রিকশা চেপে?'

'তুই রেগে যাচ্ছিস মদনা!'

'রাগব কেন? রাগের কথা নয়। তবে একটা নেয্য-অনেয্য আছে তো? একটা বাসনা মেটাতে বেরিয়েছিস তাই-ই মেটা! দু-চারবার রিকশা বদল করে

সারাদিনমান ঘুরে বেড়া, ফুচকা খা, ডাব খা, কাম্পাকোলা খা, চায়ের দোকানে ঢুকে চা খা, সন্ধে হলে কোনো পাইস হোটেলে ঢুকে ডিমের ঝোল ভাত খেয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফের।'

ঘরের ছেলে ঘরে!

হায়! মদনার কথা শুনে অলক্ষ্যে কেউ হাসল বোধহয়। কিন্তু অলক্ষ্যে তো! দেখা গেল না। দেখা গেল এইটি, ট্যাঁপা যেন সাপের ছোবল খেয়েছে, এইভাবে চমকে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে বলে ফেলে, 'অ্যাঁ! কী বললি মদনা? ডিমের ঝোল ভাত! এ কোন স্বর্গলোকের কথা শোনালি মদনা! আহাহা! ডিমের ঝোল ভাত! হোটেল রেস্টুরেন্টের ডিমের ঝোল! তার মানে সেই রগরগে ডগডগে লাল! লাল! ইশ! আহা! তা সেটা আর সন্ধের জন্যে তুলে রাখা কেন রে মদনা? এখন এই দুপুরেই হয়ে যাক না! ভাতটা তো লাঞ্চেই ভালো! তাই না?'

মদনা হেসে ফেলে, 'এখন খেতে পারবি?'

'বাঃ, কেন পারব না? দু'খানা তেলেভাজা খেয়েছি বলে? বলেছি তো বাবা! যতক্ষণ না বড়োমানুষ হচ্ছি, ততক্ষণ হজোমশক্তি নিজের কন্ট্রোলে থাকবে। কোথাও পালাবে না! চল দেখি কোথায় তোর পাইস হোটেল। আহা! সেই লালচে-লালচে ভাজাভাজা ডিমের ঝোল! কবে কোনকালে যেন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখেছি, আর নিশ্বেস ফেলেছি। মনে আছে তোর? সারাদিনে দু-পাঁচজনের পকেট সাফ করে যা কিছু হাতে আসত, গুলু-সর্দার আমাদের হাত মুচড়ে সব সাফাই করে নিয়ে একটা কি দেড়টা টাকা দিত!'

মদনা ট্যাঁপার হঠাৎ এই পুরোনো কথা তোলায় ভারি রেগে যায়। চোখ পাকিয়ে চাপা গলায় বলে, 'এতকাল পরে এখন আবার ওসব কথা কেন? মনমেজাজ খারাপ করতে? তদবধি আর ডিমের ঝোল খাসনি?'

ট্যাঁপা একটু মিইয়ে গিয়ে বলে, 'তা কে বলছে? কতই তো খাচ্ছি। এখন তো প্রেত্যেকদিনই প্রাতোক্কালে...'

'প্রেত্যেকদিন নয় ট্যাঁপা। প্রত্যেকদিন। প্রাতোক্কালে নয়, প্রাতঃকালে। তো কে তোকে সাধুভাষায় কথা বলেছে? অ্যাঁ? 'রোজ সকালে' বললেই তো ল্যাঠা মিটে যায়!'

এইভাবেই মদনা গাধা পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া বানাচ্ছে। কিন্তু হতভাগা গাধাটার ভেতরে আবার অনেক খানদানি ব্যাপার। ও মাঝে মাঝেই উদাস হয়ে যায়, স্মৃতিচারণ করতে বসে, আর দার্শনিক দার্শনিক কথা বলে।

রিকশাওলাটা ওদের কথার আভাস অনুমান করে বলে ওঠে, 'আপনারা যদি এখন ভাত-টাত খান, আমায় ছেড়ে দ্যান।'

মদনা বলে ওঠে, 'না না, এক্ষুনি কেউ ভাত-টাত খাবে না। চলো আর একটু।'

'আমারও তো খাবার টাইম হয়ে যাচ্ছে', লোকটা বেশ অনমনীয়ভাবে বলে।

'এক্ষুনি খাবার টাইম? ক-টা বেজেছে হে বাপু?'

লোকটা কবজি উলটে ঘড়ি দেখে নিয়ে বেজার গলায় বলল, 'বারোটা কুড়ি।'

'আরে! সবে বারোটা কুড়ি? এ তো ভোরবেলা। আর একটু চলো।'

'আপনারা যে কলকাতার কী দেখতে চান, তাও তো বুঝতে পারছি না।'

ট্যাঁপা গম্ভীরভাবে বলে, 'বোঝবার দরকারটাই-বা কী? নাকের সোজা চলো, যখন রোকো বলব, থামবে।'

'এভাবে আমাদের কাজ চলে না। আর আধঘণ্টা বাদে ছেড়ে দেব,' বলে রিকশাওলা আবার তার গাড়ির ডাণ্ডা হাতে তুলে নেয়।

কিন্তু একটু চলতে না চলতেই সামনেই এক চায়ের দোকান।

'মদনা! তাহলে চাটা হয়ে যাক!'

মদনা চিমটির ভাষায় বলে, 'রিকশাওলা রেগে যাবে।'

ট্যাঁপাও চিমটির ভাষায় বলল, 'রাগ করল তো বয়েই গেল।'

'এই ভাই, রোকো!'

'ঠিক আছে। এবার আমায় ছেড়ে দ্যান।'

মদন আর ট্যাঁপা একসঙ্গে বলে উঠল, 'অত বেজার হচ্ছ কেন, অ্যাঁ? তোমায় তো ঘণ্টাহিসেবে ভাড়া করা হয়েছে। একটু চা খেতে দেবে না? এসো, তুমিও এককাপ চা খেয়ে নাও!'

কী ট্যাক্সি-ড্রাইভার, কী রিকশা-চালক, এদের এই এক রোগ! কেবল তাড়া দেবে। একজনের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে, আবার একজনের কাছেই তো ধরা দিবি বাবা! তবু যে কেন এমন করে!

চায়ের নামেও লোকটা একটু নরম হল না! রিকশা থামাল, ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে চলে গেল। ট্যাঁপা আর মদনা দু-জনে দোকানের সামনে পাতা বেঞ্চিটা ডিঙিয়ে দোকানের মধ্যে উঁকি মেরে বলে উঠল, 'এই যে, শুনুন, দু-কাপ চা আর...'

আর...আর...আর...! কথা শেষ হল না। নিথর পাথর হয়ে গেল দুটো জলজ্যান্ত আস্ত মানুষ। দু-জোড়ায় চারটে চোখ একেবারে স্থির।

৩

এ কী! এ কাকে দেখল তারা!

কে এই ফুটপাথের ধারে বেঞ্চি-পাতা, পাটাতন-পাতা উঁচু চায়ের দোকানটায় বসে ডানহাতে চায়ের কাপ ধরে বাঁ হাতে ডিমভাজায় কামড় দিচ্ছে।

সাক্ষাৎ যমই মনে হল এদের!

না, চিনতে ভুল হয়নি। এ-মূর্তি কি ভুল হবার?

আশ্চর্য! কোন না গোটা দশটা বছর পার হয়ে গেছে, তবু এখনও প্রায় একই রকম।

সেই চেক্‌লুঙ্গি, আড়ে-ডোরা ছিটের ফতুয়া, গলায় কালো কারে ঝোলানো একখানা রুপোর পদক, মাথার চুলে বুরুশকুচি ছাঁট, পায়ে হাড়কুচ্ছিত এক জোড়া চপ্পল (টেবিলের তলা থেকে আগ বাড়ানো পা দুটোই তো আগে চোখে পড়েছে), আর বাঁ হাতের কবজিতে একখানা ছকনক কাটা সিল্কের রুমাল। কবজিতে বাঁধা ঘড়িটা আড়াল করতে, নাকি কবজি জোর বাড়াতে, কে জানে।

কিন্তু এখন আর ওকে দেখে এত ভয় পাবার কী আছে ট্যাঁপা-মদনার?

এখন তো তারা 'এম. দাস' আর টি. সি. পাল'।

তবে? তা জানে না ওরা।

শুধু ওই সাক্ষাৎ-যমকে দেখেই একেবারে অ্যাবাউট টার্ন আর পিঠটান!

ওদের ছুট মারার দাপটে সামনের বেঞ্চিটা হুড়মুড়িয়ে উলটে গেল। আর তাতেই ঘটল বিপত্তি।

দোকানের মালিক 'কে কে' করে দোকান থেকে নেমে এসে দেখতে পেল, নেহাত বাজে-মার্কা দুটো লোক ছুট মারছে।

পড়ে গেল হইচই।

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়।

কোথা থেকে যে দু-মিনিটে ভিড় জমে যায়। যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে লোকেরা।

ছুটতে-ছুটতে সামনেই একটা ষাঁড়। ধর্মের ষাঁড়।

পড়তেই পারে সামনে। এটা গঙ্গার ঘাটের রাস্তা। এই বলরাম বোসের ঘাটে অনেক পুণ্যার্থী, স্নার্থীর ভিড়। আর পুণ্যার্থীরা অনেকেই ধর্মের ষাঁড়কে কলা খাওয়ান, প্রসাদী মিষ্টির ভাগ খাওয়ান। তা ছাড়া শালপাতা-মোড়া ফুলপাতা-গুলোও তো ওদের কম প্রিয় খাদ্য নয়।

এও তো এক সাক্ষাৎ যম।

কাউকে ছুটতে দেখলেই, শিং উঁচিয়ে তার পিছু পিছু ছুটবে, এই ওদের রীতি।

দাঁড়িয়ে পড়লেও তো পিছনে-ছুটে-আসারা ধরে ফেলবে।

ট্যাপারা অবশ্যই চায়ের দোকানের কোনোও অনিষ্ট করে আসেনি, চুরি করেও ছুট মারেনি, তবু ওদের পিছনে তাড়া করে আসছে একটা দলই প্রায়। তাদের মুখে একটি ধ্বনি, 'ধর, ধর। চোর-চোর!'

হঠাৎ কাউকে ছুটে পালাতে দেখলে লোকে চোর ভাববেই। আর যার সঙ্গে কোনো যোনেই, সেও ছুটবেই।

ষাঁড়টাকেও সাক্ষাৎ যম মনে হয়েছিল, কিন্তু সেই যমই তদের আর-এক যমের হাত থেকে বাঁচাল।

মদনা চাপা গলায় বলল, 'পাশের গলিতে ঢুকে পড়।'

সড়াত করে সুড়ঙ্গ-সরু একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল দু-জনে। ষাঁড়টার পিছনের দিক দিয়ে। সে একমনে একটা গাঁদাফুলের মালা চিবোচ্ছে।

পিছনে-আসা লোকগুলো থেমে পড়ল। বলে উঠল, 'লোকদুটো গেল কোথায়?'

তাজ্জব তো।

একজন হিহি করে বলল, 'এই ধম্মের ষাঁড়ের পেটের মধ্যে চালান হয়ে যায়নি তো?'

এদিক ওদিক তাকিয়ে যে-যার ফিরে গেল। হুজুগে ছুটছিল বই তো নয়।

আর দোকানের মালিক তো দোকান ছেড়ে আসেওনি।

ওরা যেখানে ঢুকে পড়েছিল, আসলে সেটা লোক-চলাচলের গলিই নয়। সেই বহুকাল আগে যখন কর্পোরেশনের এমন আইন তৈরি হয়নি যে, পাশাপাশি দুটো বাড়ি বানাতে হলে, মাঝখানে আটফুট জমি ছাড়তে হবে, তখনকার আমলের পেল্লায় দু-খানা পাশাপাশি বাড়ির মাঝকানের হাতখানেক চওড়া একটা ফাঁক মাত্র। দুটো বাড়ির নর্দামার জল এসে পড়ে। একটা লোক ছাড়া দুটো লোক পাশাপাশি ঢুকে যেতে পারে না।

তা একজনও তো পারে? আর পিছু পিছু লাইন দিলে দশজনও পারে!

পায়ের নীচে থইথই জল, একটা বাড়ির গা-নলের খানিকটা (পচাবাড়ি তো) ভেঙে যাওয়ায়, ছড়ছড় করে জল পড়ছে। কিন্তু কী আর করা? প্রাণের দায় বড়ো দায়!

কাত হয়ে-হয়ে এগিয়ে সেই জল ছিটোনো জায়গাটা পার হয়ে ওরা একেবারে শেষ অবধি এগিয়ে যেতে লাগল।

গলা শুকনো, হাত-পা ঠান্ডা, বুক ধড়ফড়! চোর হোক আর না-ই হোক, ছুটে পালাতে গেলে অবস্থা একই দাঁড়ায়!

জলের ছিটে থেকে সরে গিয়ে মদনা কাঁধের গামছাখানা দিয়ে মুছতে গিয়ে দেখল গামছা কখন পড়ে গেছে। ট্যাঁপারটা রয়েছে কিন্তু। ট্যাঁপা সেটা বাড়িয়ে ধরল।

মদনা মুছতে মুছতে বলল, 'কীসের জল কে জানে!'

ট্যাঁপা একটু সামলে বলল, 'কলের জল হতে পারে, আবার নোংরা জলও হতে পারে।'

'ঈশ, থু, থু! ট্যাঁপা তোর চা খাবার শখ মিটেছে?'

ট্যাঁপা উদাস গলায় বলে, 'কই আর মিটল? খেতে গিয়েই তো সাক্ষাৎ যমের মুখে!'

'তুইও দেখেই চিনতে পেরেছিলি?'

'তা আর পারব না? দেখামাত্রই তো বুকের মধ্যে বাজ পড়ল।'

'কিন্তু এখন আমরা ওকে দেখে এত ভয় পেলাম কেন বল তো?'

ট্যাঁপা দু-খানা হাত ওলটাল।

যদিও এখন ভরদুপুর, তবু এই দুটো বৃহৎ দেয়ালের মাঝখানের হাতখানেক চওড়া সুড়ঙ্গটা প্রায় অন্ধকার ঘুরঘুট্টি।

তবে হাত ওলটানোয় দেখা গেল।

মদনা বলল, 'ভয় পেলাম শুধু এই হতচ্ছাড়া সাজের জন্যে। ভেবে দ্যাখ্, যদি ভালোজামা-জুতো পরে ট্যাক্সি থেকে নেমে চা চাইতাম? ভয় পেতিস?'

'পেতুম না?'

'মোটেই না। সাজে তিনভাগ বল-শক্তি।'

'তোর সেই ট্যাক্সির গোঁ। আচ্ছা বাবা, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে ট্যাক্সি চড়িস।'

'এক্ষুনি বেরোনো চলবে না। ওদিকে ঘটনাটা কী ঘটছে জানি না তো। এখন কিছুক্ষণ এই ইঁদুর-কলে আটকা পড়ে থাকতে হবে। তা তোর পক্ষে ভালো। গলির মধ্যে সেঁধোবার বাসনা মিটছে।'

মদনের গলায় ব্যাঙ্গর সুর।

তবে ট্যাঁপা গায়ে মাখে না। শ্যাওলা-পড়া পচা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে গা চুলকোতে চুলকোতে বলে, 'তুই রাগ করছিস মদনা, কিন্তু আমার বেশ যেন এডভাঙচার, এডভাঙচার লাগছে।'

'ট্যাঁপা ফের?'

আচ্ছা বাবা, থাক। তবে বেশ রহস্য রহস্য লাগছে না? আমার তো লাগছে। মনে হচ্ছে এই বুকচাপা দেয়ালটার আড়ালে কী যেন সংঘটিত হচ্ছে।'

'তা হচ্ছে তো ঠিকই। দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ ইঁদুর-কলে আটকে পড়ে নর্দমার গ্যাসে মারা যেতে বসেছে।'

ট্যাপা বলে, 'নাঃ, আজ তোর মেজাজ খুব বেগড়বাঁই। তবে বেরিয়ে চল।'

'এদিক দিয়ে এক্ষুনি না। ওদিকে আর একটু এগিয়ে দ্যাখ, বেরোবার পথ আছে কিনা।'

ট্যাপা চটপট আর খানিক এগিয়ে গিয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি মেরে একগাল হেসে বলল, 'নেইও, আবার আছেও রে।'

'নেইও, আবার আছেও মানে?'

'দ্যাখ না উঁকি দিয়ে। তো, ওদিকেও আবার জল পড়ছে। দ্যাখ, ফোকরের মুখটা আটকানো বটে, তবে পাঁচিলটা নীচু। ডিঙোনো সোজা।'

মদন বেজার গলায় বলে, 'হ্যাঁ, তারপর পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফ মারতে গিয়ে আবার একপালা হইচই! আর খানিক থাক চুপ মেরে! এদিক দিয়েই বেরোব!'

তবে আর কী করা!

ট্যাপা তাহলে এখন অবলোকন চালিয়ে যাক!

বাড়ি দুটোর এদিকে কোনো জানলা নেই।

থাকবার কথাও নয়। পাল্লা খুলতে জায়গা কোথায়? তবে একটা জিনিস আছে। দেয়ালের মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি। তাও কি পরিষ্কার ফাঁকা?

নোনাধরা ইঁটের খাঁজে খাঁজে ঝরেপড়া চুন-সুরকির আড়াল।

তবু ট্যাপা চোখ ঠিকরে ঠিকরে দেখতে দেখতে হঠাৎ সরে এসে উত্তেজিতভাবে চাপা গলায় বলে, 'এই দেয়ালটার ওপারে একটা কিছু রহস্য ঘটছে।'

'তোকে এখন রহস্যয় পেয়েছে!'

'তুই দ্যাখ না এসে।'

মদনা সরে এসে একটু দেখে বলে, 'একটা লোক ঘোরাঘুরি করছে, এই তো?'

'লোকটার পায়ের কাছে একটা পেল্লায় তোরঙ্গ দেখছিস?'

'তা তো দেখছি। তো কী?'

'অত বড়ো তোরঙ্গয় কী ভরেছে?'

'ভরবে তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু।'

'তা আশ্চয্যিও নয়। লোকটা কোথাও বেরোবার তাল করছে। তৎপর হয়ে কত কী করছে। ওই দ্যাখ, চা খেল। ওই দ্যাখ, ফর্সা জামাকাপড় পরছে। মদনা,

চল, বেরিয়ে পড়ে বাড়িটার দরজাটা পাহারা দিই। লোকটা বেরিয়ে পড়লেই অনুসন্ধান করতে হবে।'

'বাড়িতে ও ছাড়া আর লোক নেই?

'মনে তো হচ্ছে না। একদম নিঃসাড়। এরা বোধহয় একতলার ভাড়াটে।'

'ট্যাঁপা, বলেছি তো, তুই এবার গপ্পো লেখা ধর। গোয়েন্দা-গপ্পো।'

'আরে বাবা, গপ্পো কি আবার একটা হাতি-ঘোড়া? যখন পড়তে জানতুম না, তাই ভাবতুম। এখন তো দেখি কিছুই না। যা ঘটছে, সেগুলো লিখে ফেললেই গপ্পো।... মদনা, শিগগির চল। লোকটা বেরিয়ে পড়ল বলে।

দারুণ উত্তেজিতভাবে দেয়াল ঘেঁষটে ঘেঁষটে একে একে বেরিয়ে এল দুজনে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাশের বাড়ির কোণভাঙা রোয়াকটায় বসে পড়ল।

আর ঠিক তক্ষুনি লোকটা বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। পুরোনো দরজা, তবে বেশ মজবুত আছে।

লোকটা দুটো দরজা টেনে ধরে একটা ভারী তালা ঝুলিয়ে চাবিটা পকেটে ফেলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'এই, তোরা এখানে কী করছিস, রে?'

'তোরা' শুনে রাগে হাড় জ্বলে গেল। তবে রাগ প্রকাশের উপায় নেই। বুঝতেই পারছে এখন তাদের চেহারার কী হাল। একে তো ওই হতচ্ছাড়া ছদ্মবেশ, তায় আবার পেটে ভাত পড়েনি। রোদের আঁচ লেগে লেগে মুখের রং বেগুনে, তার ওপর ভয়ের তাড়নায় একটা পচা দেয়ালের খাঁজে ঢুকে পড়ে এতক্ষণ আটকে থাকা। এবং গায়ে নর্দমার জল পড়ে শুকিয়েছে। এই মূর্তিতে এদের আবার 'আপনি' বলতে আসবে কে?

কাজেই রাগ না দেখিয়ে মদনা বলল, 'বসে আছি, আবার কী করছি।'

'তোদের তো কোনোদিন দেখিনি এ-পাড়ায়।'

'আজ দেখলেন।'

'তা এখানে বসে থাকার মানে?'

'কেন, এখানে বসার আইন নেই?'

কথাটা শুনে লোকটা ঘোঁত করে একটা শব্দ করল, তারপর হনহন করে এই ছোটো রাস্তাটা পার হয়ে বড়ো রাস্তার দিকে চলে গেল।

গেল তো গেল, আসবার নামটি নেই!

তার মানে বাক্স-তোরঙ্গ গুছিয়ে রেখে কোথাও চলে গেল দরজায় তালা লাগিয়ে।

তা এ আর এমন কী ঘটনা?

নেহাতই সাদামাঠা চেহারার একটা লোক।

পরনে মোটাসোটা পাটভাঙা একটা ধুতি। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি, পায়ে সাদা কেডস!

বয়েস পঞ্চাশও হতে পারে, পঁয়ষট্টিও হতে পারে। পঁয়তাল্লিশ বললেও হেসে ওঠবার কিছু নেই। এক-একটা লোকের এরকম চেহারা থাকে, বয়েস বোঝা যায় না।

মুদির দোকানের মালিক-টালিক হতে পারে।

কিন্তু ওর বয়েস বোঝবার দরকারটাই বা কী?

এ-লোকের দ্বারা ভয়ানক একটা লোমহর্ষক কিছু কাজ করে ওঠা সম্ভব, এমন মনে হয় না।

অথচ ট্যাঁপার বদ্ধমূল ধারণা হচ্ছে লোকটা ভয়ানক একটা কিছু করছিল ঘরের মধ্যে। দেখছে তো এখন দারুণ উত্তেজিতভাবে এই যাচ্ছো এই আসছে, তোরঙ্গটার আশেপাশে ঘুরছে। একবার একটু টেনেও দেখল। একবার আলতারাটা খুলে ডালাটা একটু তুলে দেখে নিয়ে বন্ধ করে ফেলে একটা তালা লাগাল। মানে কী এসবের?

কিছু একটা রহস্যময় ঘটনা ঘটছিলই ওখানে।

মদনা হেসে বলল, 'কী রে ট্যাঁপা, লোকটা তো হাওয়া হয়ে গেল। তালা ভেঙে দেখবি নাকি? যদি কোনো রহস্য ভেদ করতে পারিস!'

এতে ট্যাঁপার ভারী অপমান লাগে। মুখটা হাঁড়ি করে।

মদন বোঝে। নরম গলায় বলে, 'তো বসে থেকে কী হবে? ও তো চলেই গেল। এইবার চল দেখি কোথায় ডিমের ঝোল, ভাত জোটে।'

'গুলি মার তোর ভাত-ঝোলে।'

'কেন রে?'

'মন নাই!'

'তবে চল, বাড়িই চলে যাই। ফ্রেশ হয়ে নিয়ে বরং...'

কথা শেষ হবার আগেই দেখতে পায় লোকটা আবার হনহন করে চলে আসছে। রীতিমতো উত্তেজিত ভাব।

ওদের দেখেই থমেক দাঁড়িয়ে বলে, 'তোরা এখনও বসে আছিস! ব্যাপারটা কী?'

'ব্যাপার আবার কী! বসে থাকতে মন হয়েছে, বসে আছি। কেন, বসায় নিষেধ আছে?'

'ওঃ। খুব কথা তো! তা হবে না! এখন তো তোদেরই জয়জয়কার! এই যে

ট্যাক্সি ড্রাইভার! বলে কিনা এ-রাস্তায় ট্যাক্সি ঢুকবে না। চিরকাল ঢুকেছে, এখন আর ঢুকবে না। তা বসেই তো আছিস, একটু 'উবগার' করতে পারবি?'

'তার মানে, উপকার মানে?'

'মানে কিছু না। দুটো বাক্স-তোরঙ্গ বয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া।'

বাক্স-তোরঙ্গ!

মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে ট্যাঁপার।

মদনেরও কম নয়! তাহলে তো ট্যাঁপার ধারণাই ঠিক।

তবু মুখে তড়পায়, 'আমরা মুটে?'

'আহা তাই কি বলছি? তবে জোয়ান ছেলে, বুড়ো মানুষের একটু উপকার করে দিবি এই আর কি চা খেতে পয়সা দেব!'

পরস্পরে চিমটির ভাষায় আদান প্রদান!

'রাজি হয়ে পড়া যাক, অ্যাঁ?'

'তা আর বলতে!'

উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'পয়সা দিতে হবে না। কই দেখি আপনার কোথায় কী মাল!'

পয়সা দিতে হবে না শুনে লোকটা ভারি হৃষ্টমুখে বলে, 'তা দেখেই বুঝেছি। পয়সা নিতে চাইবে না ভদ্দরঘরের ছেলে তো এসো বাবা! সাড়ে ছ'টায় ট্রেন, এখন থেকে চেষ্টা না করলে তো আর... ড্রাইভারটা 'দ'-এ মজাল।'

দরজার তালাটা আবার খুলে ফেলে কপাট হাট করে বলে, 'এই যে এখানে। চলে এসো।'

ছোটো একটা কোণ-থোবড়ানো টিনের সুটকেস নিজেই হাতে নিয়ে বলে, 'তোমরা দু-জনে এই তোরঙ্গটা... এমন কিছু ভারি না। মাপেই যা একটু বড়ো। তবে সাবেকি জিনিস তো! আসল স্টিলের। তাই একটু ভারী।'

তা সাবেকি যে, তাতে সন্দেহ নেই। সর্বাঙ্গ ছাল-ওঠা, এককালে কী রং ছিল বোঝবার জো নেই।

দু-জনে ধরে টান মারতেই লোকটা হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'সামাল, সামাল! অন্দরমে সিসা হ্যায়!'

সেই নিয়ম-নির্দেশ দিতে গেলেই হিন্দি!

ট্যাঁপা বলে, 'সিসা হ্যায় না পাত্থর হ্যায়? এতনা ভারী কীজন্যে হ্যায়?'

'আরে বাবা, আছে, আছে। ধরো যে পাথরের বাসন-টাসনও কিছু আছে! তো সাবধানে ভাই! বলো তো আমিও হাত লাগাই। আসলে ওই তোরঙ্গটাই যা

ভারী। ভেতরের মালটি কিছুই না। বাঃ, ভারি ভালো ছেলে! আচ্ছা, তোমরা এগোও। আমি...'

আবার দরজায় তালাটা লাগাল। টেনে দেখে নিল।

তা খুব সাবধানেই দু-জনে সেই ছাল-ওঠা মান্ধাতার আমলের ট্রাঙ্কটাকে ধরাধরি করে ট্যাক্সির পিছনে ভরে দিয়ে নিশ্বাস ফেলে!

'বাঁচালে বাবা! তা হলে বলছ কিছু নেবে না?'

'আজ্ঞে না!'

'বেশ, বেশ।'

মদনা টান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'এই একটু জগন্নাথ-দর্শনে। শ্রীক্ষেত্তর আর কি! গাড়িও জগন্নাথের!'

'গাড়ি জগন্নাথের মানে?'

'আহা ওই যে এখন হয়েছে জগন্নাথ এক্সপ্রেস। ও ড্রাইভারসাহেব, গাড়ি ছাড়ো। সাড়ে ছ-টায় ট্রেন, এখানেই তো সাড়ে চারটে বাজতে চলল। জয় জগন্নাথ! দুর্গা, দুর্গা!'

৪

ট্যাক্সিটা চোখ-ছাড়া হতে না হতেই ট্যাঁপা দারুণ উত্তেজিতভাবে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ওঠে, 'মদনা শিগগির একটা ট্যাক্সি দ্যাখ। ফলো করতে হবে।'

'কেন? কী হল?'

'পরে বলছি। তুই দ্যাখ তো। আমার তো আবার চটপট হাত তোলা আসে না।'

'কলকাতার রাস্তায় হাজার হাজার গাড়ি। তুই কাকে ফলো করবি?'

'আরে বাবা, সব গাড়ি তো আর হাওড়া ইস্টিশনে যাচ্ছে না? ট্যাক্সির নম্বরটা মুখস্থ করে নিয়েছি।'

'বলিস কী? অ্যাঁ? ট্যাঁপা!'

'থাম, থাম, যা চটপট। এই, এই, ওই তো। ভগবান মিলিয়ে দিয়েছে! ট্যাক্সিস!'

ট্যাক্সিটা এসে থামল। সর্দারজির গাড়ি। ওদের বক্তব্য শুনে মেজাজি গলায় প্রশ্ন করল, কেন? সামনের গাড়িকে ফলো করতে হবে কেন? ডাকাতি-টাকাতির ব্যাপার হলে সে নেই এর মধ্যে।

বলল তার নিজের ভাষায়। তবে বুঝতে অসুবিধে হল না।

কিন্তু সে কী! ডাকাতির কথা ওঠে কীসে? এই হতভাগা দুটোর চেহারা দেখে

কি তাই মনে হচ্ছে। আসলে ব্যাপার এই। সামনের গাড়িটা ট্যাঁপাদের আপনজনেরই। একসঙ্গে ইস্টিশনে যাবার কথা, এদের মালপত্র ওই গাড়িতে উঠে গেছে। এরাই হঠাৎ একটু কাজে পড়ে গিয়ে, সময়ে এসে উঠতে পারেনি। কিন্তু ওই গাড়িকে ধরতে না পারলে দারুণ মুশকিল।

তবু লোকটা ওদের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বাজখাঁই গলায় জানতে চাইল, ভাড়া কে দেবে?

মদনা আর-একবার নিজেদের ছদ্মবেশকে ধিক্কার দিয়ে, চারখানা দশ টাকার নোট ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

লোকটা আর কিছু না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

ট্যাঁপার মধ্যে সমুদ্রের কল্লোল।

ট্যাঁপার মধ্যে অরণ্যের ঝড়ের দাপাদাপি।

তবু ট্যাঁপা শান্ত ভাব রাখবার চেষ্টা করে। ঠান্ডা গলায় বলে, 'তোর বাসনাও মিটল। ট্যাক্সি চাপলি।'

তারপর কষ্টে চাপা গলায় বলল, 'আরও একটা বাসনা মিটবে।'

'সেটা আবার কী?'

'কী তা দেখতেই পাবি। মিথ্যে মিথ্যে কি আর ট্যাক্সি ভাড়া করে...'

'বলেই ফ্যাল না। আমি তো আবার তোর থেকে কম দেখি।'

ট্যাঁপা ভেতরের চাঞ্চল্য দমন করে হাওয়ায় ভাসা গলায় বলল, 'এতদিনে তুই একটা সত্যি মার্ডার কেস পেলি। ওই তোরঙ্গটার মধ্যে একটা লাশ চলেছে।'

'কী? কী? কী বললি?'

উত্তেজনা চাঞ্চল্য ঝড় জলকল্লো সব সত্ত্বেও ঠোঁটে আঙুল, প্রায় নিঃশব্দ কথা।

ড্রাইভার সর্দারজি হলেও কে বলতে পারে তোমার আমার থেকেও ভালো বাংলা জানে কি না।

ট্যাঁপা বলল, 'হ্যাঁ! যা বলছি ঠিক। একটা লাশ যাচ্ছে। মহিলার লাশ।'

'আজ বোধ হয় তোকে গপ্পোয় পেয়েছে ট্যাঁপা। এই এক্ষুনি গাড়ি ফলো করার ব্যাপারে দিব্যি কেমন একখানা গপ্পো বানালি।'

'এটাও যদি তাই ভাবিস তো ভাব! তবে তাতে তোর একটা মার্ডার কেস মারা যাবে। তোরঙ্গটার তলায় হাত বুলিয়ে দেখেছিস?'

'তলায়? ওই অত বড়ো তোরঙ্গটার তলায় হাত বুলোব? কী করে?'

ট্যাঁপা সংক্ষেপে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিল। তোরঙ্গর মালিক যখন ওটা বার করে

ফেলার পর পিছন ফিরে ঘরের তালা লাগাচ্ছিল, আর তারা দুই বন্ধুতে ওটাকে রোয়াকের ওপর থেকে নামাচ্ছিল, তখন মদনা রাস্তায় দাঁড়িএয় নীচের দিকটা ধরে ছিল, আর ট্যাঁপা রোয়াকের ওপর থেকে। সেই সুযোগের মুহূর্তে ট্যাঁপা একবার তলায় হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে চমকে গেছে, তলায় ছুরি দিয়ে কাটার মতো টানা লম্বা দুটো কাটা, সিকি ইঞ্চির মতো চওড়া ফাঁক!

তা তাতে আর কী বোঝবার ছিল? যদি না তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে ঝুলে থাকত একটু সরু চুলের গোছার আগা, মানে মহিলার চুলের।

মানে ওই খুনে শয়তানের মারণাস্ত্র!

মানে ওই চুলের ডগা থেকেই সব ফাঁস। আর ফাঁস থেকেই ফাঁসি!

'ট্যাঁপা, তুই ঠিক দেখেছিস?'

'নিয্যস!'

'কিন্তু ডেডবডি পাচার করতে ওই ফাঁকাটুকু রাখার দরকার কী? তার তো আর দম আটকে মরার ভয় নেই!'

'বুঝছিস না? পচে উঠলে দুর্গন্ধ ছাড়বার ভয়ে। বাতাস পেলে চট করে পচবে না!'

'আচ্ছা, শুধু একটা ডেডবডি পাচার করতে তাকে রেলগাড়িতে চাপিয়ে শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে?'

ট্যাঁপা বিজ্ঞের গলায় বলে, 'নিয়েই যাবে, তার মানে নেই। রেলগাড়িতে ছেড়ে রেখে চলে যেতে পারে। তবে আমাদের হাতে যখন পড়েছে, তখন আর রেলগাড়িতে ছেড়ে যেতে হবে না বাছাধনকে!'

'ট্যাক্সিটা আর দেখতে পেয়েছিস?'

'পাইনি! পাব!'

ভারি আত্মস্থ এখন ট্যাপা। বলে, 'ড্রাইভার বলেছে, রাস্তায় জ্যামের সময় ধরে ফেলা যাবে।'

'কী করে?'

'কেন? নম্বর মুখস্থ রয়েছে না?'

'যদি আগেভাগে স্টেশনে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ফেলে? তকন আর ওই নম্বরে কী লবডঙ্কা হবে?'

'আরে বাবা, হাওড়া স্টেশনের 'পেলাটফরমটা' নেই? 'জগন্নাথের গাড়ি' ছাড়বার মুখে তার সামনের পেলাট্‌ফরমে দাঁড়ালেই হবে। ওই গন্ধমাদনটিকে তো আর পকেটে পুরে ফেলতে পারবে না।'

‘কিন্তু আসামি তো ট্রেনে উঠে পড়ে ‘কুউউ ঝমঝম’ বেরিয়ে যাবে! তারপর?’

তারপর? কেন ওরাও সেই কামরায় উঠে পড়তে পারবে না? হাঁ করে দাড়িয়ে থাকবে?

‘আমরাও উঠে পড়ব?’

রেগে ওঠে মদনা, ‘আমাদের টিকিট আছে?’

ট্যাঁপা ধিক্কারের গলায় বলে, ‘এইটা একটা প্রেবলেম হল?’

‘প্রোবলেম।’

‘মদনা!’ ট্যাঁপা রেগে উঠল, মরণ বাঁচন কালেও আর কথার খুঁত কাড়তে আসিসনে। গাধা পিটিয়ে খোঁড়া ঘোড়া হতে পারে। রেস খেলার ঘোড়া হয় না। বলি, টিকিট নেই বলে রেলগাড়িতে ওঠা যাবে না? যত যত লোক রেলগাড়িতে ওঠে, সব্বাইয়ের টিকিট থাকে?’

‘ধরা পড়লে হ্যানস্থা হয়।’

‘ট্যাঁকে টাকা তাকলে হয় না। টিকিটমাস্টার এলে নিজে থেকেই গিয়ে বলিস, তাড়াতাড়িতে টিকি কাটতে পারিনি, যা লাগে নিন।’

‘আর এই বেশভূষা? এই পরে রেলগাড়িতে উঠব?’

‘তাতে কী? গরিবদুঃখীরা রেলগাড়ি চড়ে না যাচ্ছিস একটা শুভ কাজে, কেবল কথার ফ্যাচাং! তোর কথার জ্বালায় ট্যাক্সির নম্বরটা গুলিয়ে যেতে বসল। ‘জ্যাম’ একটা পেলে হয়। ধরে ফেলা যাবে।’

কিন্তু ‘জ্যাম’ কি এল না? গাড়ি কি জ্যামের মুখে পড়ল না? পড়ল। সবই হল, কিন্তু ট্যাঁপা যা ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল, তা হল না।

সেই পাপী-পাতকী ট্যাক্সিটাকে দেখা গেল না।

এক গোছা টাকা খরচ করে, সর্দারজিকে তাড়া দিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে এই!

স্টেশনে তো পৌঁছেই আসা হল। কোথায় কী।

মিটার দেখে ভাড়া মিটোনোর দরকার নেই, আগেই টাকা দেওয়া আছে। সর্দারজি কিছু বোধ হয় ফেরত দিতেই আসছিল, ওরা হাত নেড়ে নেমে পড়েই ছুট মারল প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকে পড়তে।

কিন্তু এ কী! কত ভিড়! সারা কলকাতার লোকই কি আজ হাওড়া ইস্টিশনে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? এর মধ্যে থেকে কোথায় খুঁজবে সেই হাড়গিলে লোকটাকে, আর তার রংচটা ট্রাঙ্কটাকে! আরও কত বিশাল বিশাল বাক্স,

প্যাকিং-বাক্স, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, জগদ্দল বেডিং, বালতি, কুঁজো, ঝোড়াঝুড় কুলিবাহিত হয়ে চলেছে জনস্রোতের মতো! দুমদুম করে ছুটছে।

দাঁড়িয়ে পড়ে দেখবার চেষ্টা করতে গেলে তো ধাক্কা খেয়ে উলটে পড়তে হবে।

এতক্ষণের আত্মস্থ ট্যাঁপা এখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে ওঠে, 'হাতের মুঠো থেকে পাখি ফসকে পালিয়ে গেল মদনা? একটা শয়তান খুনি নাকের ওপর দিয়ে জলজ্যান্ত একখানা ডেডবডি পাচার করে নিয়ে গেল।'

ভিড় থেকে সরতে সরতে আর পিছলোতে পিছলোতে, এগোনো দূরে থাক, পিছিয়েই পড়ছে এরা। এক জায়গায় একেবারে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে হতাশ হয়ে বলল ট্যাঁপা, 'আমাদের কপালটাই মন্দ।'

এতক্ষণ ট্যাক্সির মধ্যে ড্রাইভারের কান বাঁচিয়ে কথা হচ্ছিল, এখন এই সমুদ্রকল্লোলের মধ্যে কে কার কথায় কান দেয়!

মদনা বলল, 'ডেডবডিই যে ছিল, তাতে এত শিওর হলি কী করে, তাও তো বুঝছি না। ট্রাঙ্কটা যে ছুরিকাটা, তার কী মানে? এমনিই ফুটোফাটা থাকতে পারে। মনে হচ্ছে তিন পুরুষ আগের জিনিস।'

'আর ফুটোফাটা দিয়ে বেরিয়ে আসা মেয়েছেলের চুলের ডগা? সেটা কী?'

'চুলেরই ডগা, তারই বা মানে কী? আর কিছুও হতে পারে।'

'আর কী হবে?'

'ইয়ে, ধর বেড়ালের ল্যাজ... কিম্বা।...'

'বেড়ালের ল্যাজ! তার মানে বলতে চাস, এত কাণ্ড করে একটা বেড়াল পাচার করতে বেরিয়েছে লোকটা। ওর মাথা খারাপ, না তোর মাথা খারাপ? শিওর কেন হয়েছি, সে কথ তো তোকে বলাই হয়নি। ড্রাইভারটা পাছে শুনতে পায়, আর তুই পাছে নর্ভাস হয়ে যাস সেই ভয়ে...'

আসলে অবশ্য তা নয়। আসল কথাটা ট্যাঁপা তার নিজের গোপন স্টকে রাখতে চেয়েছিল মোক্ষম দরকারের সময় বার করবে বলে।

'নর্ভাস!'

'মদনা, ফের? ফের এই মোক্ষমকালে কথার খুঁত কাড়া? আমি মুখ্যু, আমি গাঁইয়া, হল তো?'

'আচ্ছা! ঠিক আছে, আর বলব না।'

'বলবি না কেন, হাজারবার বলবি। তবে সময়-বিশেষ আছে তো?'

'ঠিক আছে। কিন্তু কথাটা কী ? শুনে তুই নার্ভাস হোসনি?'

ট্যাঁপা গলার স্বর নামায়, 'আমি যখন শুনেছি, আমার মাথা চুল আলপিনের

মতো দাঁড়িয়ে উঠেছিল, গায়ের লোম কাঁটাপেরেক-তুল্য খাড়া হয়ে গেছল! গলির মধ্যে সেই দেয়ালের ঘুলঘুলিতে কান চেপে পষ্ট শুনলুম কে বলে উঠল, 'আস্ত ঢোকানো যাবে না। ধড়মুণ্ডু আলাদা করে ফেলতে হবে। কাগজ আছে তো? কাগজে মুড়িয়ে নিয়ে...'

ছিটকে ওঠার জায়গা নেই, তবু মদনা ছিটকে ওঠে। বলে, 'কই, এ-কথা তো আগে বলিসনি? তা হলে তো তখনই ব্যাটাকে খ্যাঁক করে ধরে ফেলা যত। তার বদলে আমরাই কিনা মরতে সেই কাটা ধড়মুন্ডু নিজেরা বয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। আবার পয়সা খরচা করে ফলো করতে ছুটলাম। সত্যিই তুই একটা বুদ্ধু।'

ট্যাঁপা গোঁজ হয়ে বলল, 'টাইপ পেলাম কখন? চারদিকে লোক।'

'লোক তো কী? তাদেরই বলতাম, খোলান এই ঢাউস তোরঙ্গ! বিপদকালে পাবলিকই সহায় রে। ইস, একটা সত্যি মার্ডার কেস হাতে এসেও এল না!'

'দুর্ভাগার কপাল। কিন্তু সেই কী যেন নম্বরের টেকসিটা কি হাওয়া হয়ে গেল? একবারও তো চোখে পড়বে। গাড়ির পেছনের ইয়েটার তো ডালা ভালোমতো বন্ধ হয়নি। দিশ্যমান হয়েই ছিল।'

বলছে, এই সময় হঠাৎ সেই খ্যানখেনে বাজখাঁই গলাটি শোনা গেল, 'দো কুলি কাহে? অ্যাঁ, দো কুলি কাহে? একমেই হোগা!'

এ কী! এ যে সেই স্বর্গলোকের স্বর।

ট্যাঁপা-মদনার কানে যেন উচ্চাঙ্গ-সংগীত বর্ষিত হল।

দেয়ালে সেঁটে গিয়ে কিছু মানুষজনের পেছনে নিজেদেরকে আড়াল করে দেখতে পেল এরা, হ্যাঁ, সেই লোক। সেই ট্রাঙ্ক। দুটো কুলিতে ধরাধরি করে টেনে বার করেছে সেই সন্দেহজনক বাক্সটি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই চিৎকার, 'হুঁশিয়ার! আস্তেসে। উসকো অন্দরমে পাত্থরকা বর্তন হ্যায়!'

'কিন্তু, এত হুঁশিয়ার হুঁশিয়ারের কী আছে? ডেডবডির তো আর পড়ে গেলে মৃত্যুভয় নেই?'

'বুঝছিস না? যদি কোনোমতে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে। এই, এই, চলে গেল যে...'

ওঃ, হাওড়া স্টেশনের কুলির মতো এমন ছোটায় রেস দিতে কেউ পারবে না। ওই পর্বতপ্রমাণ মোট মাথায় নিয়ে ঝড়ের বেগে দৌড়চ্ছে।

আর পিছু পিছু সেই লোক হাঁ হাঁ করে ছুটছে। 'হুঁশিয়ার! সাবধান। গির যায়গা তো সর্বনাশ হো যায়েগা!'

ছুটলে কী হবে, নাগাল পেলে তো!

কিন্তু ইত্যবসরে কুলির নাগাল পেয়ে গেছে দুই শখের গোয়েন্দা। এবং ওই ছুটন্ত প্রাণীটার পিঠের দৃশ্যটি দেখে প্রায় বরফ হয়ে গেছে।

ট্রাঙ্কটার তলা থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে চলেছে কুলিটার ফতুয়ার পিঠে। টের পাচ্ছে না বেচারা!

সন্দেহ প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরিণত।

এর পর আর সন্দেহের কিছু থাকে না।

টিকিট না থাকার প্রশ্নও ওঠে না।

শুধু ওই 'টু টিয়ার' সেকেন্ড ক্লাস গাড়িটার যে-কামরায় সেই বৃহৎ মোটকে মল্লযুদ্ধ করে তোলা হল, সেই কামরাতেই উঠে পড়তে হবে গাড়ি ছাড়ার পূর্ব মূহূর্তে।

ওঃ, শয়তান লোকটা কিনা রেলের সিট-এর তলা থেকে আধখানা বেরিয়ে-আসা সেই ট্র্যাঙ্কের ওপর নিজের কুচ্ছিত কেডস-জোড়া খুলে রেখে একটা বিড়ি ধরাল।

ছিঃ। হোক ধড়মুণ্ডু আলাদা ডেডবডি, তবু একটা মৃতদেহ তো! এতটুকু সম্মান নেই!

ট্যাঁপা-মদনা অপরদিকের জানলার ধারে মুখ ফিরিয়ে পিঠে-সাঁটা অনুভূতির দিব্যদৃষ্টি দিয়ে ওয়াচ করতে থাকে।

শুনতে পেল, একজন সহযাত্রী প্রশ্ন করল, 'এত বড়ো ট্রাঙ্কে আপনার কী যাচ্ছে?'

লোকটা গম্ভীরভাবে বলল, 'সংসারের যথাসর্বস্ব।'

'ওঃ, বদলি হয়ে যাচ্ছেন বুঝি?'

'জেনে আপনার কোনো লাভ আছে?'

'না, লাভ আবার কী!'

লোকটা বেজার হয়ে ঘুরে বসে বলল, 'অন্যের অসুবিধে ঘটানোটা আইন নয়, সেটাই মনে করিয়ে দিচ্ছি।'

'থাক, থাক। এই শর্মা বৈকুণ্ঠ বসাককে আর আইন দেখাতে আসবেন না।'

ট্যাঁপা-মদনা পরস্পরকে চিমটির ভাষায় বোঝাল, নামটা জানা হয়ে গেল।

খানিক পরেই গাড়ি রামরাজাতলায় থামল। থামবার কথা ছিল কি না, কে জানে। স্টেশনে খাবার-দাবারওয়ালারা ঘোরাঘুরি করছে?

মদনা বলল, 'ট্যাঁপা, তোর সেই ডিমের ঝোল ভাত আর খাওয়া হল না।'

'বলেছি তো গুলি মারো।'

'পেট তো জ্বলছে।'

'জ্বলুক। তা বলে অসতর্ক হওয়া চলে না।'

ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠ বসাক হাতের বিড়ি অন্য জানলা দিয়ে ফেলে দিয়ে, এদিকে এসে 'এই চা' বলেই বলে উঠলেন, 'যাচ্চলে, গাড়ি ছেড়েই দিল।'

আর তারপরই হঠাৎ এদের দেখতে পেয়ে স্রেফ কাঁকড়াবিছের কামড় খাওয়ার মতো শিউরে উঠে বললেন, 'তোরা সেই ছেলে দুটো না? তোরা এখানে কোথা থেকে?'

'আজ্ঞে, আপনি যেথা থেকে।'

'তো, তোরা রেলগাড়িতে উঠে এসেছিস মানে? মতলবটা কী?'

মদনা গম্ভীরভাবে বলে, 'কেন? আমাদের জয়জগন্নাথ দর্শন করতে নেই?'

বৈকুণ্ঠ বসাক দারুণ সন্দেহের গলায় বলেন, 'তো... তো... তোদের টিকিট আছে?'

ট্যাঁপা বলে ওঠে, 'না থাকে, টিকিটমাস্টার এনে ধরিয়ে দেবেন। যদি অবিশ্যি সাহস থাকে!' বলে ট্যারাচোখে তাকাল ট্রাঙ্কার দিকে।

বৈকুণ্ঠ দু'-পা পিছিয়ে এসে বলেন, 'সাহস থাকবে না মানে? সাহস থাকবে না মানে? তোদের তো ভারী ট্যাঁক-টেকে কথা।'

পিছিয়ে এসে নিজের সিটে বসেন গোঁজ হয়ে।

এরা তাল করতে থাকে কোথায় একটু বসা যায়, যেখান থেকে ওঁকে নজরে রাখা যায়।

ঘুমোনোর প্রশ্ন নেই। সারারাত পালা করে জাগতে হবে দুজনকে। অবশ্য ঘুম আসবেও না। পেটের মধ্যে ইলেকট্রিক গিটার বেজে চলেছে।

সেই সকালবেলা টাকা বারো-চোদ্দর বেগুনি, আলুর চপ, আর দু-টাকার চিনেবাদাম। ব্যস!

তারপর গুলু-ওস্তাদ। তারপর পাঁই-পাঁই ছুট। তারপর ইঁদুর-কলে আটকা পড়া। তারপর ট্যাক্সি ফলো করা। তারপর বিনাটিকিটে রেলগাড়িতে চেপে বসা।

ওতেও যদি পেট ইলেকট্রিক গিটার না বাজাতে থাকে, কীসে বাজাবে?

পাষণ্ড বৈকুণ্ঠ বসাকটা ইতিমধ্যে তার হাতের সেই টিনের সুটকেসটা থেকে একটি অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো বার করে তার মধ্যে থেকেই তারিয়ে তারিয়ে পরোটা আর আলু-চ্ছড়ি সাঁটতে থাকে। কী নৃশংস! কী পাতকী পামর। বিবেক বলে কিছু নেই! ওই ডেডবডির ট্র্যাঙ্কের ওপর পা তুলে বসে পরোটা আলু-চ্ছড়ি খাচ্ছে।

খেল, হাত ধুতে গেল।

ট্যাপা বিদ্যুদ্বেগে উঠে গেল পিছু পিছু। বোঝা গেছে! এই মওকায় পালাবে।

নাঃ। পালাল না। হাত ধুয়ে ফিরে এল।

ট্যাপা ফিরে আসতে মদনা চিমটি দিয়ে বলল 'এখন পালাবে কী! চারদিকে সবাই জেগে। সবে রাত ন-টা।'

তা বটে। এসব দুষ্কর্ম গভীর রাতের জন্যে তোলা থাকে।

এখন যদি টিকিটচেকার ওঠে...

কী আশ্চর্য, টিকিটচেকারের নামগন্ধও নেই।

এদেরই ভাগ্য!

শখের গোয়েন্দা দু-জন বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে খালি-পেটের দুর্বলতায় কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

৫

ঘুম ভাঙল পুরী স্টেশনে এসে পৌঁছে, আচমকা একটা কলকোলাহলে। সমবেত কণ্ঠে ঐকতান, 'কুলি, কুলি, এই কোলি! ইধার, ইধার।'

চোখ খুলেই সেইদিকে তাকিয়ে দেখল ট্যাপা।

সর্বনাশ হয়ে গেছে। ট্রাঙ্কটা যেমনকে তেমন বসানো রয়েছে, বৈকুণ্ঠ বসাক হাওয়া।

এদিকে গাড়ির সব লোক হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ছে। যার যার মাল চলে যাচ্ছে তাদের কুলির মাথায়।

ট্যাপা আর্তনাদ করে ওঠে, 'মদনা, তুইও ঘুমিয়ে মরলি? এখন উপায়?'

'উপায় আর কিছু নেই। নেমে পড়ি আয় চটপট। নইলে শেষ পর্যন্ত ওই মাল আমাদের ঘাড়েই পড়বে। দেখবে আমাদের সঙ্গে আর কোনো মালপত্তর নেই। এই হতচ্ছাড়া পোশাক, এদিকে গেঁজেয় টাকা!'

সত্যিই বটে, দেরি করা ঠিক নয়।

আরে, আরে, এ কী! বৈকুণ্ঠ বসাক যে বীরবিক্রমে উঠে আসছেন। সঙ্গে দুটো কুলি নিয়ে। কী ভাগ্যি দুটো।

তার মানে কুলি ডাকতে গেছল। তার মানে নিশ্চিন্ত আছে, তার মাল-মোট ফস করে কেউ টেনে নিয়ে যেতে পারবে না।

তার মানে ওই পাপের বোঝা ফেলে পালায়নি!

বোঝা গেছে। বেশি ঘোড়েল। জানে ওই পুরোনো তোরঙ্গ থেকেই হয়তো ধরা পড়তে পারে। তাই সোজাসুজি একেবারে সমুদ্রে ফেলে দিতে এসেছে।

ওঃ! নরঘাতকের মাথায় কত প্যাঁচ খেলে।

ওদের মুখোমুখি হতেই বৈকুণ্ঠ বসাক খিঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ, সক্কালবেলা আবার এই অপয়া মুখ ফেউ লেগেছে তো। নামবি তো নেমে যা।'

'আমাদের জন্যে কী? আপনি আপনার দামি মাল নিয়ে নামুন তো। আমরা ঠিকই পৌঁছে যাব!'

বৈকুণ্ঠর চোখ দুটো কুঁচকে যায়। এই ছোঁড়া দুটোর মতলব বোঝা যাচ্ছে না।

কিন্তু কুলি নিয়ে তো আর ভাবনাচিন্তার সময় থাকে না। ততক্ষণে তো তারা ট্রাঙ্কটাকে ঘষটে টেনে নিয়ে মাথায় তোলে। দুমদাম নেমে যায়।

কেউই কিছু তাকিয়ে দ্যাখে না। দ্যাখে শুধু যারা দেখবার। স্পষ্টই দেখতে পায়, তোরঙ্গর তলায় জমে থাকা খানিকটা রক্ত ঘেঁষটে টানার জন্য লম্বা দাগে পরিণত হয়ে গেছে।

এর পর আর কী!

আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ফলো করা!

আবার সেই পুরোনো গল্প। সামনের রিকশায় তাদের গার্জেন রয়েছে। তার সঙ্গেই এদের জিনিসপত্র। ধরতে হবে ওটাকে।

পরীর রাস্তা জনাকীর্ণ নয়। বিশেষত এই ভোরে। দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু ফলো করার জন্যে কি বেশি ছুটতে হল?

না, না! বৈকুণ্ঠ বসাক তো তাঁর সেই সংসারের সর্বস্ব ভরা মোটটি জবরদস্তি একটা রিকশায় তুলে দিয়ে নিজেও তাতে উঠে বসেছেন।

কাজেই নিজেদের রিকশাকেই বলতে হচ্ছে ওদের 'একটু আস্তে।'

বাজখাঁই গলা থেকে উচ্চারিত হতে শোনা গেল, 'ইধরমে কোই ধরমশালা নেই হ্যায়?'

'অছি,' বলে রিকশাওলা আর একটু এগিয়ে একটা ভাঙামতো কিন্তু বেশ অনেকগুলো ঘরওলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল।

বৈকুণ্ঠ বসাক তাকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলে, 'এই, তুমি থোড়া দাঁড়াবে? থোড়া বাদ সমুদ্দুরমে যায়েগা।'

লোকটা কোনও জবাব না দিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

আর তখনই ঘ্যাঁক করে ধরে ফেলার মতো গলায় পাশ থেকে বলে উঠল ট্যাঁপা, 'বুঝেছি, একেবারে সমুদ্দুরে ডুবিয়ে দিয়ে প্রমাণ লোপের চেষ্টা, কেমন? মা-গঙ্গায় বুঝি সুবিধে হল না? সর্বদা জল-পুলিশ। সমুদ্দুরের তো মা-বাপ নেই। খুব সুবিধে।'

মদন বলে উঠল, 'সমুদ্দুরে কে কার কড়ি ধারে, কেমন? কিন্তু সে আর হবে না। ওই ধড়-মুণ্ডুটি পাচার করা চলছে না।'

এখনও বেশ সকাল। ধর্মশালার ধারেকাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। গোয়েন্দারা সাহসে ভর করে বলে ওঠে, 'এতে কী আছে?'

বৈকুণ্ঠ বসাক একটু থতমত গলায় বলেন, 'কী আছে তাতে তোদের কী কাজ বাপু? সেই কলকাতা থেকে টিকটিকি-পুলিশের মতন সেঁটে রয়েছিস কী মতলবে, তাই শুনি?'

'টিকটিকি-পুলিশকে ধরিয়ে দেবার মতলব। আর কিছু না।'

'বটে, বটে! ধরিয়ে দিবি? কী ধরিয়ে দিবি? অ্যাঁ। কী এমন করেছি আমি? ধরিয়ে দেব! যা, যা, বিরক্ত করিসনে।'

'যা ধরিয়ে দেব তা দেখতেই পাবেন। ট্রাঙ্ক খুলুন।'

'বটে। তোদের হুকুমে নাকি? এই ধর্মশালার লোকেরা, আমার মাল ঘরে তুলিয়ে দাও!'

'না, ঘরে ওঠানো চলবে না।'

'আলবাত চলবে!'

'না!'

'হ্যাঁ!'

ব্যস। এই সামান্য গোলমালেই, এদিক-ওদিক থেকে লোক এসে যায় কিছু। বেরিয়ে আসে ধর্মশালার লোকও।

কী ব্যাপার?

ব্যাপার আর কিছুই নয়, নিরীহ বৈকুণ্ঠ বসাক একটু জগন্নাথ দর্শনে এসেছেন, তো এই গুণ্ডা-মস্তান দুটো তাঁর ট্রাঙ্কটিকে ছিনতাইয়ের মতলবে সেই কলকাতা থেকে ছিনেজোঁকের মতো লেগে আছে। এখন জোর করে কেড়ে নেবার তাল করছে।

'ছিনতাই!'

একটা লোক হো হো করে হেসে ওঠে, 'এ তো মশাই গন্ধমাদন।'

কিন্তু বৈকুণ্ঠ বসাক কি তাতে দমেন? তাঁর দিকে যুক্তি নেই? জলের মধ্যে জাহাজ ছিনতাই হতে পারে, আকাশের গায়ে এরোপ্লেন ছিনতাই হতে পারে, আর স্থলপথে তুচ্ছ একটা ট্রাঙ্ক ছিনতাই হতে পারে না?

'তা বেশ তো, তুচ্ছই যদি তো খুলে দেখাতে দোষ কী?'

'কেন দেখাব? ওর মধ্যে আমার প্রাইভেট সব ব্যাপার!'

মদনা অটলভাবে বলে, 'তাহলে পুলিশকেই দেখাবেন। এখানের থানাটা কোথায় বলে দিন তো আপনারা।'

'কী! কী বললি পাজিরা? সামান্যর জন্যে পুলিশ দেখাতে এসেছিস আমায়? নিজেরা দু-দুটো জোয়ান বিনা টিকিটে আসিসনি? জানি না আমি', তড়পাতে থাকেন বৈকুণ্ঠ বসাক, 'নিজেদের বেলায় দোষ হয় না? আর আমার একখানা তিনছটাকি গিন্নি, তাকে যদি আমি বাক্সে ভরে...'

সেই হেসে-ওঠা লোকটা এখন অবাক হয়ে বলে, 'কী বললেন! গিন্নিকে বাক্সায় ভরে নিয়ে এসেছেন টিকিট ফাঁকি দিতে!'

বৈকুণ্ঠের তড়পানি থামে না, 'এসেছিই তো। ঠাকুমার আমলের এই ফুটোফাটা ট্রাঙ্কটার মধ্যে গিন্নি কে ভরে নিয়ে আমি গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন- দিল্লি-আগ্রা কোথায় না বেড়িয়ে এসেছি! কেউ টের পায়নি। তিনছটাকি একটা মানুষ, হাফ-টিকিট কাটলেও যার দাম উশুল হয় না, তার জন্য আস্ত একখানা ফুল টিকিট কাটবে, এত 'ফুল' নয় বৈকুণ্ঠ বসাক। এই করেই সব তীর্থ সেরেছি, বাকি ছিল জগন্নাথধাম। তা শেষরক্ষে হল না। এই মস্তান দুটো আমার পেছনে লেগে...'

ধর্মশালার ম্যানেজার চক্রবর্তী বলে ওঠেন, 'আমি তো আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না মশাই! বলতে চান এই ট্রাঙ্কের মধ্যে আপনার গিন্নি? এইভাবেই আপনি রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দেন?'

ট্যাঁপা বলে ওঠে, 'ওই গুলমার্কা গপ্পো আপনি বিশ্বাস করছেন? ফাঁকি রেল কোম্পানিকে নয়, আপনাকেই দিচ্ছেন'। আমি বলছি যদি গিন্নিই হন তো আস্ত নয়, ধড়মুণ্ডু আলাদা করা তাঁর ডেডবডি।'

ডেডবডি! শব্দটি শোনা মাত্র জনতা পিছোতে থাকে।

আর চক্রবর্তী বলে ওঠেন, 'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা! এখানে এসব গোলমেলে লোকের জায়গা হবে না মশাই। কেটে পড়ুন। কেটে পড়ুন।'

ঝপ করে ঠান্ডা মেরে যান তেজি বৈকুণ্ঠ বসাক। করুণ গলায় বলেন, 'এইটা একটা কথা হল মশাই, দুটো মস্তানের ফচকেমিতে বিশ্বাস করে...'

'তা আপনারই বা বাক্স খুলে দেখাতে আপত্তি কী মশাই! দেখিয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করে দিন।'

'তবে করি', বলে ট্যাঁপাদের দিকে একটি অগ্নিদৃষ্টি হেনে, নেহাত অনিচ্ছের ভাবে পকেট থেকে চাবি বার করে ট্রাঙ্কের ডালা খুলে তুলে ধরেন বৈকুণ্ঠ বসাক।

সন্দেহ ভঞ্জন হয়!

হাঁটু মুড়ে শুয়ে থাকা একটি প্যাঁকাটির মতো রোগা আর পৌনে চার ফুট মতো লম্বা মহিলা উঠে বসে বলে ওঠেন, 'মাছ তোলো, বেরোব কী করে?'

ওই প্যাঁকাটির মধ্যে থেকেও কিন্তু সানাই বেজে ওঠে!

বৈকুণ্ঠ বসাক হেঁট মুণ্ডে একে একে তুলে বার করেন, খবরের কাগজে মোড়া একটি বৃহৎ কাতলা মাছের ধড় আর মুণ্ডু। কাগজ রক্তে মাখামাখি।

বেরিয়ে পড়ার পথ পেতেই মহিলা চিংড়ি মাছের মতো তিড়িং করে বেরিয়ে এসে বলেন, 'হয়েছে তো? রেল কোম্পানিকে ঠকাবার ফল ফলেছে? যখনই রেলগাড়ি চড়ব তখনই বাক্সবন্দী হয়ে। গলায় দড়ি আমার তীর্থ দর্শনে।'

বৈকুণ্ঠর অকুণ্ঠ উক্তি, 'বাক্সবন্দী তো কী? দমবন্ধ হয়ে মরেছ কখনও? বরাবরই হাত-পা মেলে বালিশে মাথা দিয়ে যাওয়া-আসা। আমার ঠাকুমা ওর মধ্যে ঘড়া, গামলা, জগ, পিলসুহজ রাখত! ড্যাম্পো মেজেয় পড়ে থেকে তলা ঝাঁঝরা হয়ে এসেছে, তবু এত মজবুত, ডালার ওপর গণ্ডার লাফাতে পারে। এবারে কাল করল তোমার সাধের মামার বাড়ির পুকুরের মাছ।'

'কী! কী বললে? আমার মামার বাড়ির পুকুরের মাছ!' সানাই বেজে ওঠে চড়া সুরে।

'করলই তো। আলবাত করল। কী বলব ধর্মশালামশাই, বেরোবার মুখে বারাসাত থেকে এক লোক আধমণি এক কাতলা মাছ নিয়ে এসে হাজির। মামার পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে। আদরের ভাগনিকে খেতে দিয়েছেন। তো বললাম, এখন মাছ নিয়ে কী হবে, পাড়ায় বিলিয়ে দিয়ে যাও। তো, প্রাণ ধরে দিতে পারলেন না। আহা, মামার পুকুরের মাছ! শুনবেন কথা? বলে কিনা ও আমি কাগজে মুড়ে বালিশের মতন করে ওর মধ্যেই নিয়ে যাব! মাছটি তো আড়ে-দীর্ঘে ওনার দু-গুণ। ওই আধমণি মাছের জন্যে আমার ডবল ডবল কুলি ভাড়া লাগল। ফি বারে বলি, হুঁশিয়ার। সিসা কা বর্তন হ্যায়। এবার বলতে হল, পাথ্থরকা! যাক গে, আজ এখানেই মাছটার সদ্গতি হোক, কী বলেন, কেটেকুটে সবাই মিলে উদ্ধার করা যাবে।'

হাসি ফুটে ওঠে চক্রবর্তীর মুখে মাছকে কেটেকুটে ফেলার প্রসঙ্গে আর মাছের মালিককে কেটে পড়তে বলা যায় না। অতএব...

কিন্তু ছেলে দুটো? তাদেরই তো পুলিশে দেওয়া উচিত। মিছিমিছি একটা নিরীহ ভদ্রলোককে...

ছেলে দুটো ততক্ষণে হাওয়া। ওরা তখন সমুদ্রের ধারে।

মদনা বলল, 'খুব একখানা মার্ডারকেস পাইয়ে দিলি ট্যাঁপা।'

ট্যাঁপা দাঁত বার করে বলল, 'এক হিসেবে তাই। আমাদের কেসটা তো মার্ডারই হল।'

মদনা আরও রাগের গলায় বলল, 'যাক, তোর চিরদিনের বাসনাটি মিটেছে তো?'

ট্যাঁপা ঘাড় চুলকে বলল, 'তা একরকম মিটেছে। শুধু ওই ডিমের ঝোল-ভাতটা হয়ে গেলেই জম্পেশ হত!'

আশাপূর্ণা দেবী

ছোটোদের এক ডজন উপন্যাস